সহ একটী শোভা-যাত্রা দেখিতে পাইয়া দ্রুত-পদে উহার নিকট পৌঁছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, একটী বড় লোকের বিবাহের মিছিল যাইতেছে। নানাবিধ পুষ্পপতাকা ও গ্যাসের আলো দ্বারা সজ্জিত বিমানোপরি বর দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া গাইডকে মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কালে তিনি আমাকে উহার নিকটে যাইতে নিষেধ করিলেন এবং মিছিল মধ্যস্থিত লোকদিগকে স্পর্শ করিলে পুনরায় অবগাহন করিতে হইবে, তাহাও বলিলেন। শেষে বুঝিলাম, ঐ বিমানে একটী মৃত দেহ। উহাকে সৎকার করিবার জন্য শ্মশানে লইয়া যাইতেছে। মৃতদেহটী অস্পৃশ্য জাতির, সুতরাং মিছিলস্থ সমস্ত লোকই অস্পৃশ্য। এই প্রকার নিম্ন জাতির প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের একটী মজ্জাগত সংস্কার বা দোষ। এখন দেখিতে পাইতেছি, স্থানে স্থানে বড় বড় হিন্দুগণ বড় বড় সভা করিয়া এই সংস্কারটী উঠাইয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, কোন কালেই এই চেষ্টা ফলবতী হইবে না। আমরা যে মুহূর্ত্তে এই ভারতের মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই মুহূর্ত্ত হইতে নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি, মাতৃস্তন্যের দুগ্ধ দ্বারা আমাদিগকে ঐ সমস্ত জাতিকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। আমরা বড় হইয়া ইংরেজের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া এবং নানাবিধ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য সভা করিয়া মুখে বলিতেছি বটে, অস্পৃশ্য জাতিকে স্পর্শনীয় করিতে হইবে' কিন্তু অন্তরের সহিত উহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকি, তাহাদের প্রতি কৃপা দেখান, উহা কেবলই ফাকা কথা এবং ইংরেজের চক্ষে ধূলা নিক্ষেপ করিবার চেষ্টামাত্র। কিন্তু যে ইংরেজ সসাগরা ধরার আধিপত্য করিতেছে, তিনি যে ইহা বুঝিতে পারেন না, এমন মনে করা নিতান্তই বাতুলতা। ভারতের সংস্কারক মহাত্মাগণ একটু বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, ভারতবর্ষ হইতে একটু একটু করিয়া যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মতিরোহিত হইতেছিল, আবার পুনরুত্থানকারীগণের চেষ্টায় সেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইতে চলিয়াছে।

রাস্তার দুই ধারে অনেক তন্তুবায়ের গৃহ এবং বস্ত্রবয়ন দেখিতে পাইলাম। বিলাতী সূতার দ্বারা অতি সুন্দর সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, সূতাগুলি এমন সুন্দরভাবে মার্জ্জিত হইয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলে রেসম বলিয়া ভ্রম হয়। আমার বোধ হয়, ভারতে যদি অতি সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করা যায়, তবে আমাদের দেশের তন্তুবায়গণ তাঁতের বস্ত্র দ্বারাই ভারতের কাপড়ের অভাব দূর করিতে পারে। সূতা পাইলে কলে যে পরিমাণ বস্ত্র নির্ম্মিত হয়, তাহা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। ভারতে বিস্তর তন্তুবায় এবং জোলা আছে।

সন্ধ্যার সময় ষ্টেসনে পৌঁছিলাম, রাত্রি ১২টার সময় ট্রেন পাইব, সুতরাং এ যাবৎ-কাল ষ্টেশনের বিশ্রাম-গৃহে অবস্থিতি করিতে হইল। তথাকার হোটেলে চারি আনা পয়সা দিয়া আহার করিলাম। ইহার বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে, কারণ পূর্ব্বেই এক প্রকার লেখা হইয়াছে। আহারের পর একটু নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহা অসম্ভব। মশার উপদ্রবে সমস্ত সময়টা উপবেশন করিয়া কাটাইতে হইল। বিশ্রাম-গৃহে চুপ করিয়া বসিয়া রুমাল দ্বারা মশককুলের সহিত সংগ্রাম-

করিতেছি, এমন সময়ে একজন ফিরিঙ্গি-Guard একজন তামিল দেশীয় বাবুর সহিত তথায় প্রবেশ করিলেন এবং গৃহমধ্যস্থিত একখানি আরাম-চেয়ার লইয়া আমার নিকট হইতে একটু দূরে উপবেশন করিয়া পকেট হইতে একটী সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া আরামপূর্ব্বক ধুমপান করিতে লাগিলেন। বন্ধুটীও একখানি চেয়ার লইয়া তাহার নিকট উপবেশন করিলেন এবং তিনিও একটি সিগারেট লইয়া আরাম করিতে লাগিলেন। সাহেবটী একটু পরে উক্ত বাবুটীর সহিত বেশ গল্প জুড়িয়া দিলেন এবং সেই গল্প শ্রবণ করিয়া আমারও বেশ সময়ও কাটিয়া যাইতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় ১০টার সময় সাহেব বাহাদুর স্বস্থানে গমন করিলেন এবং আমিও রাত্রি ১২টার সময় ট্রেণে উঠিয়া প্রাতঃকালে পুনরায় Trichinopati নামিয়া টেপাকুলম সহরে আমার পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইলাম এবং যথাসময়ে আহারাদি করিয়া ষ্টেশনে আসিয়া বাঙ্গালায় যাত্রা করিলাম।

শ্রীরতিকান্ত মজুমদার,

ভারতপূজ্য মহাত্মা তিলকের তিরোধানে।

শ্রাদ্ধোপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত।

একি শুনি অকস্মাৎ শতকোটি বজ্রাঘাত সম
অস্তাহত ভারত-"তিলক" !—
নিস্পন্দ হৃদয়গতি ! মর্ম্মে মর্ম্মে পশিল নির্ম্মম
বিষদিগ্ধ সুতীক্ষ্ণ শায়ক।
যুগসন্ধিক্ষণে যবে ভারতের দুর্দ্দিন তিমিরে
দিব্যদ্যুতি বিকাশ-উন্মুখ,
জ্যোতিঃর বিগ্রহদেব অতর্কিতে
অস্তমিত ধীরে
শূন্য করি জননীর বুক !
কালি রাজ্য অভিষেক, রঘুবংশচূড়ামণি আজ
বনবাসে করিলা গমন !—
চূর্ণ হিমাদ্রির শৃঙ্গ ! মুকুট বিচ্যুত সুররাজ !
হৃত কৃষ্ণ কৌস্তভ রতন !
সদাগতি গতিহারা ! স্তম্ভিত উদ্বেল পারাবার
জগতের অশ্রুরাশি ভারতে আজিকে একাকার !
মহারাষ্ট্রকুলপতি শিবাজীর পূর্ণ-অবতার !
শ্রীগীতার জীয়ন্ত মূরতি !
দৃপ্ত রাজরোষ তোমা গ্রাসিবারে চাহি বারংবার
করে গেছে নিঃশব্দে আরতি !
তুমি সত্য অগ্নিহোত্রী, অন্তরের পূত যজ্ঞাগারে
দেশভক্তি-হোমানল জ্বালি'
কঠোর তপস্যা একি নিত্য একা সাধিলে
সংসারে,
মনোপ্রাণ-হবিঃধারা ঢালি !
হে নিষ্কাম কর্ম্মযোগি ! হে মহর্ষি স্বরাজমন্ত্রের !
স্বার্থত্যাগি ! দেশহিত ব্রত !
তোমার 'কেশরী"সদা দুঃখদৈন্য হেরি ভারতের
গর্জ্জিয়াছে কেশরীর মত !
আজি যজ্ঞে পূর্ণাহুতি ! দধিচির অস্থিদান শেষ
বজ্র কি উঠেছে গড়ি জয়শক্তি করিয়া উন্মেষ !
হা দেব ! দুরাশা ঘোর ! এখনো যে
তমিস্রা রজনী,
দিকে দিকে রয়েছে ঘেরিয়া,—
অন্যায় ও অনাচারে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ধ্বনি
উঠিতেছে ভারত বেড়িয়া !
কোথা ঐক্য, কোথা সখ্য, ধর্ম্মে কর্ম্মে
কোথা সমন্বয়,
লক্ষ্য কোথা উদগ্র অটল ;—
স্বার্থ ও অর্থের মোহে কলুষিত এখনো হৃদয়
আত্মনিষ্ঠা এখনো চঞ্চল !
হে বীর ! হে মহারথি ! অভিশপ্ত
ভারত-সন্তান
এখনো যে লুণ্ঠিত ধূলায়,—
অভিজ্ঞান-শঙ্খ ত্যজি তুমি কোথা করিছ
প্রয়াণ
কে আনিবে স্বরগ-সুধায় !

আসমুদ্র হিমাচল কেঁপে আজ উঠে থরথরি-
হে লোকেন্দ্র! যুগগুরু! ক্ষাত্রবীর্য্য অবমান
স্মরি!
হে পূজার্হ! জননেতা! আর্য্যরবি!
পুরুষ সপ্তম!
নিরুদ্দেশ পথের পথিক!
দেশ ভ্রাতাগণে কর আশীর্ব্বাদ আজি নিরুপম
লক্ষ্যে সদা রহিতে নির্ভীক!
তোমারি পদাঙ্ক ধরি জ্ঞানে কর্ম্মে হতে
বীর্য্যবান
দীক্ষা দান কর আজি সবে ;—
জাগ্রত বিশ্বের মাঝে এ ভারত করুক উত্থান
তব সিদ্ধ সাধনা-গৌরবে!
তব পুণ্যবলে দেব! অস্ত হোক্ অন্ধকার রাতি,
ভস্ম হোক্ যত হিংসা দ্বেষ ;—
অশরীরী আত্মা তব ভারতের কোটি হৃদি গাঁথি
পূজার্ঘ্যে করুক্ সমাবেশ!
হে অমর! পরন্তপ! অজ্ঞাত রাজ্যের
অধিবাসি!
লভ চির শান্তি সুখ মাতৃ আস্যে হেরি পুনঃ
হাসি!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সঙ্কণিকা।

(২০)

দুঃখের সহিত ঘোষণা করিতেছি, দেশ-মান্য শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় ফরিদপুরের রাজেন্দ্র-কলেজের বাকী চাঁদার জন্য বরিশালের জমীদার শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহম্মদ ইসমাইল ও চৌদ্দরশীর জমীদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়দিগের নামে আদালতে নালিশ করিয়াছেন। অন্য উপায়ে ইহার মীমাংসা হইলে আমরা সুখী হইতাম। দেশ-নায়কের ইহাতে কলঙ্ক হইবে।

(২১)

গিরিশচন্দ্র ঘোষের সেরাজদ্দৌলা, মীর কাসিম, মীজাফর গ্রন্থ ও নবযুগ ও মহ-ম্মদীর জামীনের টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। দেখিতেছি, নবভাবে নির্য্যাতন আরম্ভ হই-য়াছে। এদিকে মহাঘটার নব নির্ব্বাচন আসিতেছে। বায়ু কোন্ দিকে বহিতেছে? নব্যভারত, তোমার চক্ষে জল পড়ে কি?

(২২)

১৯২০—সেপটেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতা নগরীর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জাতীয় মহাসমিতির অতিরিক্ত অধিবেশন কংগ্রেস বসিবে। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও শ্রীযুক্ত লালা লাজপত রায় মহাশয় জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর সহযোগিতা-বর্জ্জন (Non-co-operation) প্রস্তাব গৃহীত হইবে কি না, ইহাই প্রধান বিষয়। কেহ কেহ বলেন, যখন তুর্কী-সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তখন আর এ সব গোলে কাজ কি? অপিচ কেহ কেহ বলেন,ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সহযোগিতা-বর্জ্জন (non-co-operation) প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, কলিকাতা মডারেট দুর্গ, যাহাতে ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়, তৎপক্ষে সহায়তা করিবেন। কি হইবে, আমরা জানি না। দুই দলই ভিখারী, এত কাজ থাকিতেও কেহ কিছু করিবে না,কেবল ভিক্ষা চাহিবে। এক দল পা চাটিয়া, অন্য দল চোখ রাঙ্গাইয়া ভিক্ষা চাহিবে। দুই দলেই কিছু কিছু সত্য আছে। তবে আমাদের বিশ্বাস,স্বার্থচিন্তা,পদ-লালসা ও উপাধির পিপাসা এদেশে না কমিলে কিছুতেই কিছু হইবে না? প্রকৃত মনুষ্যত্ব

কোথায়? ফাঁকা উপাধির পশ্চাতে এত লোক ছুটাছুটি করে কেন? যত কিছু বল না কেন, ভারত যে তিমিরে, সেই তিমিরে! হায় রে উপাধির পিপাসা ও পদগৌরব? লালসা!

(২৩)

ষ্টেটস্‌ম্যান-বর্জ্জনের কথা আবার উঠিয়াছে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট ইমানুয়েলের স্কুল শাসন ও কোন কোন হেড মাষ্টারের-ছাত্র-নিগ্রহের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন উঠিয়াছে কি? সেই শিক্ষকগণ কোন্ ধাতুর লোক, যাঁহারা তিলকের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের ন্যায় সৎকাজের জন্য ছাত্রপীড়ন করিয়াছেন? এদেশে প্রকৃত মনুষ্যত্ব থাকিলে, এত গালাগালির পরও কি ষ্টেটস্‌ম্যান চলিত? এটর্ণিদের একতায় ব্রাহ্মন শাসিত হইয়াছিলেন যে দেশে, সেই দেশে সুদীর্ঘকালেও ষ্টেটস্‌ম্যান শাসিত হয় নাই, এ কলঙ্ক রাখিবার ঠাঁই নাই। সহরে সহরে উদার ও বিবেচক ডেলিনিউসের কাট্‌তি দেখিবে না, কাট্‌তি দেখিবে, ষ্টেটস্‌ম্যানের কলঙ্কের উপর কলঙ্ক—এইরূপ রাশি রাশি কলঙ্ক ভারতকে মসীম্লান করিয়া রাখিয়াছে।

(২৪)

দিনাজপুরের ঋষিপ্রতিম শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন কর মহাশয় পীড়িত হইয়া ভবানীপুর শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ষ্ট্রীটে পুণ্যশোক অন্নদাবাবুর বাড়ীতে আছেন। অন্নদা বাবু তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইতেছেন, আর ধন্য হইতেছেন, ভবানীপুর ১৫ নং পদ্মপুকুর রোডের ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, এল-এম-এস মহাশয়। দেবেন্দ্রনাথ, ১৯০৪ খ্রীঃ মেডিকেল কলেজের হাউস সার্জ্জন ছিলেন, ১৯০৫ খ্রীঃ মেয়ো হাসপাতালে, ১৯০৮ খ্রীঃ বাকীপুর মেডিকেল স্কুলে এবং ১৯১০ খ্রীঃ কাউন্সেলিতে রিসার্চ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তৎপরে ১৯১১-১৮ পর্য্যন্ত কটক মেডিকেল স্কুলে ভৈষজ্য এবং নিদানের শিক্ষক ছিলেন। তিনি সম্প্রতি ভবানীপুরে আছেন। কটকে তাঁহার যে প্রশংসা শুনিয়া আসিয়াছিলাম, এবার তাহার চরম নিদর্শন পাইলাম। সে অমায়িকতাগুণে তিনি দেশপূজ্য, তাহার সহিত তিনি এবার ঋষি-সেবা ও চিকিৎসানৈপুণ্যের দ্বারা সকলের হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্বের এক মুখে প্রশংসা করা যায় না। বিধাতা এহেন ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল করুণ।

(২৫)

৺চন্দ্রশেখর সেন—"বিগত ২রা আষাঢ় ১৩২৭, বুধবার, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় তত্ত্ববিদ্যা-সমিতির সুপরিচিত সদস্য ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় চন্দ্রশেখর বাবুর বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইয়াছিল। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা দীর্ঘায়ু বলা যায়। কিন্তু মৃত্যুর সময়েও সেন মহাশয়ের কার্য্য সমাধা হয় নাই। সেন মহাশয়ের যখন প্রায় ৩৫ বৎসর বয়স, তখন তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন। সে সময় তিনি আজীমগঞ্জে ডাক্তারী ব্যবসায় করিতেন। ইউরোপে প্রায় ৫ বৎসর থাকিয়া এবং নানা দেশ প্রদক্ষিণ করিয়া অবশেষে তিনি নিজের চেষ্টায় এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া এদেশে প্রত্যাগত হন এবং প্রথমতঃ কিছু দিন হাই-কোর্টে ব্যারিষ্টারী করিয়া পরে অনেক বৎসর বাঁকুড়াতে ব্যারিষ্টারী করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কার্য্য তাঁহার প্রকৃতির অনুকূল ছিল না, সেজন্য তাহাতে তিনি বেশ পসার করিতে পারেন নাই। শেষ জীবনে তিনি কার্য্য

হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় অবস্থান করেন এবং প্রধানতঃ ধর্ম্ম চর্চ্চায় ও ধর্ম্ম প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার চিত্তের একাগ্রতা যৌবন হইতেই ছিল। প্রথম জীবনে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন, কিন্তু সে ধর্ম্মের গণ্ডী তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি থিওসফিক্যাল সোসাইটীতে যোগদান করেন এবং শেষ জীবন ইহার আশ্রয়েই শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা বিষয়ে তিনি নানা স্থানে বহু বক্তৃতা করিতেন। এই সকল বক্তৃতার সরল ভাষায় ও সরল ব্যাখ্যানে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ উপকৃত হইত। কর্ম্মবাদ হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিভূমি স্বরূপ। থিওসফিক্যাল গ্রন্থেও ইহার বহু আলোচনা আছে। কর্ম্ম সম্বন্ধে চন্দ্রশেখর বাবু বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কর্ম্মতত্ত্বে তাঁহাকে ঘুণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার জীবনের শেষ কাজ "কর্ম্মপ্রসঙ্গ" গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ আজ প্রায় এক পক্ষ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগ কতকটা লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হয়, চন্দ্রশেখর বাবুর মৃত্যুর সঙ্গে কর্ম্মপ্রসঙ্গের দ্বিতীয় ভাগের সম্ভাবনা তিরোহিত হইল। বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া চন্দ্রশেখর বাবু নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত 'ভূ-প্রদক্ষিণ' নাম দিয়া প্রকাশিত করেন। সে সময় এ গ্রন্থের খুব আদর হইয়াছিল। তাঁহার আর একখানি গ্রন্থ আছে "কলিযুগ"। সেন মহাশয় তত্ত্ববিদ্যা-সমিতির কর্ম্মঠ ও উৎসাহী সদস্য ছিলেন এবং কলিকাতা "আনন্দ লজে"র সভাপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। বঙ্গসাহিত্যও একজন সুলেখক ও সেবক হারাইয়াছে। চন্দ্রশেখর বাবু সর্ব্বদা নিজকে 'সেবকাধম' বলিতেন। তাঁহার জীবনের কাহিনীতে দেখা যায় যে, তিনি অধম নহেন, উত্তম সেবক ছিলেন।"

ব্রহ্মবিদ্যা।

সাধু চন্দ্রশেখর নব্যভারতের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন; তিনি নব্যভারতে ধারাবাহিকরূপে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা নব্যভারতের অমূল্য সম্পত্তি। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার ভালবাসা ও সদ্ভাব চিরদিন আমাদিগকে সজীব রাখিয়াছে। তিনি অগ্রে যাইবেন, আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে আমাদিগের নিকট বহু পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ১২ খানি এখানে তুলিয়া দিলাম। এই পত্রকখানি তদীয় জীবনের ছায়ায় চিত্রিত। বিধাতা তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা যে প্রাণে বেদনা পাইয়াছি, তাহা আমাদিগকে অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

(১)

ক্রিষ্টিয়ানা, ২৭শে জুলাই, ১৮৯১ খ্রীঃ।

শ্রীচরণেষু,

এই কার্ডখানি নর্থকেপে মধ্যরাত্রির ঘনীভূত সূর্য্যকিরণে দগ্ধ। পথ হইতে অনেকগুলি পাঠাইয়াছি। আপনাকে একখানি পাঠাই, রাখিবেন, চিহ্নস্বরূপ।

মহাতীর্থযাত্রা প্রবন্ধ পাঠাইয়াছি। বড় তাড়াতাড়ি, কাজেই অনেক কথা উঠিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, প্রাপ্তমাত্র যত শীঘ্র পারেন প্রকাশ করিবেন, কারণ অনেকে বিশেষ আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছেন।

জীবনে যদি ঘুমন্ত ভারতের পাঁচজনকেও জাগাইয়া মরিতে পারি, আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব। আর একটী প্রবন্ধ পারিত এইখান হইতেই পাঠাইব।

চিরকাল ভিতরে একটা অগ্নি জ্বলিতেছে, কিন্তু ইউরোপে যখন যখন পর্য্যটন করি, বিশেষ এইবার, ধুধু করিয়া জ্বলিতেছে যে, শারীরিক মহাক্লান্তি, নিদ্রা হয় না; কেবলই ছুটিতে ইচ্ছা করে। মানসিক কার্য্য দ্বারা শরীর খুব খারাপ, তবু চিন্তা ব্যতীত থাকা যায় না। শেষে স্থির করিয়াছি, এইরূপ ভাবনা চিন্তা করিতে করিতে যতদিন এদেহ রাখিতে পারি; ইহার হাত এড়াইবার উপায় নাই এখান হইতে রুশিয়া রওনা হইব।

ভৃত্য শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

(২)

প্রাগ-জুবিলি একজিবিসন, ৯-৮-৯১

শ্রীচরণেষু,

বোহেমিয়ার রাজধানী এই প্রাগনগরে রাজাভিষেক উপলক্ষে প্রথম প্রদর্শনী হয়, ইহার পূর্ব্বে আর কোথাও হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না, ১৭৯১ খ্রীঃ অঃ উহা হয়, তাহারই শত বার্ষিক একজিবিসন এই বর্ত্তমানপ্রদর্শনী। মন্দ হয় নাই, কলিকাতাপেক্ষা অনেক কাণ্ড বেশী, কোন কোন কাণ্ডে হঠাৎ ভ্রম হয় যেন পুনরায় পারিস মহামেলা। বোধ হয় লণ্ডন না পঁহুছিয়া প্রবন্ধাদি লেখা হইবে না। লাইপজিক ড্রেসডেন দেখিয়া পরে বিয়েনা যাইব। আপনি পত্রাদি লণ্ডনেই দিবেন, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই সেখানে পঁহুছিব। বিয়েনায় সমস্ত পত্র পাঠাইতে বলিয়া দিয়াছি।

সেবক শ্রীচন্দ্রশেখর।

(৩)

কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল, ২৪শে আগষ্ট, ১৮৯১।

শ্রীচরণেষু,

ক্রমে কোথায় আসিয়াছি, পোষ্টকার্ডের দশা দেখিয়া পরিচয় পাইবেন, বাজারের অবস্থাও তদ্রূপ। কিন্তু স্থান অতি মনোরম, Golden Horn, Bosphorus, Mormora প্রভৃতির দৃশ্যের সহিত পেরা, ইস্তাম্বুল, স্কুটারি, হাইদারপাশা, মারমোরায় একদ্বীপ প্রভৃতির সৌন্দর্য্য টাওয়ারের উপর হইতে এবং Golden Horn হইতে দুই ধারের দৃশ্য অতি চমৎকার, পৃথিবীর এক প্রধান দৃশ্যের মধ্যে পরিব্রাজকগণের এক বিশেষ আকর্ষণ "Constantinopla from Golden Horn" বলিতে বলিতে পর্য্যটকগণের জিহ্বায় লাল পড়ে। পৌছিয়াই পারের হাইদারপাশায় গিয়া কয় ঘণ্টা থাকিয়া মাতার ক্রোড় সম্ভোগ করিয়া আসিলাম, দীন দুঃখী হইলে কি হয়, তবু মা। মায়ের কেলা বড় মিষ্ট। এবারকার পর্য্যটনের শেষ ভাগে এক বড় মজা দেখিলাম, ইউরোপ কেমনে ক্রমে ক্রমে আসিয়া হইল, দেখিলাম, তাই গ্রীস হইয়া যাইবার ইচ্ছা আছে যে, আবার আসিয়া ক্রমে কিরূপে ইউরোপ হইল, দেখিতে দেখিতে যাইব। এ সকল কেবল বিধাতার কৃপায় ও আপনাদের চরণাশীর্ব্বাদে ঘটিতেছে। দয়াল হরির নিকট বিয়েনাতে খুব কাঁদিয়াছিলাম, বলের জন্য, নতুবা ক্লান্তি উপস্থিত হইয়াছিল। ভয়ানক পরিশ্রম, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল ঘোরা।

সেবক শ্রীচন্দ্রশেখর।

(৪)

শ্রীচরণেষু,

এথেন্স, ২৮-৮-১৮৯১

কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে এখানে। পূর্ব্বে দেশের আর কেহ এখানে আসিয়াছিলেন কি না, জানিনা। কিন্তু একবার দেখিয়া যাওয়া অনেক ইউরোপযাত্রীর বিশেষ কর্ত্তব্য। এখানথার পূর্ব্বকীর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

পাইরিউক হইতে এখানে আসিতে হয়, সেখানেও অনেক দেখিবার আছে। সব কিন্তু, খুব নিকটে নিকটে গাইড দ্বারা ৬।৭ ঘণ্টায় দেখা হয়। এখান হইতে কোরিন্থ যাইব।

শ্রীচন্দ্রশেখর।

(৫)

Hamburg Germany, ২৪-১৮-৯১

শ্রীচরণেষু

লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, ডেনমার্ক টুকু হইলে স্পেন পোর্ত্তুগাল ছাড়া এ দিকটা সব হয়, তাই চলিলাম কোপেনহাগেনাভিমুখে, অদ্যই লুবেক যাইব। শুইডারজি পার হইয়া Harbingen, Gromingen ও Bremen হইয়া এখানে। এ পথে আসিয়া বিশেষ লাভ হইয়াছে। Gromingen Bibliothekএ মাটিন লুথারের হাতের marginal notes শুদ্ধ একখানি Erasmus প্রণীত Bible আছে, তাহার মলাটে লুথার পাঠান্তে লিখিয়াছেন, লাটিন ভাষায়, "যদি জীবিত থাকি, তোমার বিড়ম্বনার কারণ হইব, আর যদি মরি তোমার যম হইব হে পোপ।" এদেশে এক পোপ একলুথার ঠাণ্ডা করেন, আমাদের দেশে ঘরে ঘরে পথে সাটে অসংখ্য পোপ সুতরাং অসংখ্য লুথার চাই, ঐরূপ প্রতিজ্ঞা ভিন্ন কাজ হয় না।

সেবক শ্রীচন্দ্রশেখর।

(৬)

ন্যাপোলি-Naples 5-9, 1891.

শ্রীচরণেষু

আথেন্স, কোরিন্থ, এক্রো অর্থাৎ প্রাচীন কোরিন্থ বন্দর ও করফু দ্বীপ হইয়া পুরাতন বন্ধু ব্রিণ্ডিসি দিয়া এখানে। আর দুইবার এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু বিসুবিয়স শিখরে উঠা হয় নাই। এবার তাহাই সারিলাম। শিখরদেশে যে কি ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইতেছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। craterএর পরে দাঁড়াইলে বোধ হয় পৃথিবী ধ্বংস করিবার জন্য বিধাতা এইখান হইতে বিনাশ আরম্ভ করিয়াছেন। ধন্য তাঁহার খেলা। এস্থান এক বিশেষ তীর্থ। শিখরদেশে প্রধান active crater ছাড়া ঝাঁঝরার মত বহু স্থান ফুটা হইয়া অনবরত গন্ধক বাষ্প উঠিতেছে, কোন্ স্থান কখন নামিয়া যাইবে, কে জানে। এখান হইতে রোমে যাইব।

সেবক শ্রীচন্দ্রশেখর।

(৭)

কোপনহাগন ডেনমার্ক

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯১

শ্রীচরণেষু,

আজ কয়দিন এখানে। প্রথম দিন সমুদ্রতীরে বসিয়া এই গানটী স্বতই হৃদয়ে রচিত হয়, গানটী বারম্বার গাইয়া বড় সুখ পাই।

বলি মন্ তোরে, বলি মন্ তোরে,
আমার কথা শোন্।
যদি না শুনিস্ বিপদ্ হবে অনুক্ষণ ॥
এই সংসারের সার হরি, ভবভয় দুঃখহারী,
ভুলিস্ না, ভুলিস্ না রে তাঁর শ্রীচরণ।
আর একটী সার কথা, বলে রাখিরে হেথা,
সকল ধর্ম্মের সার জীবে দয়া মানব সেবন্ ॥
যদি শুনিস্ এই কয়টী কথা, কভু না পাবি ব্যথা, পরম্ সুখে কাটাবি এই দুর্লভ জীবন্ ॥
শেষে অন্তিমে হরি বলে, (যাবি) ভবপারেতে চলে, চিরসুখ শান্তির সেই নিকেতন্ ॥

আর অদ্য জগদীশ্বর বাবুর চৈতন্য জীবনী নব্যভারতে পাঠ করিয়া অজস্র প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করত বিপুল আনন্দ উপভোগ করিলাম। যখনই নব্যভারতে চৈতন্যজীবনী

পাঠ করিয়াছি, তখনই কাঁদিয়াছি (লণ্ডনে) কিন্তু প্রবাসের প্রবাসে আজ প্রথম। রাইন তীরে অন্যান্য অংশ পাঠ করি, ওটা পাঠ করি নাই। এইজন্য নব্যভারত এত চাই, কিন্তু আপনি যে বিষয়ে নির্দ্দয়। আর একদিন আমষ্টারডামের পারে একগ্রামে নির্জ্জন গোচারণের মাঠে উচ্চকণ্ঠে "দয়াল হরির কৃপা হলে পাষাণ ভাসে সলিলে "এই কয়টী কথা বারম্বার গাইয়া খুব সুখ পাইয়াছিলাম, কারণ ইউরোপে আসিয়া অবধি নির্জ্জনে চীৎকার করিয়া হরিনাম হয় নাই। দাদা-মহাশয়, বিধাতার কৃপা বহু প্রকারে ভোগ করিলাম, কিন্তু তাঁহার নামগানের অধিকার রূপ কৃপাপেক্ষা কৃপা দেখি না। কি বলিব, আমি পামর নরাধম, এ রসনা যে হরিনাম উচ্চারণ করিতে পায়. এই পরম সৌভাগ্য। প্রাণের অনেক কথা আছে, চরণে কাঁদিয় বলিব। এখান হইতে পরশ্ব Edinburgh, সেখানে ২দিন থাকিয়া লণ্ডন যাইব। Christiana হইয়া যাইব, এখানে ভ্রমণ আরম্ভ ঐখানেই শেষ। Spain, Portugal বাকী রহিল, তাঁর ইচ্ছা। বকেয়া নব্যভারত,যাহাতে পত্রাদি প্রকাশ হইয়াছে, তাহা শীঘ্র পাঠাইবেন।

সেবক শ্রীচন্দ্রশেখর।

(৮)

Octo, 1891, London.

আমি কল্য এখানে পৌছিয়াছি। আপনার পত্র ও বিদ্যাসাগর-নব্যভারত পাইলাম। মহাপুরুষের জন্য যে দেশশুদ্ধ লোক শোক প্রকাশ করিয়াছে, ইহা শুভলক্ষণ, সন্দেহ কি, Feeling of admiration এমনি করিয়া ক্রমে বাড়িলেই আবার উঠিতে পারিব. আশা হয়।

আপনাকে Continent হইতে কয়বার লিখিয়াছি, পুনরায় এখান হইতে লিখিতেছি। Paris Universal Exhibitionএর বৃত্তান্তের পর প্রদর্শনীর বাহিরের বাস্তীলাদির বিবরণ, Middle Temple রাজভোগ ও আমার পত্র যে কাগজে বাহির হইয়াছে, তাহা পাঠাইয়া দিবেন। পারিসের বিষয় শেষ করিতে পারিতেছি না, উহা না পাইলে।

আপনি একবার বিলাত আসিলে বড় ভাল হয়। আমার আর ৪ মাস দেরি আছে। এবার বোধ হয়, হয় না। Chicago Great World's Fair 1893 চেষ্টা করিয়া দেখা যাইবে, যদি দুইজনে একত্রে আসা যায়। এবার বিস্তর নোট করিয়া আনিয়াছি, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক মাথায় করিয়া আনিতে হইয়াছে। এ দেশে ত বেশ নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়াইতেছি, দেশে গিয়া শরীর মন কি অবস্থায় পড়িবে, জানিবে। Continentএ কয় মাস খুব দেখিলাম, সর্ব্বত্র হোটেল-গুলিতে জামাই আদর যেন কতকালের পরিচিত বন্ধু সকল, ইহারই নাম সভ্যতা। সাক্ষাতে অনেক বলিবার আছে, ইউরোপীয়-দের সঙ্গে সমান তাল না ঠুকিতে পারিলে আমাদের ধ্বংস। এবারকার এই সমস্যা, এ যুগের এই বিধান।

সেবক শ্রীচন্দ্রশেখর।

(৯)

২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯২।

শ্রীচরণেষু-

পর্য্যটনের পর লণ্ডনে আসিয়া ঘাড় তুলিবার অবকাশ ছিলনা। দ্বিতীয় কথা আমি মনে করিয়াছি, আপনি হয়ত আমার উপর রাগ করিয়াছেন। যাহা হউক, রাগ অনেক দিন থাকিতে পারে না। স্পেন ও পোর্টুগাল দুইটী ইউরোপীয় দেশ বাকী ছিল, তাহা সারিয়া মরক্কো যাইব, তারপর আমেরিকা, হোনোলুলু জাপান চীন হইতে দেশে পঁহুছিব, এইরূপ মনে করিয়াছি, মালিক ভগবান। পথ হইতে যথা নিয়মে পত্রাদি দিব, তজ্জন্য ভাবনা নাই। এক কথা আপনাকে বলি নাই, কতকগুলি কঠোর সত্য কথা বলার জন্য ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক মহাত্মারা বড়ই চটিয়া-

ছিলেন, যদি ঈশ্বর তাঁহাদের হাতধরা হইতেন, এতদিনে ভস্ম হইয়া যাইতাম। তাহা নাকি নয়, তাই দয়াময়ের দয়া আজও সম্ভোগ করিয়া চলিতেছি। লিসবন অতি রমণীয় স্থান, যত দেখিতেছি, ততই প্রীত হইতেছি।

VIGo (Spain) হইতে এখানে কল্য আসিয়াছি।

সেবক শ্রীচন্দ্রশেখর।

(১০)

Niagara Falls America,
29-3-92

প্রণাম নিবেদন মেতৎ

আটলান্টিকের ভয়ঙ্কর তুফানের মধ্য দিয়া পারে পঁহুছিয়াছি। মায়ের সাগর-রূপের ভীমা মূর্ত্তির ভীষণ লহরীর মধ্যে অতি মনোহর ছবি দেখিলাম। তুমুল তুফান চতুর্দ্দিকে নীল পর্ব্বত রাজি ফেনরূপ তুষার মস্তকে যেন বিরাজমান, মধ্যস্থলে আমাদের জাহাজে একবার একাত, একবার ওকাত, ডেকের উপর দিয়া ঢেউয়ের স্রোত চলিতেছে ; এদৃশ্য মানবজীবনে দেখিবার জিনিস, অন্ততঃ একবার। তাঁহার কৃপায় এখানে পঁহুছিয়া তাঁহার শক্তিময় রূপের নাএগারা লীলাও অতি বিচিত্র দেখিলাম। Gib হইতে প্রবন্ধ ও পত্র পাঠাইয়াছি। পরে আর আর সংবাদ।

সেবক শ্রীচন্দ্রশেখর।

(১১)

Tangier. Morocco.
Africa, 29-2-92

Europe সারা হইল, "গোয়াডালকুইবার তীরে বসিয়া Guadalquiver তীরে Seville হইতে আপনাকে এক দীর্ঘ পত্র নব্যভারতের জন্য লিখি, পরে তাহা যে কোথায় গোলমাল হয়, আর পাইতেছি না। শেষটুকু বাকী ছিল, বলিয়া Gibralterএ ডাকে দিব, মনে করি। শেষে কাদিস (Cadiz) হইতে জাহাজে উঠিতে নৌকায়, তার পর জাহাজে তিনদিন ঝড়ের জন্য ফিরিয়া গিয়া পথে অপেক্ষা. তার পর Trafalgarএ ও তাহার পর প্রলয় তুফান, নানা বিভ্রাটে জিনিসপত্র সমস্ত ভিজিয়া একপ্রকার নষ্ট, কাগজপত্র একেবারে নাশ বলিলেই হয়। Cadiz to Tangier শেকে মাহারার খেজুর খাইয়া বড় তৃপ্তি পাইলাম। এত ভয়ানক পথ জানিতাম না। স্থলতানী ডাকঘরের অভাব, English, French and Spanish তিন রকম ডাক। দৈবের উপর লোকের, Spanish and Moorদের অত্যাচার বড় কম না।

সেবক শ্রীচন্দ্রশেখর।

(১২)

HONGKONG, 28-4-92

শ্রীচরণেষু

ভূপ্রদক্ষিণ প্রায় সমাপ্ত করিয়া আসিয়াছি। জাপান হইতে Canton, Malao যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অত্যন্ত গ্রীষ্ম আর পারি না, এদিকে ক্লান্তও হইয়া পড়িয়াছি। ৩০ সে এখান হইতে রওনা, পরে সিঙ্গাপুর পিনাঙ্গ হইয়া ১৫ মে নাগাদ দেশে পঁহুছিব। দয়াময়ের অপার করুণা, আমাদের অপরাধের সীমা আছে, তাঁহার দয়ার অন্ত নাই। ধন্য ধন্য তাঁহার কৃপা। বাস্তবিক পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘাইলেন। জিব্রলটার হইতে পত্র লিখিয়াছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর।

(২৬)

বঙ্গের গৌরব লর্ড সিংহ বেহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর হইয়াছেন, ঘোষিত হইয়াছে। ডেলি-নিউজ বলেন. "What is a gain to the administration is a loss to the nation." একথা সত্য। নূতন-নির্ব্বাচনে সিবিলিয়ানদের প্রভুত্ব কমিবে, যাহারা ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদের আশা নির্ম্মূল হইয়াছে। কেন না, লর্ড সিংহ বাদে অন্যান্য গবর্ণরগণ সকলই সিবিলিয়ান। তবে লেপটেনেণ্ট গভর্ণর স্থলে কেবল গভর্ণর পদ পাইলেন, এই মাত্র পার্থক্য। দুই দশজন দেশীয় লোক উচ্চ কর্ম্ম পাইলেই দেশ স্বর্গে পরিণত হইবে না। সফি, শর্ম্মা ও শপ্পর বড়লাট সভার মন্ত্রীত্ব পাওয়ায় বুঝা যাইতেছে, দলের লোক ভিন্ন অন্যকে নিযুক্ত করিতে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছুক নহেন। লর্ড সিংহকেও গভর্ণমেণ্ট দলের লোক বলিয়া মনে করেন। জলে জল মিশিলে, তেলে তেল মিশিলে দেশের যে কি উপকার হইবে, আমরা তাহা বুঝিতেছি না। তবে গৌরব বটে।

বিষ্ণুপদ—শেষ।

(৩৪ পৃষ্ঠার পর)

ভেড়াঘাটের অহ্লন দেবীর লিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, চেদীশ্বর কর্ণদেব পাণ্ড্য, মুরল, কলিঙ্গ, কের, হুণ প্রভৃতি বঙ্গাধিপতিগণকে রণে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। জয়সিংহ দেবের কর্ণবেল লিপি এই কথা বিশেষভাবে সমর্থন করে এবং চেদীলিপি হইতে আমরা সবিশেষ অবগত হই যে, কর্ণদেব গৌড়াধিপকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্যে প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহ একটী ঐতিহাসিক সত্য যে মহীপাল দেব তাঁহার রাজ্যকালের নবমবর্ষে কুরটপল্লিকা নামক গ্রামটী কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মা নামক কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন। এই গ্রাম গোকালিক মণ্ডলে কোটীশ্বর বিষয়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া ঐ প্রশস্তিতে নির্দ্দিষ্ট আছে। মদনপাল দেবের মনহলি লিপির দ্বারা ইহা অবিসম্বাদীরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, "কোটীশ্বর বিষয়" উত্তর বঙ্গে অবস্থিত ছিল; ইহার দিনাজপুর জেলার মধ্যে অবস্থিতি, আশ্চর্য্য নহে। বিহার হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী তেতারাঁওয়ায় উপবিষ্ট ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তির অংসদেশে এক লিপিতে মহীপাল দেবের নাম পরিদৃষ্ট হয়।* ইহা মহীপাল দেবের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ বলিয়া মনে হয়।

মহীপাল দেবের স্বর্গারোহণের পর, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নয়পাল দেব রাজ্যারোহণ করেন; সম্ভবত তিনি ১০২৫ ও ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ৺বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বলেন যে, ১০০০ হইতে ১০৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি রাজ্যারোহণ করেন। নয়পালদেবকে পরবর্ত্তী কয়েকটী সংস্কৃত ও ভাষা পুস্তকে "নারায়ণ পাল" দেব বলিয়া উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। নয়পাল দেবের রাজত্ব বারাণসী ও তীরভুক্তির চ্যুতির পর সংকীর্ণ আকার ধারণ করিয়াছিল এবং উত্তর-ভারতের চেদীশ্বর গাঙ্গ্যদেব ও তৎপুত্র কর্ণদেব অনেকটা অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন। ৺বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় সর্ব্ব প্রথমে আমাদের নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন যে, নয়পাল ও কর্ণদেবের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে নয়পাল দেবই বিশেষরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন। নয়পালদেবের রাজত্বকাল ১৫ বৎসরের অধিক সময় স্থায়ী হয় নাই; ইঁহারই রাজত্বকাল মধ্যে দুইটী লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল; তন্মধ্যে প্রথমটী "কৃষ্ণদ্বারিকা" লিপি। তাহা পরে যথাস্থানে উদ্ধৃত করিয়াছি এবং দ্বিতীয়টী যদ্বন্ধ ৺পরমেশ্বর দয়াল বিষ্ণুপদ মন্দিরের সীমার মধ্যস্থ ৺নরসিংহ দেবের মন্দিরের ভিতরে আবিষ্কৃত করেন।*

* Ind, Ant. Vol. 14 p 105 Note 17.

* J. A. S. B. pt I (1900) p 191. Note I.

P. A. S. B. (1902) p. 66-67.

(২) কৃষ্ণদ্বারিকা লিপির নোট P. A. S.B. (1902) p 66-67 দেখ।

কৃষ্ণদ্বারিকা লিপি পাঠে জানা যায় যে, নয়পাল দেবের শাসনকালের পঞ্চদশবর্ষ মধ্যে শূদ্রক পুত্র বিশ্বাদিত্য নামক কোন নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সন্তান দ্বারা বিষ্ণুর মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই বিশ্বাদিত্য পরিতোষের পৌত্র ছিলেন এবং এই লিপির রচনা সহদেব নামক একজন শালিহোত্রজ্ঞের দ্বারা এবং ভাস্কর্য্য কার্য্য অধীপ—সোমপুত্র সত্তসোমের দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই মন্দির সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডাঃ ক্যানিংহাম ও মেজর কীটো বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই লিপি পরে উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহা অনেকস্থানে নষ্ট হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও পাঠোদ্ধার করা দুরূহ নহে।*

এই লিপি একখণ্ড প্রস্তরের উপর গয়ার "দক্ষিণ দরোয়াজা" মহল্লার সন্নিকট "কৃষ্ণ দ্বারিকা" দেব মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণ দিকের গেটের দেওয়ালে আঁটা আছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রায় একশত বা একশত দুই বৎসর পূর্ব্বে ৺দামোদরলাল ধোকড়ী নামক কোন বিশিষ্ট গয়ালী ৺কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু এই দেবালয়ে ব্যবহৃত মাল মশলা প্রাচীন কোন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গয়া মাহাত্ম্যে বা বায়ুপুরাণে যে শ্রীকৃষ্ণের পূজাদি বিধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই মন্দিরের প্রাচীন সংস্করণকে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। ইহা কদাচ বৌদ্ধ যুগের জিনিষ নহে। প্রাচীন জনপ্রবাদ ও পুরাকালের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া আমরা অবগত হইয়াছি যে, এই স্থানে যে একটী প্রাচীন ৺কৃষ্ণ ও ৺মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহারই ভগ্নাবশেষের উপর বর্ত্তমান মন্দিরটী গয়ালী ব্রাহ্মণটী নিজ নাম সংকীর্ত্তনের জন্য নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এই লিপি সম্বন্ধে জেনারেল ক্যানিংহাম তৃতীয় ভাগ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া পুস্তকের ৩২নং প্লেটে ইহার প্রতিলিপি প্রদান করিয়া সর্ব্বপ্রথমে সভ্য জগৎ সমক্ষে প্রকাশিত করেন। তাহার পর ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য্যবিবরণীতে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র উল্লেখ করিলেও সম্যক্ পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই। ১৯০০ সালের ৬৯ ভাগ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রথম অংশের ১৯০ পৃষ্ঠায় মবন্ধু ও গয়ার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী যথাযথ পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশ করেন। এই লিপি ১৮ পংক্তিতে কুটিল অক্ষরে লিখিত। এই লিপি ২১টি ভিন্ন ২ ছন্দে রচিত শ্লোকে শেষ হইয়াছে। এই প্রশস্তিতে এক মহাদ্বিজ পরিতোষের পৌত্র এবং শূদ্রকের পুত্র বিশ্বাদিত্যের দ্বারা ৺জনার্দ্দন ভগবানের মন্দির নির্ম্মাণের বিষয় সূচিত হইয়াছে। বাজি বিদ্যাবিশারদ অর্থাৎ "ভেট্" সহদেব দ্বারা এই প্রশস্তি রচিত এবং অধীপ সোমের পুত্র সত্যসোমের দ্বারা খোদিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা নয়পাল দেবের রাজ্যকালের পঞ্চদশ বৎসরে উৎকীর্ণ বলিয়া মনে হয়। নয়পাল দেব মহীপাল দেবের পুত্র এবং মগধরাজ

* J A S B 1900 pt-I p 184.

ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; এবং ৺রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস-সম্পাদিত "টিবেটান ক্রনিকলস্" আদি পুস্তক পাঠে আমরা সম্যকাবগত হই যে, এই মহারাজ নয়পাল দেব বঙ্গের গৌরব আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের (অতীষ) সমসাময়িক ভূপতি ছিলেন এবং নয়পাল দেবের রাজ্যারোহণ কাল আমার মনে হয় যে, ১০৩০ ও ১০৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হইবে। অতএব এই প্রশস্তি সম্ভবতঃ ১০৪৫ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অবিসম্বাদীরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এই লিপি পরে প্রদত্ত হইল :—

১। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ উন্নিদ্রনীল কমলাকরকায় কান্তিঃ স্বর্ণাভিরাম রুচির দ্যুতিপীত বাসাঃ। উদ্ভাসয়মান ইব কংসালয়া ঘনৌঘৌ বিষ্ণুঃ প্রিয়াদ্বয়বরেণ যুনক্তু যুষ্মান্ ॥(১)

২। ব্যানর্শ্মায় সমস্ত বস্ত সুখিনো বিপ্রান্ প্রজানাম্ পাতয়াম অধ্যাষ্ট ইব আত্মানৈব পরিতো মূর্ত্তি প্রপঞ্চম্ দধৎ। উত্তুঙ্গে; শরদভ্র শুভ্র রুচিভিঃ সৌধাম্রি কুত্ত অলক্কীর্ত্তির্শ্মোক্ষদ্বারং অনর্গলং জ ৩। গতি সা শ্রীমদ্ গয়া গীয়তে ॥(২) বেদাভ্যাস পরায়ণ দ্বিজগণ উদ্গীর্ণ উগ্র পাঠ ক্রমাদ্ উচ্চৈরুচ্চারিতধ্বনী ব্যতকরৈর্যত্রাবধার্য্য গিরাঃ। কিঞ্চ আযত্রিত হোমধূম-পটল ধ্বান্ত আবৃতৌ সাম্প্রতং ধর্ম্মো।

৪। যত্র মহাভয়াদরইবকলেঃ কালস্য সর্মাতিষ্ঠত্তে ॥

অত্যাদৃতৈস্তু নরৈর্ন রুনীল পদ্মনিশছদ্ম সদ্মনিশতাং সুকৃতাস্তিমর্যে (৩) নিহার হার

১। বসন্ত তিলক।
২। শার্দ্দূল বিক্রিড়িতং।
৩। বসন্ত তিলক।

শরদিন্দু বিবুদ্ধ কুন্দ সন্দোহসুন্দর মহাদ্বিপ রাজ বংশে ॥ ৪

৫। (১) অজাত লক্ষ্মীদ্বিজরাজ শেখরঃ সমন্ততো ভূবিবিভূতি ভূষণঃ বভূধবশ্রো গিরিরাজ পুত্রিকা প্রিয়োপময় পরিতোষ সঞ্জকঃ॥ অনন্য সামান্য দিগন্তমন্দিরৈঃ ত্রিবর্গ সংসর্গি গুণাশ্রয়ৈর্জগৎ, শরৎশুভ্রাধাম গভস্তিতস্করৈঃ সমস্ততোযস্যযশোভিরাবৃতম্ ॥

৬। বংশস্থবিল। পরের শ্লোকও তাহাই।

দ্বিজবরবিনতানন্দননিরমাবটিকাঃ সমা— শ্রিতো লক্ষ্যা, তস্যতদস্য তনুজন্মা মুরারিমুর ইব শূদ্রকো ভূতঃ ॥* (৭)

৭। হৃদোদ্যাতা শরৎ সুধানিধি শুদ্ধ কুন্দাভিরামচ্ছবিচ্ছাটৈশ্চন্দ্রম অদ্ভুদ্যশো ভিরভিতো যস্য ত্রিলোকীতলং। কর্পূরৈরিব পুরিতং মলয়জক্ষোদৈরিব আলেপিতং ক্ষুব্ধ ক্ষীরপয়োধিতুঙ্গলহরী লেহৈরিব আপ্লাবিতং ॥† (৮)

৮। সত্যং ধর্ম্মসুতে স্থিরত্বং অচলে গাম্ভীর্য্যং অম্ভোনিধৌ বহ্বাশ্চর্য্যা গুণাঃ মতিঃ সুরগুরৌ তেজস্বিতা ভাস্বতি। এতে সন্তি গুণাঃ পৃথক পরম

জিগীষা রসৈবিখ্যাদিত্যং অজীজনৎ সুতং অ

৯। সা বেভিঃ সমস্তৈঃ শ্রিতং ॥ (৯) যস্তাপাস্ত করঃ

শুদ্ধা নিধিরিব আপূর্ণঃ কলানাং গণৈর্যস্তন্মাভূদয়াশ্রিতো রবিরিব প্রৌঢ়ঃ প্রতাপোদয়ঃ। প্রত্যস্তকরং আভিবাঞ্ছিত ফল। যত্র প্রদানশ্রিভিঃ শ্লিষ্টো

১০। জঙ্গম কল্প বৃক্ষ ইব যো যাতঃ

* আর্য্যা

† শার্দ্দূল বিক্রিড়িতং। ইহার পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোকও এই ছন্দে রচিত।

সমস্তার্থিনাম্ ॥(১০) দোর্দ্দণ্ডদ্বয় চণ্ড বিক্রম কাশাদিশ্বাজি শৌর্য্যাদ্ভূতঃ ক্রীড়োন্মূলিত বৈরিবর্গ বিপিনঃ প্রৌঢ় প্রতাপারুণঃ বারি আলিম্ভ যথাব্ধি রাপদিতথা প্রবা

১১। ক্ত ধৈর্য্যক্রমঃ কিঞ্চ প্রাকৃত সর্ব্ব গর্ব্ববিমুখঃ সম্পৎ স্বনিম্নাস্বপি ॥(১১)

শ্রীব্যাঘ্রয়ব্যাসন্তো বিশদৃশ • সমাচার বিকাশো জনোমদোনের স্বগনুমূপহসঙ্ক ভজ্যতে ইয়ং সা যস্য প্রঃসমুচিত বি

১২। লাসাভ্যুদয়িনী (১) যথার্থালঙ্করাঃ সমধিক জনানন্দ বিষয়ঃ ॥(১২) যস্যা-কৃত্রিম মেদুরাশ্রিত মহি পর্য্যন্ত সম্বাদিভি নৃত্যারম্ভ বিজ স্তনোদ্ধতভূজৈ রুদ্গীয়মানা জনৈঃ সানন্দোৎফুল্লকম্ বি

১৩। মানমস রুদ্দৈবৈবিলম্বাম্বরে শ্লাঘা ঘূর্ণীত মূর্দ্ধাভিনিপাতিতৈঃ কীর্ত্তিঃ সযা (২) কর্ণ্য তে ॥(১৩)

সাভাস্থয় পরিতোষ লেশতো ভিক্ষিতানি শনকৈঃ সকটাক্ষং যস্য বিম্বিড্ অঙ্গকুলকুলানি প্রাপ্নুবন্তি নিধ (১)

১৪। নানি ধনানি ॥ ১৪) নিনাদন্তি-দন্তি-বর হস্তি যানি কুচিতানি তানি চ হুরুন্নয়া নি অতিমন্দ মন্দগতি গহ্বরাসু নিবসন্তি সন্তি গিরিকন্দরাসু (২) ॥(১৫) সন্ততেন ততেন তেজসা দুর্ন্নয়স্য নয়স্য বিদ্বি

১৫। যাং। আকুলানি কুলানি দুর্গমাদ্‌-গতানি গতানি দুর্গমং (৩) ॥(১৬) সপ্তাম্বুরাশি বিশরৎ প্রথমেখলায়াযস্যা বভূবঃ কতি ন ভূমিভূজো বভূবুঃ। সিদ্ধিং নকস্যচিদগাৎ যদনল্পকল্পৈস্তেনাত্রা কীর্ত্তণ মকা।

১৬। বি জনার্দ্দনস্য (৪) ॥(১৭)

কৈলাশাচলশৃঙ্গসম্ভ্রমং অধঃকুর্ব্বৎ প্ররূঢ়ো-দয় প্রালেয় দ্যুতিকুন্দসুন্দরযশপুঞ্জোপ মেয়াকৃতি। যত্রোত্তুঙ্গশিখাগ্রসঙ্গতশরচ্চন্দ্রাং শুশুভ্রশ্রিভিমু্ঁক্ষন্নুতনমঞ্জরীরিব পতা ॥১৭ কা ভির্নভো রাজতে (১) ॥১৮ বাজি বৈদ্য সহদেব নিরুক্তিঃ তৎপ্রনরিন্তিয়মস্তনিতান্তং প্রেম সৌহৃদসুখৈকধরিত্রী সজ্জনস্য হৃদয়ে রমনীব (২) ॥(১৯) শ্রীমতোহধীপ সোমস্বাম্ব-জেনর্জ্জিতং যস্য।

১৮। উৎকীর্ণ কর্ম্মণি শ্রীমৎ সত্যসোম শিল্পিনা (৩) ॥ (২০)

সমস্ত ভূমণ্ডল রাজ্য ভারমবিভ্রতি শ্রীনয় পাল দেব বিলিখ্যমানে দশপঞ্চ শঙ্খ্য সম্বৎসরে সিদ্ধি মগাচচ কীর্ত্তি (৪) ॥ (২১)

এই পরবর্ত্তী নৃসিংহ দেবায়তনে প্রাপ্ত নয়পাল দেবের লিপি পাঠে জানা যায় যে, ইহা ৺গদাধরের মন্দির নির্ম্মাণ ও তৎনির্ম্মাতার নাম ও তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ-গণের বিবরণ বিশেষরূপে লোকসমক্ষে উদ্গীত করিয়াছে। বিশ্বরূপ কর্তৃক এই মন্দির নির্ম্মাণের কাল এই লিপি হইতে প্রকটিত হয়। ইহা নৃসিংহদেবের মন্দিরের অভ্যন্তরে মহন্ত ৺পরমেশ্বর দয়াল কর্ত্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ৺নৃসিংহদেবের মন্দির ৺গদাধরের মন্দিরের পিছনেই অবস্থিত এবং উভয় মন্দিরই রাণী

(১) শিখরিনী

(২) শার্দ্দূল বিক্রিড়িতম্

১। প্রথমচরণ রথোদ্ধতা ; দ্বিতীয় চরণ স্বাগতা।

২। জনতি।

৩। অক্ষরাবতি।

৪। বসন্ততিলক।

১। শার্দ্দূল বিক্রিড়িত।

২। স্বাগতা।

৩। অনুষ্টুভ।

৪। উপযাতি।

অহল্যাদেবী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, বর্ত্তমান বিষ্ণু মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত। ৺গদাধরের এবং ৺নৃসিংহদেবের বর্ত্তমান মন্দির সম্ভবতঃ বিশ্বরূপ নির্ম্মিত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ মাল মসলা ইষ্টক প্রস্তরাদি লইয়া গঠিত বলিয়া আমার অনুমান কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দিরের মত মনে হয়।*

নৃসিংহদেব-লিপি।

১। (১) ওঁ লক্ষ্মী শশিরত্নপ্রভৃতি বারিনিধেরনেক মন্থাকুলাদদিগতা পুরুষোত্তমস্য। স্নিগ্ধস্তিরোবলিত সম্মদ ঘূর্ণমান নেত্রাবলোকন নিরস্ত সমস্ত বিঘ্নাঃ॥

২। সেহয়ম্ ব্রহ্মপুরী গয়েতি জগতি খ্যাতা স্বয়ংবেধসা স্থাতুম্ ব্রহ্মবিদাম্পুরী। বঘটিত মোক্ষস্য সৌধ্যস্য চ ত্রয়হঃ কিঞ্চ ভবন্তি যত্র পিতরঃ প্রেতা

৩। লগ্নাবাসিনঃ পাদস্পৃষ্টজলপ্রদান বিধিনা নাকাঙ্গনা নায়কাঃ অস্যাম্ বভূব পুরি বক্রগতির্ব্বিজিহ্বঃ। সম্রাড ভুজঙ্গ রিপুবচ্যুত পাদসেবী। যো ৪। নাম বিষ্ণুঃথ বৎ দ্বিজরাজবর্য্যঃ প্রীত্যা সতাঞ্চ পরিতোষ ইতি প্রসিদ্ধঃ॥ তস্মাদ্ বিধেরিব বভূব সনৎকুমারঃ শ্রীশূদ্রকো বিমল বুদ্ধির নেকবিদ্যঃ।

৫। ভূয়োপি যেন বিধিনৈব কৃতা গায়েয়ম্ বাহোর্বলেম সুচিরং পরিপালিতা চ॥ তস্মাদ্বিষায়ত সুতঃ সুতবদ্দ্বিজানাং যোহভূৎ সুবিস্ময় রসা বহুকর্ত্তক ৬ শচ॥

বিশ্বাপকারক নিরাকৃত বেবতীর্থঃ শ্রীবিশ্বরূপ ইতি কীর্ত্তিত বিশ্বরূপঃ॥ (৩) যং প্রাপ্যচাথি জনবৃন্দমকল্পদানুমাবির্ভবৎ পুলকজালমনস্ত মোদং। স্ফাতিস্ফু রন কৃতার্থ তয়া দুরাপ চিন্তামণি গ্রহণকম্ নকদাপি দধ্যৌ॥ যেনা স্মরারি চরিতেন মহোদয়েন যাত্তিরসা তলমিবাবনি ৮। রুদ্ধতেয়ং শ্রীমদ্ গয়া কলিমল দ্বিজরাজ পক্ষ সংক্ষোজকাম্প ততস্য ভুজবিক্রমেণ॥ যশ্চৈ বিশুদ্ধ চরিতায় নিসর্গ সৌর্য্য রাশি প্রিয়ায় নি

৯। নয়ামল ভূষণায় আবাল্যতঃ প্রভৃতি দেব মনুষ্য লোকো বদ্ধাঞ্জলি শ্চিরতরং স্ফুরয়াঞ্চকার॥

তেনেমাঞ্চ গদাধরাদি নিলয়ব্যাজেন তাঃ কীর্ত্তি ঃ শ্বেতাশোরিবরশ্ময়ঃ সুঘটিতাঃ সন্তাপশান্ত্যৈ সদা যত্রাম্ভোনিধিবীচিবদ্দশ দিশাং প্রক্ষালনৈ কচ্ছতাং পাতাল প্রতিবাসিঘোর তিমির প্রদ্ধঃ স। দীপাইব॥ এতাঃসন্তু গয়াপুরী সুতরুনী ভূষাবলী কীর্ত্তয়ো যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌচ গগনং শ্রীবিশ্বরূপাত্মযঃ কর্ত্তাসাঞ্চ তথাপুরাণ পুরুষাং রাজ্ঞোপিধিকৃত্য সদ্যেনাকস্মিক বিস্ময়ৈক রসিকো মুহুর্মুচ্ছিতঃ।(৪) দাক্ষিণ্যা দুপরুদ্ধেন প্রীতিস্তিমিত চেতসা। ১৩ প্রশস্তি রেষা বিহিতা বৈদ্যঃ শ্রীচক্রপানিনা॥ বিজ্ঞান কৌশলোল্লাস বাতনৈপুনকর্ম্মণা প্রশস্তি রেষা লিখিতা (৫) সর্ব্বানন্দেন ধীমতা॥ ক্ষীরাম্ভোনিধিমথ ১৪। লাঞ্ছনলক্ষ্মীয়াস্তু বো ভর্ত্তুঃ শ্রীনয়পাল দেবনৃপতে রাজ্যশ্রিয়ঃ বিভ্রতঃ সম্বস্তেতরসৈন পঞ্চদশমে রাজ্যস্য সম্বৎসরে, কীর্ত্তিঃ সিদ্ধিমুপগতা ভগবতঃ ১৫ শ্রীমদ্ গদাধারিণঃ॥

---

* Proc A. S. B 1902 pp 66-67.

(১) বসন্ত জ্ঞেয়ং বসন্ত তিলকং তভজা জগৌগঃ।

(২) ইন্দ্রবজ্রা।

(৩) বসন্ত তিলক।

(৪) অনুষ্টুভ।

(৫) শার্দ্দুল বিক্রিড়িত।

এইখানে বলা আবশ্যক যে, নয়পাল দেবের আত্মীয় স্বজনের বিষয় ইতিহাস বা প্রস্তরলিপি আদি অদ্যাবধি কিছুই আবিষ্কৃত করিতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র তৃতীয় বিগ্রহ পালদেব তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহাসনাধিরোহণ করেন। আমার মনে হয় যে, গয়া নগরে যাবতীয় লিপি অদ্যাবধি দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নয়পাল দেবের রাজ্যকাল কৃষ্ণদ্বারিকা এবং গদাধর লিপি উৎকীর্ণ কালের বড় বেশী দিন পর পর্যান্ত থাকে নাই এবং ১০৪৬ ও ১০৫০ সালের মধ্যেই শেষ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। চক্রদত্তের টীকা হইতে আমরা অবগত হই যে, চক্র পাণিদত্ত তাঁহার সূপকারও রন্ধনশালা পারদর্শক ছিলেন। (১) রাজ্যারোহণ করিয়া তৃতীয় বিগ্রহ পালদেব তাঁহার পিতৃ শত্রু চেদীশ্বর কর্ণের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন। বিগ্রহপাল দেবের প্রথম রাজ্য কাল বহু ঘটনাযুক্ত যুদ্ধ বিগ্রহে পরিপূরিত; এক দিকে তিনি চন্দেলারাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার দ্বারায় আক্রমিত, অপরদিকে চেদীশ্বর কর্ণ দ্বারা নিগৃহীত, অন্য দিকে মালব রাজ উদয়াদিত্যের দ্বারা বিদ্ধস্তীকৃত এবং অপরদিকে আনাহলওয়াররাজ ভীমসেন কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইলেও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের উচ্চ শিখরদেশে আরোহণ করিয়া সমগ্র উত্তর ভারত করকবলায়ত্তীভূত করিতে বিস্মৃত হন নাই। পালরাজের সহিত শেষ যুদ্ধে সম্রাট কর্ণদেব সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া সন্ধির জন্য প্রার্থী হইলে স্বীয় অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা যৌবনশ্রীকে পালরাজের হস্তে সমর্পণ করিয়া অব্যাহতি পান। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কৃত "রামপাল চরিত" পাঠে আমরা ইহা সবিশেষ অবগত হইতে পারিয়াছি। কর্ণদেব ও তাঁহার পুত্র প্রায় শত বৎসর রাজদণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পরিচালন করেন। বিগ্রহপাল দেব কেবল মাত্র ১৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি অধিককাল রাজদণ্ড পরিচালন করিতে থাকিলে, বোধ হয়, পাল রাজ্য আরও কিছু অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারিত, কিন্তু ভগবানের তাহা ঈপ্সিত নহে বলিয়া আন্তর্গণিক বিবাদ, তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে আত্মকলহ, সামন্ত চক্রের স্বাধীন হইবার স্বতই চেষ্টা ও কূটনীতিজাল বিশাল পাল রাজত্বকে ক্রমশঃ অন্তঃসার-শূন্য করিতেছিল। পাল রাজ্যের অবনতি-স্রোত এই সময় হইতেই আরম্ভ হয় এবং এই অধোগতি কোনরূপেই ব্যারিত করা যাইতে পারে নাই। যে সকল দেশ ও রাজ্য এই সময় বিশাল পাল রাজত্ব হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছিল, কোন পরবর্ত্তী পাল নৃপতি সেইগুলি পুনর্বিজয় বা উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন নাই; কাজেই পাল রাজত্ব ক্রমশই শনৈঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

বিগ্রহপাল দেবের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ লিপিগুলির মধ্যে দিনাজপুরের অন্তর্গত আমগাছীতে প্রাপ্ত তাম্রানুশাসন বিশেষ উল্লেখযোগ্য; কিন্তু ইহার বিষয় আমার বলিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। তাহার পর গয়ানগরের মধ্যে মাড়নপুর গ্রামের অন্তর্গত অক্ষয়বট তীর্থের মধ্যে প্রাপ্ত "অক্ষয় বট" লিপি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই

(১) কায়স্থ পত্রিকা—১৩২৭, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা দেখ, ও শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কৃত "চক্রপাণি দত্ত" নামক পুস্তক দেখ।

লিপি পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার রাজ্যকালের পঞ্চমবর্ষে ৺বটেশ্বর লিঙ্গ এবং ৺প্রপিতামহেশ্বর শিব লিঙ্গদ্বয় নির্ম্মাণের বিষয় জ্ঞাপন করিতেছে। কানিংহাম সাহেব তাঁহার রিপোর্টের তৃতীয় ভাগে এই লিপি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। প্রপিতামহেশ্বর শিব লিঙ্গ বর্ত্তমান গয়া শ্রাদ্ধের অন্তর্গত এক বেদী হইতেছে। বহু হিন্দু এইখানে পিণ্ড দান করিয়া থাকেন। এই লিপি স্থানে স্থানে নষ্ট হওয়ায় শুদ্ধরূপে উদ্ধৃত করা গেল না। যতদূর পারিয়াছি, মূল হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

অক্ষয়বট লিপি।

১। ওঁ ওঁ নমঃ শিবায় ॥ গয়াভাণ্ডাগারং নিরবধিজগদ্দোষ বিজয়ি স্ফুরজ্জজ্ঞানজ্যোতিঃপ্রসরনিহতধ্বান্তনিচয়ং কিমপ্যন্তঃ শান্তম্ সহজসুখ পীযুষ লহরী। ......

২। র হৃদয়মজ্যোহরতু বঃ ॥ আসন্ধায়া কলঙ্কান্ প্রতি বপুষইব ব্রাহ্মণান্ অজস্রম্, স্বর্গদ্বারাধিরোহামৃতপদসুখপ্রাপ্তয়ে প্রেত্যভাজঃ। সাক্ষাৎ সংসার ভূষাব।............

৩। শ্রীমদ্ ভূমিং শর্ম্মং ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীনিলয়মিব পুরীম্ শ্রীগয়ামেষচক্রে ॥ (১) গয়ায়ামেতস্যাং পুরি সকল সৌন্দর্য্য নিলয়ে দ্বিজাতীনাং মান্যোদ্বিজপদ সরোজাত ....

৪। ম প্রেম্না পরম পরিতোষস্য জননাদ্ অভূদ্ধন্যো শ্রীমান্ স খলু পরিতোষাহ্বয় ইতি ॥ তস্মাদ্‌ভূজ্জলধেরিব শীতরশ্মিঃ শ্রীশূদ্রকোবিমলকান্তিরনন্তলক্ষ্মীঃ।

৫। কণ্ঠপ্রবাভিরামং, আনন্দিতানি যশসা ভুবনান্তরাণি ॥ (২) আসাগ্য-

মরবাজরাজ্যপদবীং দেবীভিরাক্রীড়িতম্ দিব্যাঙ্গক। মনঙ্গদর্পদলনোদ্দাৈরকমোদং বপুঃ। ....

৬। স্তি কৌতুকরসাং মর্ত্ত্যোহবতীর্ণ স্ততো. জাতোদেবকুমার মূর্ত্তিরসমঃ শ্রীবিশ্বরূপাহ্বয় ॥ যো বিধ্বস্ত সমস্তবৈরিনিবহঃ স্ফুরৎপ্রতাপানলঃ সৌজন্যস্য নিদান। ......

৭। স কেলিক্রমঃ সান্দ্রানন্দ মেয়ো নিসর্গমধুর ব্যাহাররত্নাকরো দীনানাথবিপন্নচারণগণত্রাণায়চিন্তামণিঃ ॥ গণ্ডস্থলে মৃগমদা মলপত্রভঙ্গান্ স্বৈরং।..................... ..

৮। লেখনীভিঃ অদ্যাপি যস্যস্থ্যকিন্নরগীনাংমায়াং দেব্যঃ শীলাসু বিজয়স্তুতিমালিখন্তি ॥ (৩) ধর্ম্মোৎসবসিতং মুদাবিহসিতং সংলোকমর্য্যাদয়া ত্রৈয্যা বিস্ফুরিতং। ....

৯। ত্রিভির্জ্জৃম্ভিতং। যস্মিনা স্বামিনি সর্ব্বতঃ সমুদয়ে তেপার্থিনঃ সাহসম্ সান্দ্রানন্দময়া স্বদৈন্যবিরহান্নহ্যন্তি পূর্ণাশয়াঃ ॥ নোচ্চৈশ্চণ্ডকরোনচাপি বিগত। ....

১০। তেনাস্তম্ যাতি যদাস্মভিঃ প্রতিহতোনান্তৈরপূর্ণোজ্জবঃ। জিহ্বাগ্রেণবিনাগসঃ প্রতিমূর্ত্তাপস্থিরানগ্রহীন্ নৈবাসঙ্গদিগম্বরৈকনিরতো যো বিশ্বরূপঃ। ....

১১। মরাধিপোপিচকিতো ব্রহ্মাপি যদ্‌বিস্মিতোদেবো বিষ্ণুরপি স্ফুটং বিহসিতো রুদ্রোপিরোমাঞ্চিতঃ। উদ্দাম প্রসরৎপ্রসন্নবহলে যৎকীর্ত্তিকল্লোলিনী গম্ভীরান্তসিমজ্জ।........................ ..

১২। পি সম্বোধিত ॥ যর্দ্ধ্‌গমম্ সরতি দূরতরং স্বরূপং যং জ্ঞগনা। যং জন্ম .... ত .... আসীৎ। সহস্র ....

১। শার্দ্দূল বিক্রিড়িত।
২। ইন্দ্রবজ্রা।
৩। বসন্ত তিলক।

শ্রীমবিরাহন চতুর্দ্দশ্যামারম্ভরাথ ইতি যঃ স্ফুটতাম্বুপেতঃ ॥ অস্মাং ভূ।..............

১৩। পা ধর্ম্মেণ মর্য্যাদয় রাজা শ্রীভির লক্ষ ণাঃ পুনরমীভোটৈগকদা শ্রীবিশ্বাবিধে (?) এব কীর্ত্তন কথা গীয়। ....

১৪। কীর্ত্তি......ত্বাং বিস্ময়কর......... আপি শৌর্য্যাদসৌ ....ত্ত নি......... শ্রীরূপি......... সিদ্ধি ....পুনরী-দৃশী ...... ভবতিকিং শ্রীবিশ্বরূপোঙ্ক তরেখেব প্রতৈপ।....................................

১৫। যস্তে অদ্ভুতা। অস্মৈব......... প্রপিতা মহস্য মহতীমম্বাপ্যকীর্ত্তিং......... ততঃ সাধিতঃ। উদ্ধত্যর্থি নিসর্গধর্ম্ম নিরন্তো যো।....................................

১৬। ....সিদ্ধিমনয়ৎ তামেব কীর্ত্তিং পুনঃ। কিং ক্রমঃ............যস্যাসাধুগুণস্য নাস্তিমহতঃ। কিন্ন ....;

১৭। রাশিঃস্ববিশৃতবয়োচেনাকস্মিক বিস্ময়েন মুখরালোকঃ কর্ত্তুরগ্রে নিবসনঃ, স্ফুরদ্ধারাগারম্ বিসৃজ।.........................

১৮। ব্যাম্বর সঞ্চর তৃপ্তিবর্দ্ধনোজ। প্রশমনং সুরাভাণ্ডং জলদঃ॥ কনকেশ্বর জলদঃ শ্রীবিশ্বরূপাবরো।.......... ....

১৯। তা সদাচরৌস্ববিধিতঃ শ্রীসৎকুলা সর্ব্বশ সৎকুলাদৃতোঽক্ষয় বত্রেঢো দেয়োবটেশাহ্বয়॥ ইত্যাদ্যাস্বমনোজ্ঞরূপ রচনারম্ভা।...... য।.............................. ......

২০। জ্যাং চষঃ। যেনাত্যদ্ভূত বিক্রমেণ তরসা শ্রীমদ্‌গয়ামণ্ডলে আসন্দারসুদগ্রধর্ম্ম বিজয়স্তম্ভাইবো রোপিতঃ॥ তেনাই.........

....

২১। ল বিষমম্ নীরাহাবতারান্বুতঃ॥ কীর্ত্তিঃ শ্বেতগভস্তিহস্তরচিতে ইতি রাজতাং দেবস্য প্রপিতামহস্য শ্রীই...... ....

২২। ত্তি নামধেয়। সত্ত্বেব ধ্বনিনঃ কিম্বা বাহু ক্রমহে। কিংত্বিদৃগ্ যদি কীর্ত্তনম্ ভগবতঃ কেনাপি নিষ্পাদিত শ্রীবিশ্বা বি ....

২৩। যঃ স্বস্থপমোক্ষ (?)।—যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ সুরসরিদ্ধাত্রী নভোমণ্ডলম্। কর্ত্তুং কীর্ত্তিকদম্ব (?) স বিজয়ী শ্রীবিশ্ব রূপাহ্বয়......................................

২৪। গণিতু মালঙ্কায়িতো ভগবান্ ভর্ত্তু বিগ্রহপালদেব নৃপতে রাজ্যাশ্রয়ঃ বিভ্রতঃ। সম্প্রাপ্তে তরসৈব পঞ্চ গণিতে রাজ্যস্য সম্বৎসরে ....

২৫। বিশ্বাদিত্য গুণোৎক্ষেপ প্রীতি স্তিমিত চেতসা

....

২৬। প্রশস্তি বিহিতাচৈষা বৈদ্য শ্রীধর্ম্মপাণিনা।

এইখানে বলা আবশ্যক যে, ৺গদাধর দেবের মূর্ত্তির নিম্নে যে একটী লিপি দৃষ্ট হয়, তাহা এই রাজার রাজ্যকালে উৎকীর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; ইহা প্রায় অধিকাংশই চূণ বালিতে ঢাকা পড়িয়াছে। তাহা অপসারণ করিলে সমগ্র গয়াবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের হৃদয়ে তীব্র আঘাত লাগিবে বলিয়া সম্পূর্ণ লিপিটী উদ্ধার করা যাইতে পারিল না। এই লিপির লিখন প্রণালী ৺প্রপিতামহেশ্বরের "অক্ষয় বট" লিপির অনুরূপ বলিয়া ইহা বিগ্রহপাল দেবের সময়ে উৎকীর্ণ বলিয়া আরোপিত হইয়া থাকে। এই লিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

গদাধর লিপি।

১। ওঁ নমো মার্ত্তণ্ডায়॥ জাগর্ত্তি যস্মিন্ দিতে প্রযাতি চাস্তম্বশেতে জনতা সমস্তা।

ত্রৈলোক্য দীপং তমনন্ত মূর্ত্তি। মব্যাহতা জংশরণং প্রযাত ॥ (১)

২। সেয়ম্ ব্রহ্মপুরী গয়েতি জগতি খ্যাতা স্বয়ং বেধসা স্থাতুং ব্রহ্মবিদাং পুরীব ঘটিতা মোক্ষস্য সৌধা স্তু চ।

৩। ক্রমহ কিঞ্চ ভবন্তি যত্র পিতরঃ প্রেতালয়া বাসিনঃ পাদস্পৃষ্ট জল প্রদান বিধিনা নাকাঙ্গনা নায়কাঃ ॥ অস্যাশ্চ

৪। ভূব পুরি বক্রগতি দ্বিজিহ্বঃ। সম্রাট ভুজঙ্গরিপুরচ্যুতি পাদসেবী। যো নাম বিষ্ণু রথবৎ দ্বিজরাজবর্য্য প্রীত্যা সতাঞ্চ পরিতোষ ইতি প্রসিদ্ধঃ ॥ তস্মাদ্ বিধেবিব বভূব *

(১) ইন্দ্রবজ্রা।

* এই সকল লিপি পাঠে বিগ্রহ পাল দেবের আত্মীয় পরিজনগণের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বিগ্রহপাল দেবের তিন পুত্রের বিষয় আমরা ঐতিহাসিক গবেষণায় জানিতে পারি। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় সুরপাল এবং দ্বিতীয় মহিপাল দেব, মথন দেব ও সুবর্ণ দেবের ভগ্নী রাষ্ট্র কূট রাজকন্যার গর্ভজাত পুত্র হইতেছেন এবং ইহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ রামপাল দেব, যাঁহার যশোভাতি ও কীর্ত্তিকলাপ সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত রামচরিত কাব্য অদ্যাবধি জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিতেছে। চেদীশ্বর সম্রাট কর্ণদেবের কন্যা যৌবন-শ্রীর গর্ভজাত সন্তান হইতেছেন। রাম পালদেবের তিনপুত্র রাজ্যপাল দেব, (পিতার জীবদ্দশায় পরলোক গমন করেন) কুমারপাল দেব এবং মদন পাল দেবের পুত্র তৃতীয় গোপাল দেবের সময় হইতেই বিশাল পাল সাম্রাজ্য ধ্বংসের চরম সীমায় পঁহুছিয়াছিল। ইহাদিগের বিষয় সামান্য ২।৪ কথা পরে বিবৃত করিব।

তৃতীয় বিগ্রহ পালদেবের স্বর্গাধিরোহণের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল দেব সিংহাসনে উপবিষ্ট হন; কিন্তু তাঁহার কুনাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা রাজকার্য্যে শৈথিল্য মাৎস্য ন্যায়ে প্রপীড়িত প্রজাপুঞ্জ ও সমগ্র সামন্তচক্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। পাঠক এই সময়কার জলন্ত ইতিহাস রামচরিতে পাঠ করিতে পারেন।

পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক গবেষণা এই লিপিটীকে গোবিন্দপাল দেবের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ বলিয়া স্থির করেন। এ সম্বন্ধে আলোচনা পরে করিয়াছি।

মহিপাল দেব তাঁহার প্রাচীন বা নব্য-মন্ত্রি সম্প্রদায়ের সৎপরামর্শ, সামন্ত চক্রে সদুপদেশ, গণনায়ক ও গোষ্ঠীপতিদের সহানুভূতিসূচক নীতি বাক্য এবং প্রজাতন্ত্রের রাজনৈতিক আবেদনাদি আদৌ দৃকপাত না করিয়া সদাই সন্দিগ্ধ মনে খললোকের সাহচর্য্যে দিন যাপন করিতেন। কবি বিল্‌হণের বিক্রমাঙ্কদেব চরিত নামক সুন্দর পুস্তক পাঠে আমরা এই সময়ের সমসাময়িক অনেক কথা জানিতে পারি। কোন কোন কূটাভিসন্ধির লোক রাজার কর্ণে এই মিথ্যাপবাদ প্রবেশ করাইয়া দেয় যে, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদ্বয় তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিবে; মহীপাল দেব সন্দিগ্ধচেতা লোক ছিলেন, তাহা আগেই বলেছি; তিনি তাঁহাদের কারারুদ্ধ করেন। এই সকল ঘটনা "রামপাল চরিত" নামক পুস্তকে বিস্তারিতরূপে বিবৃত আছে। এই সময়ে সমস্ত চক্রের অন্যতম মাহিষ্যরাজ দিব্ব্যোকের অধিনায়কত্বে সমগ্র বরেন্দ্রী স্বাধীনতার বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া মাহিষ্য ক্ষত্রিয় নামের সার্থকতা সমগ্র জগৎ সমক্ষে

তারস্বরে প্রচারিত করিল। মহীপাল দেব এই ক্ষুদ্র বিদ্রোহী, সামন্ত চক্রের শাসন মানসে সামান্য সৈন্য লইয়া প্রয়াস করিলেন বটে, কিন্তু বীরবর দিব্ব্যোকের সুশিক্ষিত অস্ত্র ও শস্ত্রবিশারদ বিপুল বাহিনীর সমক্ষে মগধরাজ-শক্তি পরাজয় স্বীকার করিল; মহীপাল দেব, স্বীয় রক্তে তর্পণ করিয়াও পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানে অসমর্থ হইয়া স্বয়ং যুদ্ধে হত হইলেন। মহীপাল দেবের মৃত্যুর পর রামপাল দেব কারামুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু পাল বংশের বন্ধু ও পোষক ও সহকারী প্রজা ও মন্ত্রীবৃন্দ মহীপাল দেবের ভ্রাতা দ্বিতীয় সুরপাল দেবকে সিংহাসনাধিরূঢ় করাইলেন এবং এই ঘটনা আমরা মদনপাল দেবের মনহলি লিপি হইতে জানিতে পারি। সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁহার রামপাল-চরিতে দ্বিতীয় সুরপাল দেবের রাজ্যারোহণের কথা সম্ভবতঃ অনবধান বশতঃ আদৌ উল্লেখ করেন নাই। মনহলি লিপিতে প্রথম গোপাল হইতে মদনপাল দেব পর্য্যন্ত যাবতীয় পাল রাজগণের তালিকা আমরা পর পর দেখিতে পাই। সুরপাল দেব কবে রাজ্যারোহণ করেন এবং কবেই বা তিনি রামপাল দেব কর্ত্তৃক সিংহাসন চ্যুত ও হত হন, তাহার সময় ও কালের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস আমাদের সমক্ষে অতীতের রুদ্ধ দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া জলন্ত চিত্রে প্রদর্শন করিতেছে যে, কেবল বিলাত বা ভারতের মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এক ভাই বা খুড়া তাঁহার সমকক্ষ ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিভৃতে হত্যা করিয়া সিংহাসনারোহণে কণ্টক দূর করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন নহে, সুদূর বৌদ্ধ যুগেও এরূপ অভিনয় এই বঙ্গের ও মগধের ইতিহাসে সে দৃশ্য বহুপূর্ব্বে অভিনীত হইয়া গিয়াছে, তাহা পরে দ্রষ্টব্য।

যাহা হৌক, জগতের ইতিহাস ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি জ্ঞাপন করে, তাহা ঐতিহাসিক মাত্রই অবগত আছেন; মহীপাল দেব শেষ জীবনে আওরঙ্গজীবের মত এমন উচ্ছৃঙ্খল ও সন্দিগ্ধচেতা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ভ্রাতৃদ্বয়কে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের কোমল প্রাণে অশেষ যাতনা ও কারাক্লেশে ব্যথিত করিতে বিরত হন নাই। এদিকে মাহিষ্য রাজ-দিব্ব্যোক ভগবানের নিয়মানুসারে কাল গ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার ভ্রাতা রুদ্যোক বরেন্দ্রীর সিংহাসাধিরোহণ করেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার পুত্র ভীম ঐ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ভীম স্বীয় রাজ্য বহিঃ শত্রু হস্ত হইতে রক্ষার জন্য যে বিশাল জাঙ্গাল প্রস্তুত করান, তাহা অদ্যাবধি অতীত মাহিষ্য রাজের কীর্ত্তি জগৎ সমক্ষে অক্ষয় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে; "ভীমের ডমর বা ভীমের জাঙ্গাল" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মদ্বন্ধু বাবু হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার "ভ্রান্তি বিজয়" পুস্তকের ২৭৮ ও তৎপরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় সুন্দররূপ বর্ণনা করিয়াছেন; ইহার সুন্দর বর্ণনা কবি সন্ধ্যাকর নন্দী কৃত "রামপাল-চরিত কাব্যে" লিখিত আছে।*

---

* বাবু প্রভাসচন্দ্র সেন কৃত বগুড়ার ইতিহাস পৃ ৩৪-৩৭।

সুরপাল দেবের পরে রামপাল দেব মগধ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পিতৃ শত্রুগণের হস্ত হইতে সামন্ত চক্রের সাহায্যে বরেন্দ্রী উদ্ধার করেন এবং গঙ্গানন্দ ও করতোয়ার সঙ্গমস্থলে "রামাবতী" নামক নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া তথায় বহুকাল যাবৎ রাজত্ব করেন। এই রামাবতীর ভগ্নাবশেষ, ও তৎসংলগ্ন স্থানগুলিতে প্রাচীন পাল রাজাগণের নামের স্মৃতি "ভীম সাগর," "রুদাইপুর" "ভীমের ডামর," "হরিপুর" আদি নামে রাখিয়া অতীতের বিস্মৃতি গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই সকল জলন্ত ঐতিহাসিক বিবরণ পাঠ করিলে বেশ অবগত হওয়া যায় যে, অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত যজ্ঞকারী বেদজ্ঞ গৌড়ীয়-দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণ পরিচালিত সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য শত্রু-সংহারকারী নানাসাগর মেখলাভরণা বসুন্ধরার চিরকল্যাণকামী প্রবল পরাক্রান্ত পাল নরপালগণের গৌরব মার্ত্তণ্ডের মধ্যাহ্ন-ময়ূখমালার আচট্টল-গান্ধার সহ সমূহ আর্য্যাবর্ত্ত শাসিত হইয়া আলোকিত হইয়াছিল। রামপালচরিত পাঠে আমরা আরও জানিতে পারি যে, রামপাল দেবের রাজধানী রামাবতীর ধ্বংসাবশেষ ছাড়াইয়া উত্তরে বরাবর গাঙ্নইর কূলে ভীমের লীলাও কীর্ত্তি নিকেতনের বিগত স্মৃতিসমূহ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। রামপালের মহাবিহারের ৩ ক্রোশ উত্তরে ভীমের জাঙ্গালের উভয় পার্শ্বে "কীচক" নামক গ্রাম। সম্ভবত এইখানে গঙ্গানদীর তীরে মহাশ্মশানে ভীম ও যুদ্ধে নিহত ভীমের আত্মীয় স্বজনকে দাহ ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। জন প্রবাদ এই মাহিষ্যরাজ ভীমপালকে নির্দ্দেশ না করিয়া মহাভারতীয় মধ্যম পাণ্ডব ভীমের সহিত "কীচক" গ্রামের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়, গঙ্গানদীর অপর পারে হরিপুর ভীম সুহৃদ হরির ক্ষীণ স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া অতীত ইতিহাসের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। "কীচক" গ্রামের ২ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে "রুদাইপুর" গ্রাম ভীম পিতা রুদোকের স্মৃতি মানবের মনে জাগরূক করিয়া দিতেছে।* পথিক বগুড়া, পাবনা ও রাজসাহী জেলার মধ্যে অতীত বৌদ্ধ ভাবাপন্ন মাহিষ্যপাল রাজগণের এই সকল কীর্ত্তি মেখলা পরিদর্শন করিয়া কৃতিকৃতার্থ হইতে পারেন। যেমন ব্যাস বা বাল্মীকির মন দুর্য্যোধন বা রাবণের পক্ষপাতী ছিল না, সেইরূপ সন্ধ্যাকর নন্দীর সহানুভূতি স্বতই ভীমের দিকে তদীয় কাব্যে প্রকটিত হইয়াছে।

আর একটী কথা এইখানে বলা বিশেষ আবশ্যক যে, আজ কাল এই বিংশ শতাব্দীর অসাধারণ ধীশক্তি ও বিজ্ঞানালোচনার দিনে নৌশক্তির সাহচর্য্যে যেমন ইংরাজরাজ সভ্য জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এবং দৃপ্ত রাজন্যবর্গের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন, সেইরূপ সুদূর অতীত বৌদ্ধযুগে পালরাজগণের অক্ষুণ্ণ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ তাঁহাদের অর্ণবযান বলে বলীয়ান, তাহা মহারাজ রঘুর সময় হইতেই বিদিত না হইলেও, কবি কালিদাসের সময় হইতে সুনিশ্চিত বটে ত। তাই বাঙ্গালী মাহিষ্য রাজগণের নৌ-সৈন্যের এত বিক্রম দেখিয়া কবি বলিয়াছেন :—

"বঙ্গানুৎখ্যায় তরসা নেতা নো সাধনোদ্যতান্"। "যুক্তি কল্পতরু" গ্রন্থ হইতে আমরা বিভিন্ন জাতীয় কাষ্ঠ ও নৌকার নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকি। খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্ম্মপাল দেবের তাম্র শাসন এ কথার সার্থকতা ও দৃঢ় প্রমাণ

* ভ্রান্তি বিজয় ২৭৮—২৮৯ পৃ দ্রষ্টব্য।

প্রয়োগ করিতেছে। ক্ষত্রিয় শক্তির সহিত বৈশ্য শক্তি মিলিত হইয়া গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের ন্যায় বঙ্গে এই অতীত বৌদ্ধ যুগে পাল নরপতিগণ পবিত্র ভাব আনিয়াছিলেন বলিয়া মণি কাঞ্চন সংযোগে বঙ্গদেশ সেই সময়ে অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছিল, পিতৃ-শক্তির বলেই এই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু-অদ্বেষী মাহিষ্য পাল রাজগণ স্বাধীনভাবে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে আসমুদ্র-হিমালয় পর্ব্বত পাদচুম্বী বিশাল জনপদ সমূহে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন এবং ইঁহাদেরই অর্ণবপোত "সদর্পে ভ্রমিত ভারত সাগরময়" ॥ ইহা রূপ কথা নয়। ঐতিহাসিক সত্য। মদ্বন্ধু অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় কৃত "Indian Shipping" গ্রন্থ তাহা সভ্য জগৎ সমক্ষে রুদ্ধ প্রকোষ্ঠের দ্বার অর্গল-মুক্ত করিয়াছে !!!

ক্ষত্রিয় শোণিত ধমনীতে প্রবাহিত ছিল বলিয়াই এই দীন হীন বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে নিগৃহীত ও পদদলিত মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় জাতি, সেই অতীত বৌদ্ধ যুগের পাল নরপতিগণের জাতি বীর বাহিনী লইয়া ভারত মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করিয়া যব ও বালী দ্বীপে স্বাধীন মাহিষ্য উপনিবেশ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল; মাতৃশক্তির বলেই তাঁহারা বঙ্গের ভূমি অগণিত কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর কেন, সমগ্র সভ্য জগতের অন্ন সংস্থান করিতেছে; বৈশ্য শক্তির প্রভাবেই এই জাতি বাণিজ্য ব্যপদেশে চীন জাপান রোম মিশর, এমন কি, সুদূর আমেরিকা ও মেক্সিকো প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের মধ্যে ভাব বিনিময়ের একমাত্র কর্ণধার হইয়াছিল, ভারতের অমূল্য পণ্য সম্ভার ঢালিয়া দিয়া স্বদেশ মাতৃকার গৌরব বিকীর্ণ করিয়াছিল, এবং ভারত জননীকে তৎকালিক সভ্য জগতে বরেণ্য করিয়াছিল, সেই পাল রাজগণ লুপ্ত শ্রী, লুপ্তগৌরব, অস্তিত্বহীন এবং তাঁহাদের সেই বিশাল ২৪ লক্ষের মাহিষ্য জাতি কুম্ভকর্ণী নিদ্রায় অভিভূত, সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত, পদদলিত ও নিগৃহীত !!! এই অতীত বৌদ্ধ যুগে ক্ষত্রিয় শক্তি বৈশ্য শক্তির সহিত সংযোজিত হইয়াছিল বলিয়া কি জলযুদ্ধে, কি স্থলযুদ্ধে, কি শৌর্য্যে কি বীর্য্যে, মাহিষ্য-গণ বঙ্গদেশকে অজেয় করিয়া রাখিয়াছিল; স্বীয় গুরু গৌড়ীয়-দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণের প্রদত্ত শিক্ষা ও দীক্ষায় বিশ্ব বিজয়িনী শক্তি লাভ করিয়া সভ্য জগৎকে চমকিত করিয়াছিল। বর্ণাশ্রমের গুরু গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদেই তাঁহারা রাজন্য শক্তি লাভ করিয়া জগতে পূজ্য ও বরেণ্য হইয়াছিলেন, শতমুখে সে শক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিতে কেবল বিপক্ষ কবি সন্ধ্যাকর নন্দী পশ্চাৎ-পদ হন নাই, এমন নহে আজও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বর্ত্তমান কালের বহু বিপশ্চিৎ আচার্য্য বিদ্বজ্জন ও সুধীবৃন্দ বরং অকপটহৃদয়ে সেই কীর্ত্তি গাথা জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিয়া আদর্শ উদারতার পরিচয় দিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন !!!

যে জাতি ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারত সম্রাট দীল্লির সাহান সাহ মোগল বাদশাহ-গণকে এবং বঙ্গের পাঠান শক্তিকে স্বতই উপেক্ষা করিয়া দক্ষিণ বাঙ্গালাকে স্বাধীন রাখিয়া ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, যাঁহাদের সুশাসন-আতপত্র-ছায়ায় বাঙ্গালী-বহু শত বৎসর সুখে নিদ্রা গিয়াছিল, যাঁহাদের শিল্প, কারুকার্য্য, কলাবিদ্যালব্ধ বাণিজ্য সম্ভার চর্ম্মূল্যে ভিনিষ, আদ্রিয়া-

নোপোল ও আরব উপকূলস্থ নগরে এমন কি সুদূর মিশরের হাটে বিকাইত, যে জাতি ঐ ভারতের তামস যুগ মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাব ও সভ্যতা বিনিময়ের একমাত্র কর্ণধার ছিল, তাঁহাদের সন্তান সন্ততির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য বিদ্যাভিমানী বর্ত্তমান যুগের সভ্য বাঙ্গালীর উচ্চ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ তাঁহাদিগকে সামাজিক নির্য্যাতন করিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? বড় সৌভাগ্য বলেই আজ ন্যায়বান ইংরাজ রাজের শান্তিময়ী শাসনাধীনে আমরা বাস করিতেছি যে, এই কৃষক জাতির অদ্যাবধি অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহাদের চীৎকার রাজার কর্ণে পহুঁছিতেছে, তাহাদের চিরপোষিত কৃষির উন্নতির ব্যবস্থার দিকে রাজার দৃষ্টি পড়িতেছে। যে সময়ে বৌদ্ধ ভারতে হিন্দু স্বাধীন রাজন্যবর্গের বিজয় বৈজয়ন্তী সদর্পে জলে স্থলে উড্ডীন হইতেছিল, যে মধ্য যুগে ভারতের গুণ গরিমা, ন্যায় দর্শন, কলা, শিল্প ভাস্কর্য্য, চিত্র বিদ্যাদি শিক্ষা করিবার জন্য দেশ দেশান্তর হইতে ছাত্রগণ তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা, দন্তপীরপুর, নালন্দা, উরুবিল্ল আদি স্থানে সমবেত হইতেন, যে সময়ে বিহার প্রান্তীয় দেশের স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় সমূহে মনুষ্য ও পশুকুলের অস্বস্থ্য, ব্যাধি ও দুঃখ নিবারণের জন্য স্বতই ভিক্ষু ও ক্ষপণকগণ সচেষ্টিত থাকিতেন, যে সময়ে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময়ে ভীম, রুদ্রক ও দিব্বোকের এই মাহিষ্য জাতি যে মেষপালবৎ শান্তভাবে কেবল মাথায় ঘাম পায়ে ফেলিয়া শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রচণ্ড প্রতাপ ও তীক্ষ্ণ আতপ তাপ উপেক্ষা করিয়া, অন্নের জন্য কেবল মাত্র ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদনে রত থাকিত, এমত নহে; ইহাদের প্রাচীন রাজন্যবর্গের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বলদৃপ্ত তাম্রলিপ্ত, সুজামুঠা, ময়না তুরকা, কুতুবপুর, বালিসীতা, প্রভৃতি স্থানে পরিচালিত হইত, তাহা গদাধরের কুলজী ও গোবৰ্দ্ধণের কারিকা আমাদের দৃষ্টি সমক্ষে রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে।

রামপাল দেবের স্বর্গারোহণের পর ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কুমারপাল দেব মগধ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুমার পাল দেবের সিংহাসনাধিরোহণের অত্যল্প কাল পর হইতে বিশাল পাল সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার ফলে এক এক করিয়া সুক্ষ বা আসাম প্রদেশে তিঙ্গ্যদেব, দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গে উৎকল রাজ অনন্ত বর্ম্মার অধিনায়কত্বে স্বাধীনতার বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইতেছিল; কিন্তু রামপাল দেবের প্রধান মন্ত্রী তপনভেজা গৌড়ীয়-দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ বংশসম্ভূত যোগ দেবের পুত্র, বৈদ্য-দেবের সৎপরামর্শের গুণে সম্রাট বঙ্গে প্রাধান্য ও আধিপত্য পুনঃ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৈদ্যদেব সুক্ষ বা কামরূপ প্রদেশে তিঙ্গ্যদেবকে পরাজিত করিয়া পালপ্রাধান্য পুনঃ স্থাপন করিতে পারিয়া-ছিলেন। কুমারপাল দেবের রাজ্যকাল কত দিন স্থায়ী হইয়াছিল এবং তিনি কবে পরলোক গমন করেন, তাহার কোন নিদর্শন অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই; তবে ইহা নিশ্চিত যে, ২।৩ বৎসর কাল মাত্র তাঁহার রাজ্যকাল স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শিশু পুত্র তৃতীয় গোপালদেব মগধ সাম্রাজ্যের কর্ণধাররূপে বরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বল্পকাল পরেই তিনি তাঁহার পিতৃব্য মদনপাল দেবের দ্বারা গুপ্ত ঘাতকের হস্তে জীবন

বিসর্জ্জন দিলে মগধ সিংহাসনে তিনিই এক মাত্র কর্ণধার হইলেন। ইংলণ্ডের পরবর্ত্তী ইতিহাসে বালক রাজা পঞ্চম এডোয়ার্ডকে হত্যা করিয়া তদীয় পিতৃব্য তৃতীয় রিচার্ড যেমন সিংহাসনারোহণের পথ কণ্টক-বিমুক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ, বহু প্রাচীন বৌদ্ধ যুগ ভারতের ইতিহাস এই ঘটনার পূর্ব্বাভিনয় সংঘটিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা পাঠকগণের নিকট অবিদিত নাই !!! কানৌলীর তাম্রানুশাসনে বৈদ্যদেব মদনপাল দেবের নাম আদৌ উল্লেখ করেন নাই। মদনপাল ১১ বৎসর রাজত্ব করেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্য কালের শেষ দিকে গৃহ বিবাদ, আন্তর্গণিক যুদ্ধ বিগ্রহে ও অপর অশান্তি প্রযুক্ত তাঁহাকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। এই সময়ে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে মাত্র তাঁহার আধিপত্য স্থায়ী ছিল। ইহার রাজ্যকালের অষ্টম বৎসরে মানহালি দানফলক উৎকীর্ণ হইয়াছিল।* মদনপাল দেব বঙ্গেশ্বর বিজয়সেনের দ্বারায় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বঙ্গ হইতে বিতাড়িত হন। মদনপাল দেবের রাজত্বকালের ৪টী মাত্র প্রশস্তি অদ্যাবধি আবিকৃত হইয়াছে।

১১৬১ খ্রীষ্টাব্দে আমরা মদনপাল দেবের পরলোকগমনের পর তাঁহার বংশজ গোবিন্দ পাল নামধেয় কোন রাজাকে মগধ সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাই। ইনি পাল বংশের শেষ রাজা। ইহার রাজ্য কালের চতুর্দ্দশ বৎসরে (১১৭৫ খ্রীঃ অঃ) উৎকীর্ণ 'গদাধর" লিপি আমরা গয়ায় দেখিতে পাই। তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। গোবিন্দপাল দেব নালন্দার আসন্ন প্রদেশে তাঁহার রাজ্যকালের শেষ সময়ে রাজত্ব করিতেছিলেন বলিয়া রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় বাবুর প্রমণাদি সমূহ দেখিলে বেশ বোধ হয়।* যাহা হোক, হতশ্রী নষ্টরাজ্য ও হৃতগৌরব হইলেও সমগ্র মগধ রাজ্যের রাজদণ্ড ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরিচালনা করেন, কিন্তু তাহার পর বিহার প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌহান, গহড়ওয়াল, পাল এবং সেন রাজাগুলি বক্তিয়ার খিলিজীর দ্বারা অধিকৃত এবং ধ্বংশীভূত হয়। বিহার প্রদেশের অন্তর্গত মনের, বিষ্ণুপুর টাড়োয়া, উদ্দণ্ডপুর, দন্তশীরপুর, গুণমতী, গুণেরী, উরুবিল্ল, মন্দারগিরি, প্রবরগিরি প্রভৃতি স্থানের মঠ পুস্তকাগার ও পশু হাঁসপাতালগুলি তিনি অর্থলোভে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশ এবং বহুমূল্য পুস্তক, পুথী ও বাসস্থান গুলিকে নষ্ট করেন। ইহা জাতির বা দেশগত হানি নহে ; ইহা মানব জাতীর পক্ষে মহা অস্থ্যাপাত বলিতে হইবে। উদীয়মান শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহু অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল বটে, শশাঙ্কদেব অশিতি সহস্র বৌদ্ধ শ্রমণগণকে হত্যা করিয়া হস্ত কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছিলেন বটে, বহু পলায়িত শ্রমণ বর্ত্তমান ভুমিহার ব্রাহ্মণ (বাঁভন) জাতিতে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ লাভ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে পরিপাক পাইয়াছে বটে এবং যদিও বহু বৌদ্ধ-ভিক্ষু শ্রমণ প্রাণভয়ে পালাইয়া হুণ, খশ, গথ্ আদি জাতিতে মিশিয়া বর্ত্তমান জার্ম্মানি

* J. A. S. B. 1900 Pt. 1 p 93.
Epi. Ind vol. I p 306-30)
Ind. Ant. Vol. XIV p 103

* I A S. R. Vol iii p 121 No 7.
Catalogue of Buddhist Sans-Mss. in the Cambrige University Library Intro. p. iii, p 190, 188.
J A. S. B. (No.) Vol Viii (1876) p 3 , Ibid Vol Vii p 757.

দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া জর্ম্মাণ অভিধায় পরিচিত হইতেছে বটে, কিন্তু এই মুসলমান-বিজেতা বক্তিয়ার খিলজীকৃত অনিষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা বড়, গুরুতর এবং মনুষ্য জাতির উন্নতি-রোধক ও সভ্যতা-বিনষ্টক বলিয়া সদাই কথিত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ তাঁহার প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এবং মিঃ রেভার্টিকৃত তাবাকৎই নাসিরী পুস্তকের অনুবাদে আমরা দেখিতে পাই যে, মুসলমান যোদ্ধা বক্তীয়ার খিলিজী উত্তর ভারত জয় করিয়া কানৌজ কালিঞ্জর মথুরা লুণ্ঠন করিয়া বিহার প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন এবং ধন লাভের আশায় বিহার প্রদেশের যাবতীয় বৌদ্ধ কীর্ত্তি সকল নষ্ট ও ধ্বংশ করেন। ধন প্রাপ্তি আশা ব্যর্থ হইলে তিনিও তাঁহার উদ্ধত সৈন্যমণ্ডলী যাবতীয় মঠগুলি ধুলিসাৎ করে,পুস্তকাদি পোড়াইয়া নষ্ট করে এবং বহু ভিক্ষু ক্ষপণক, শ্রমণ ও ছাত্রগণকে নষ্ট ও হত্যা করে; কেহ কেহ ভয়ে ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে, কেহ বা প্রাণ লইয়া নেপালাদি নিরাপদ দেশে পলায়ন করে এবং যাহারা তাহা পরিল না, ভুমিহার হইয়া হিন্দুসমাজে পরিপাক পাইল বলিয়া আমার মনে হয়। পালরাজগণের ইতিহাস শেষ করিয়া একটী প্রশ্ন স্বতই হিন্দু মাত্রের হৃদয়ে উদয় হয় যে, এই গয়ায় বিষ্ণুপদ তীর্থ, শ্রাদ্ধ ক্রিয়া, বিধি খাঁটি হিন্দু যুগের জিনিষ, না বৌদ্ধ যুগের পরগাছা পরবর্ত্তী কালের, "পর গাছা" যেমন ডাঃ ক্যানিংহাম, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মানষীগণ বলিয়াছেন?

এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে আমাদের প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থ রামায়ণ,মহাভারত, বায়ু পুরাণাদির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। ইতপূর্ব্বে আমি "গয়ার প্রাচীনত্ব" অধ্যায়ে কতক আলোচনা করিয়াছি এবং ইহা হিন্দুর শাস্ত্রের মতে ঠিক যে, "গয়াতীর্থ" বৌদ্ধ যুগের শত সহস্র সহস্র বৎসরের প্রাচীনতম হিন্দু তীর্থ। ভগবান রামচন্দ্র, যুধিষ্টির, অম্বরীষ, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান প্রভৃতি যখন গয়ায় আসিয়া পিণ্ড দান ক্রিয়া সমাধা করিয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্রে নিদর্শন পাওয়া যায়, তখন কিরূপে বলিব, ইহা বৌদ্ধ যুগের সৃষ্টি? আমার বিশ্বাস যে, ইহা হিন্দুর স্বতন্ত্র জিনিস। হিন্দু ধর্ম্মের বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর প্রাধান্যের কালে এই অলীক গল্পটির সৃষ্টি বলিয়া আমার মনে হয়। পাদ পূজার নিদর্শন হিন্দু শাস্ত্রের বহু স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৺রাজেন্দ্রলালের মত এ সম্বন্ধে আমার ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

প্রণতি।

১

বরণীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বরদাতা বিভু।
সর্ব্বভূত সৃষ্টিকর্ত্তা তেজোময় প্রভু॥
তুমিই মঙ্গলদাতা মঙ্গল-আঁধার।
তোমার উদ্দেশে দেব কোটী নমস্কার॥

২

সর্ব্বত্র বিরাজমান লিপ্ত কিন্তু নও।
মঙ্গলাহ। তর্কের অতীত তুমি হও॥
আত্মারূপে পরাৎপর সর্ব্বভূতে স্থিতি।
তেজোময় বিশ্বরূপে তোমাকে প্রণতি॥

৩

বাঙ্‌ মনের অগোচর তুমি হে অব্যক্ত।
স্ব ইচ্ছায় স্বেচ্ছাময় কভু হও ব্যক্ত॥
অদ্বিতীয় সারাৎসার ভব-কর্ণধার।
তেজোময় ব্রহ্ম! মম কোটী নমস্কার॥

৪

রজঃ সত্ত্ব তমোভেদে সৃষ্টি স্থিতি লয়।
সকলি ঘটিছে দেব তোমার ইচ্ছায়॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে তিনগুণ দৃষ্ট।
অন্য অন্য দেবগণ তব অংশে সৃষ্ট॥
সকলের আদি বীজ পুরুষ রতন।
নমো তেজোময় দেব পরমাত্মা ধন॥

৫

ইচ্ছায় প্রকাশমান কভু থাক গুপ্ত।
ভাগ্যবানে দেখে রূপ অন্যে থাকে সুপ্ত॥
বেদের অতীত তুমি তেজের আধার
তোমার উদ্দেশে মম কোটী নমস্কার॥

৬

সর্ব্বজীবে আত্মারূপী তুমি ভগবান।
পদ্ম পাত্রে বারি সম কর অবস্থান॥
বিচক্ষণ মহাত্মারা তবরূপ জানে।
প্রণতি হে তেজোময়! করে অকিঞ্চনে॥

৭

ইন্দ্রিয় অতীত পুনঃ গোচরবৎ ভাস।
অসাক্ষী হয়েও সাক্ষীরূপেতে প্রকাশ॥
সাকারের মত হও হয়ে নিরাকার।
তেজ-রূপ জগৎপতে! কোটী নমস্কার॥

৮

চরণবিহীন তবু তুমি সর্ব্বগামী।
হস্ত্যাস্ত-বিহীন ভুঞ্জ সর্ব্ব বস্তু তুমি॥
কর্ম্মাতীত নও কিন্তু কর্ম্মের আধার।
তেজোময়! তবোদ্দেশে কোটী নমস্কার॥

৯

বেদে নিরুপিত রূপ ভজে সাধুজনে।
বেদাতীত রূপ তব অশক্ত বর্ণনে॥
বেদাতীত তেজরূপ বিশ্বের আধার।
তোমার উদ্দেশে দেব কোটী নমস্কার॥

১০

জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মা বেদের জনক।
বিষ্ণু যে পালনকর্ত্তা রুদ্র সে নাশক॥
তাঁরাও অক্ষম তব রূপ বর্ণিবারে।
তোমার অব্যক্ত রূপ কে বর্ণিতে পারে?
তেজোময় জগৎপতে অগতির গতি।
তোমার উদ্দেশে দেব! অসংখ্য প্রণতি॥

১১

রক্ষণীয় জীবে ধর্ম্ম করেন রক্ষণ।
বিনাশ্যে নাশেন শিব করেন ক্ষপণ॥
অবশ্য-সম্ভাবী শুভাশুভ ফলদাতা।
তোমারই আজ্ঞায় হন ব্রহ্মা সে বিধাতা॥
তুমিই হে আদি পিতা বিশ্বের আধার।
তেজোময়! তবোদ্দেশে প্রণতি আমার॥

১২

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তব সেবা করি।
আধিপত্য লভেছেন সবার উপরি॥
তব ভক্তোপরি কিন্তু নাহি অধিকার।
তেজোময় বিভু লহ মম নমস্কার॥

১৩

বিশ্বের স্বরূপ এই পৃথিবী মাঝারে।
তোমার আজ্ঞায় রত বিষয় ব্যাপারে॥
কত কত ক্ষুদ্র জীব সেবক তোমার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কেবা সংখ্যা করে তার?
প্রযোজক সকলের তুমি বিশ্বপতি।
জ্যোতির্ম্ময় তবোদ্দেশে অসংখ্য প্রণতি॥

১৪

পরমাণু সমষ্টি এ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড।
তোমার ইচ্ছায় ঘটে এ সকল কাণ্ড॥
তুমিই সে পরমাণু সৃষ্টির কারণ।
বর্ণিতে তোমার রূপ শক্ত কোন্ জন?
তেজ-পুঞ্জময় বিভু সর্ব্ব সারাৎসার।
তোমার উদ্দেশে কোটী প্রণাম আমার॥

১৫

কলামাত্র হন তব বিষ্ণু অবতার।
শুনি এক লোম কূপে ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ॥
অতএব তব রূপ কে বর্ণিতে পারে ?
ভাগ্যবান পারে তুমি দয়া কর যারে ॥
সৎ-চিৎ-আনন্দ তুমি অখিলের সার।
তেজোময় জগৎপতে ! করি নমস্কার ॥

১৬

জ্ঞানবান সাধু যাঁরা জ্যোতি করি ধ্যান।
বিমল আনন্দ তাঁরা অচিরেই পান ॥
দাস্য ধর্ম্মে রত ভক্ত যাচে অন্য ধন।
তেজ চিন্তা ত্যজি চাহে পূজিতে চরণ ॥
কমনীয় রূপ, করে দেখিতে বাসনা।
পূজিবারে দাও পদ পূরাও কামনা ॥

১৭

জ্ঞানী চাহে জানিবারে তোমার স্বরূপ।
সেহেতু ভজনা করে জ্যোতির্ম্ময় রূপ ॥
শ্রীপদ পূজিতে ভক্ত চাহে অনুক্ষণ।
অপরূপ মূর্ত্তি তব করিতে দর্শন ॥

১৮

তব কাছে যেতে দুটী পথ ভক্তি-জ্ঞান।
কোনটীই চিনি না যে, অভক্ত অজ্ঞান ॥
যেই ভাবে দেখা দেবে দেখিব তেমতি।
তোমার উদ্দেশে দেব ! অসংখ্য প্রণতি ॥

১৯

গিরিজার প্রাণধন ! অগতির গতি।
মুছাও চক্ষের ধাঁধাঁ ঘুচাও দুর্গতি ॥
অকিঞ্চন অভাজন আমি হীনমতি।
তব কৃপা বিনা নাথ নাহি অন্য গতি ॥
দয়া করে দয়াময় দাও হে সুমতি।
তোমার উদ্দেশে দেব অসংখ্য প্রণতি ॥

শ্রীগিরিজাভূষণ রায় (কবিরাজ)।

ভগবদ্গীতা।

[গ] ভক্তি-যোগ*।

[১] **ভক্তি কি ?** ঈশ্বরে একান্ত আনুরক্তির নাম ভক্তি। জ্ঞান ব্যতীত ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিবার উপায় নাই। তবেই ভক্তি জ্ঞান-সাপেক্ষ। জ্ঞান আবার কর্ম্মসাপেক্ষ। তবেই ভক্তি—জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই সাহায্য-সাপেক্ষ। জ্ঞানের পরে যে ভক্তি হয়, তাহাই প্রকৃত ভক্তি, পরাভক্তি।

[২] **ঈশ্বর** এই বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা ও বিলয়কর্ত্তা (৯—১৮॥ ১৩—১৬)। একই ঈশ্বরকে জ্ঞানীরা ব্রহ্ম, যোগীরা পরমাত্মা ও ভক্তেরা ভগবান বলেন। তাঁহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাতেই অবস্থিতি করিয়াছে, তাঁহাতেই আবার বিলীন হইবে। ঈশ্বর জন্মবিহীন ও অবিনশ্বর (৭—২৫)।

---

* মহর্ষি গোতম-প্রণীত ন্যায়দর্শন এবং মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শনের মতে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু এবং আকাশ, কাল, দিক, মন, ঈশ্বর ও অসংখ্য জীবাত্মা—এই কয়প্রকারের নিত্য বস্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমানছিল। পরে পার্থিব পরমাণুগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া এই বিশালবিশ্ব উৎপন্ন করিয়াছে। মহর্ষি কপিলপ্রণীত সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণান্বিত। এই তিনটী গুণের সাম্য অবস্থায় প্রলয়, আর অসমান অবস্থায় সৃষ্টির আরম্ভ। যেমন দুগ্ধ হইতে দধি হয়, তেমনি এই ত্রিগুণের বিকার দ্বারা এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। সাংখ্য, পূর্ব্ব মীমাংসা, চার্ব্বাক দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন ঈশ্বর মানেন না। বেদান্ত দর্শনের মতে নির্গুণ পরব্রহ্মই এই বিশ্বের মূল কারণ। এখানে আপত্তি এই যে, যাহা নাই, তাহা হইতে কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না, নির্গুণ হইতে গুণ উৎপন্ন হইতে পারে না। বেদান্তের উত্তর এই, এই বিশ্ব অসত্য, মায়ামাত্র। যেমন শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়, রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, সেইরূপ, এই বিশ্বের ভ্রমও উৎপন্ন হইতেছে। একমাত্র পরব্রহ্মই মূল ও সত্য। তাঁহাতে সতত পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যের আরোপ হইতেছে মাত্র। প্রমথনাথ তর্কভূষণপ্রণীত মায়াবাদ পৃঃ ৯-১১। চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের হিন্দুদর্শন প্রথমবর্ষ পৃঃ ৭৪।১১৪ এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল, প্রণীত গীতায় ঈশ্বরবাদ দ্রষ্টব্য। এখন গীতার মত দেখা যাক।

তিনি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান (৮—২২)। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, পুরাণ, নিয়ন্তা, বিধাতা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অচিন্ত্য (৮—৯)। তিনি চরাচর বিশ্ব সংসারের ও সকল জীবের অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছেন। তিনি দূরেও আছেন, নিকটেও আছেন। কিন্তু তিনি সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বলিয়া সকলে তাঁহাকে জানিতে পারে না (১৩—১৫)। সমস্ত জীবই তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে এবং তিনিও সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন (৮—২২)। কিন্তু সর্ব্বভূত বিনষ্ট হইলেও তিনি বিনষ্ট হন না (৮—২০)। সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আকাশ যেমন সকল পদার্থে বিদ্যমান থাকিলেও কিছুতেই লিপ্ত হয় না, ঈশ্বরও তেমনি দেহে থাকিয়াও দেহের সহিত লিপ্ত হন না (১৩—৩২)। ঈশ্বর কাহারও কর্ম্ম, কর্ত্তৃত্ব ও সুখ দুঃখরূপ কর্ম্মফল প্রদান করেন না। লোকের নিজ নিজ স্বভাবই সে সমুদয়ের প্রবর্ত্তক (৫—১৪)। ঈশ্বর কাহারও পাপ পুণ্য গ্রহণ করেন না, কাহারও পাপ পুণ্যের ভাগী হন না (৫—১৫)। কিন্তু সূত্র যেমন ফুলের মধ্যে অদৃশ্য থাকিয়া ফুলের মালার শৃঙ্খলা রক্ষা করে, ঈশ্বরও তেমনি এই বিশাল বিশ্বের মধ্যে অদৃশ্য থাকিয়া তাহার শৃঙ্খলা সম্পাদন করিয়াছেন (৭—৭)।

[৩] **অজ্ঞান অন্ধ জড় প্রকৃতি বা পরমাণু এই বিশ্বের স্রষ্টা হইতে পারে না।** কারণ এই বিশ্বের সর্ব্বত্রই স্রষ্টার অপরিসীম জ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে। একই কোন মহাজ্ঞানবান, সর্ব্বশক্তিমান ইহার স্রষ্টা। ঈশ্বরই সকলের আদি কারণ। ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তুই উৎপন্ন হইতে পারে না (১০—৩৯)। প্রকৃতিকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্যও যে অন্য শক্তির প্রয়োজন। ঈশ্বরই প্রকৃতিকে কার্য্যে নিযুক্ত করেন, ঈশ্বরই প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্টি করেন। (৯—১০॥ ১৪—৩)। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি (১৩—১৯)। ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যাদি ও সুখ দুঃখ মোহাদি প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় (১৩—১৯)। প্রকৃতি কার্য্যের কারণ এবং পুরুষ সুখ দুঃখ ভোগের কারণ (১৩—২০)।

[৪] **ঈশ্বর আরাধনার** কোন বিশেষ বিধি নাই। যে যে ভাবে তাঁহার অর্চ্চনা করুক না কেন, সে তাহাতেই ফল পাইবে,—যদি কায়মনোবাক্যে ভক্তি সহকারে তাহার আরাধনা করিতে পারে (৯—২৯)। মোহান্ধ মানব ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করে (১৬-১০) তাহা উচিত নহে। কারণ যাহারা দেবতার উপাসনা করে, তাহারা দেবতাকে পায়, কিন্তু যাহারা ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাহারা তাঁহাকেই পায় (৯—২৫)। ঈশ্বরই সকলের লক্ষ্য। তিনি নিত্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অব্যক্ত। ইহা মূর্খলোকে না বুঝিয়া তাঁহাকে শরীরধারী মনুষ্য বলিয়া মনে করে (৭—২৪)। তিনি যে জন্মবিহীন ও অবিনশ্বর, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না (৭—২৫)। সকলেই ঈশ্বরে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া, জ্ঞানের দ্বারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া, মুক্তিলাভ করিতে পারে। অত্যন্ত দুরাচারীও যদি অনন্যমনে ঈশ্বরের আরাধনা করে, তাহা হইলে সেও সাধু হইতে পারে (৯—৩০)। কারণ মুক্তি বা আত্মোন্নতি সাধনা-সাপেক্ষ। যে ব্যক্তি সত্যই আত্মোন্নতি করিতে ব্যাকুল হইয়াছে, সকল শক্তি, সকল সাধনা সেইজন্য নিযুক্ত করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে। ধর্ম্মের বহু দ্বার, ধর্ম্মজীবন লাভের বহু উপায়। যে কোন প্রকারে হউক, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান

করিলে, ধর্ম্ম জীবন লাভের জন্য সাধনা করিলে, তাহা কদাচ নিষ্ফল হয় না*। সকলে সকল ধর্ম্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরের শরণাগত হইলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে (১৮—৬৬)। যে সত্যই তাহার শরণাগত হইয়াছে, তাহার রিপুগণ পরাজিত হইয়াছে, কায়মনোবাক্যে তাহারই প্রিয়কার্য্য সাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। সে দেশ-হিতে নিযুক্ত হইয়াছে। সকল ধর্ম্মের সকল সাধনই এই মহোচ্চ আদর্শে উপনীত হইবার উপায় মাত্র। যে গন্তব্য স্থলে পঁহুছিয়াছে, তাহার আর বাহনের প্রয়োজন কি? যে মলয়ানিল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার আর তালবৃন্তের আবশ্যক কি?

[৫] **ঈশ্বরের বিশ্বরূপ দর্শন কর।** এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার রূপ, সকল নর-নারীই তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার প্রকাশ। ইহা হৃদয়ে উপলব্ধি কর। ঈশ্বর এই বিশ্বের সর্ব্বত্র, সকল বস্তুতে, সকল নর-নারীতে সমভাবে বিরাজ করিয়াছেন, ইহা দিব্য চক্ষুতে দেখ। ইহা দেখিয়া, ইহা বুঝিয়া ভক্তিরসে বিহ্বল হও। যিনি ঈশ্বরকে সকল পদার্থে দর্শন করেন এবং সকল পদার্থ ঈশ্বরে দর্শন করেন, ঈশ্বর কখনও তাঁহার অদৃশ্য হন না এবং তিনিও ঈশ্বরের অদৃশ্য হন না (৬—৩০)।

[৬] **বিশ্বসেবা কর**; সকলের হিত সাধন কর। যিনি ঈশ্বরের এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আর আপন পর নাই, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল জ্ঞান নাই। সকলেই তাঁহার আপন ও আত্মীয়। কারণ তিনি সকলই ঈশ্বরময় দেখেন। ঈশ্বরে ভক্তি হইলেই সাম্প্রদায়িকতা নষ্ট হয় (১৮—৫৪) প্রাণ উদার ও উচ্চ হয়। তিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া সকলের হিতসাধন করেন এবং তদ্দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করেন (১২—৪)। তুমিও দেশহিতকর কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিবে (১৮—৪৬)। লোকসেবাই ঈশ্বর-সেবার উপায়*। যিনি সকলের হিত সাধন করেন, তিনি ঈশ্বরের কর্ম্ম করেন (১১—৫৫ ॥ ১২—৩৪)। যাহারা লোকহিত সাধন-তৎপর, তাহাদের কখনও দুর্গতি হয় না (৬—৪০)। সকলের হিত সাধনে রত মহাত্মারা ঈশ্বরকেই প্রাপ্ত হন (৫—২৫)। মনুষ্যই ঈশ্বর-পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিমা। তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিক, যিনি সত্য সত্যই সর্ব্বসাধারণের প্রেমিক। ঈশ্বর চিন্তার জন্য বনে গমন করিতে হইবে না। তাহা হইলে মনুষ্য সকলের হিত সাধন করিতে পারিবে না। তাহাই প্রধান কথা। তোমার মনকে সতত সকল অবস্থায় ঈশ্বরেরদিকে রাখিয়া দেশোপকার সাধন করিবে। এক হাতে ঈশ্বরকে ধরিয়া থাকিবে, অন্য হাতে দেশোন্নতির জন্য রাত্রিদিন পরিশ্রম করিবে। তাহা হইলেই দুর্লভ মানব-জীবন সার্থক হইবে।

[৭] **ঈশ্বর করুণাময়, মঙ্গলময়।** তিনিই সকলকে পালন করিতেছেন। যাহার হৃদয়ে ভক্তি আছে, সে বিশ্বাস করে, শোক দুঃখ যাহা কিছু আসিতেছে, সকলই করুণাময় ঈশ্বর মঙ্গল সাধনের জন্যই প্রেরণ করিতেছেন, মনুষ্যকে পোড়াইয়া স্বর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধ করিতেছেন। তবে তুমি কেন আত্মীয় নাশ-জনিত শোক-ভয়ে ভীত হইতেছ?

---

* শান্তিপর্ব্ব ১৭৯—২।

* গীতা ৬—৩১ ॥ ১২—৪ ॥ ১৮—৪৬। শান্তি পর্ব্ব ২৬২—২৫।

[৮] যোগ অভ্যাস করিবে। তাহাতে শরীর বলশালী ও নিরোগী হইবে। রিপুগণ বিজীত হইবে, মনের স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য সাধিত হইবে।

[৯] সন্ন্যাসী ও ত্যাগী কে? জটাধারণ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না, কর্ম্ম-ত্যাগ করিলেই ত্যাগী হয় না, যিনি কার্য্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু লোক হিতার্থে, দেশহিতার্থে সতত কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী। আর যিনি সতত কর্ম্ম করেন, কিন্তু স্বীয় কর্ম্মফল ভোগে বাসনা করেন না, তিনিই ত্যাগী (১৮—২)। এই রূপ ত্যাগী সন্ন্যাসীই সকলের আদর্শ।

[১০] জ্ঞানহীন কর্ম্ম কুকর্ম্মে পরিণত হয়। ভক্তিহীন কর্ম্ম দেশে স্বেচ্ছা-চারিতা বিস্তার করে। কর্ম্মহীন জ্ঞান দুঃখপ্রদ (৫—৬)। তাহা কোন কর্ম্মেই আসে না। অর্থ অশেষ মঙ্গলের নিদান হইলেও, মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিলে যেমন কোন উপকারে আসে না, জ্ঞানও তেমনি, অশেষ কল্যাণের আকর হইলেও, উদরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে কোন ফল হয় না। ভক্তিহীন জ্ঞান নাস্তিকতা আনয়ন করে। জ্ঞানহীন ভক্তি কুধর্ম্মের মূল, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের জননী। জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ [৭—১৭]। কর্ম্মহীন ভক্তি কোন কার্য্যেই আসে না। উর্দ্ধবাহু, উলঙ্গ, উদা-সীন দ্বারা কোন মঙ্গলই সাধিত হয় না।

ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের ন্যায়; প্রম, লৌহ ও স্বর্ণের ন্যায়; কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি দেশের অশেষ মঙ্গলের নিদান। এজন্য এই তিনের সমকালে, সমভাবে অনুশীলন করিবে (৩—৪॥২—৫১॥১৮—৫৬)। কারণ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই ধর্ম্ম, না করাই অধর্ম্ম। সে কর্ত্তব্য সুচারুরূপে করিতে হইলে নিষ্কাম হওয়া চাহি। নিষ্কাম হইতে চাহিলে জিতেন্দ্রিয় হওয়া চাহি, জিতেন্দ্রিয় হইতে চাহিলে জ্ঞান চাহি, ভক্তি চাহি। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, ইহাদের একটীর অতিবৃদ্ধিতে অন্যটী যেন নষ্ট না হয়। এই তিনের দ্বারাই আত্মোন্নতি করিতে হইবে, এই তিনের সাহায্যেই দেশোন্নতি সাধন করিতে হইবে। এই তিনের তুল্য অনুশীলনেই মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ও মুক্তি হইবে, সকল কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

[১১] প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, উভয় ধর্ম্মই চাহি, একই জীবনে, একই সময়ে চাহি। আত্মোন্নতি ও দেশোন্নতির জন্য উভয়েরই একান্তপ্রয়োজন। মনোরথে দুইটী অশ্বসংযোজিত করিয়া সংসারের পথে ধাবিত হইবে। প্রবৃত্তি যখন তোমার নিজের সুখের পথে,স্বার্থসাধনের পথে লইতে চাহিবে,তখন নিবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া প্রবৃত্তিকে সংযত করিবে। আবার নিবৃত্তি যখন সকলের হিত-সাধনের পথে, দেশোপকারের পথে লইতে বৈরাগ্য প্রদর্শন করিবে, তখন প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া, নিবৃত্তিকে সংযত করিয়া, দেশোপকারের পথে ধাবিত হইবে। এইরূপে দুইটী অশ্বের রথে আরোহণ করিয়া আত্মো-ন্নতি ও দেশোন্নতি করিতে করিতে মহা সুখে জীবন পথে অগ্রসর হইবে। *

[১২] কেন এত শোক তাপ, বিবাদ বিসম্বাদ? রিপুগণের পরাধীন-তাই তাহার কারণ, প্রথমে মোহ তোমাকে

* বুদ্ধদেব জ্ঞান, কর্ম্ম ও নীতির উৎকৃষ্ট আদর্শ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন, কোন প্রকার পাপকর্ম্ম না করা, কুশল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা। এবং আপন চিত্তকে নির্ম্মাণ করা—ইহাই বুদ্ধদেবের অনুশাসন। চারুচন্দ্র বসুর অনুবাদিত ধর্ম্মপদ পৃঃ ৯১/০। ১৮৩।

অজ্ঞানান্ধ করিয়াছে, তৎপরে তাহার অনুচরগণ, প্রবল রিপুগণ, ছলে বলে কৌশলে তোমাকে পরাজিত করিয়া অধঃপাতিত করিয়াছে। এখন তোমার সেই নষ্ট রাজ্য স্বরাজ্য বা শ্রেষ্ঠত্ব পুনরায় অধিকার করিতে হইবে। প্রথমে মোহ নাশ কর। তাহা হইলে জানিতে পারিবে, তুমি কে? তোমার ক্ষমতা কি? তোমার কর্ত্তব্য কি? তখন আর বৃথা বিলাপে বা সুখবিলাসে মন যাইবে না। রিপুগণকে পরাজিত করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিয়া, আত্মোন্নতি ও দশোন্নতি করিতে ব্যাকুল হইবে। বুঝিতে-পারিবে সর্ব্বং পরবশং দুঃখং, সর্ব্বং আত্মবশং সুখং, সর্ব্ব প্রকার পরাধীনতাই দুঃখ এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতাই সুখ। জানিতে পারিবে, যিনি রিপুগণকে জয় করিয়াছেন, তিনি পৃথিবী জয় করিয়াছেন। রিপুজয়ই মুক্তির মূল। তখন রিপুগণের হস্ত হইতে স্বাধীন হইয়া, শোক তাপ, বিবাদ বিসম্বাদ হইতে মুক্ত হইবে। তখন সর্ব্বত্র সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। পৃথিবী সুখের নিকেতন হইবে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে এই অভীষ্ট লাভের জন্য রিপুগণের সহিত যে সংগ্রাম, তাহাই পবিত্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। আর এই বিষম সংগ্রামে যিনি স্বীয় মনোরথে ঈশ্বরকে, সাধারণের মঙ্গলকে সারথি করিয়াছেন, একমাত্র তদ্দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন, তিনিই জগৎ-জয়ী হইবেন, কৃতকার্য্য হইবেন, মুক্তি লাভ করিবেন। অতএব তোমার নিজের সুখ দুঃখ দ্বারা তোমার কর্ত্তব্য স্থির করিও না; লোকহিত দ্বারা, দেশোপকারদ্বারা তোমার কর্ত্তব্য স্থির কর। তাহা হইলেই মোহ-মুক্ত হইতে পারিবে।

তখন অর্জ্জুন বলিলেন, "কৃষ্ণ, তোমার কৃপায় আমার মোহ দূর হইয়াছে।" এই বলিয়া কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া পুনরায় ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিলেন। ভীষণ, লোমহর্ষণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণব।

কতিপয় ব্রাহ্মণ-জমিদার-নেতা যাহাই বলুন না কেন, উত্তর বঙ্গের ভবিষ্যৎ ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণব। যাঁহারা চক্ষু থাকিতে অন্ধ নহেন, তাঁহারা জানেন, যে উত্তর বঙ্গে বৈষ্ণবসংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। হিন্দুসংখ্যা কমিতেছে, বৈষ্ণবসংখ্যা বাড়িতেছে, হিন্দুর বিপদই বৈষ্ণবের সম্পদ।

১। যেখানে এক পরিবারে অনেক সংখ্যক বিধবা থাকে, এবং প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া বিপন্ন হয়, যে হিন্দু তাহার বিপদের কারণ, সেও তাহাকে উৎপীড়ন করে, তখন তাহার উপায় হয় মুসলমান, না হয় বৈষ্ণব হওয়া, হিন্দু ধর্ম্মে নিষ্ঠা থাকিলে বৈষ্ণব হইতেই ইচ্ছা করে।

২। যেখানে পুরুষের বিবাহ জুটে না, অন্য জাতীয় পাত্রীতে আসক্ত, অর্থাৎ ঠিক পেটেল মহোদয়ের বিলের যোগ্য যাহারা, সেখানে তাহারা বৈষ্ণব।

৩। একজন সম্ভ্রান্ত পুরুষের এক নীচ জাতীয়া উপপত্নী গর্ভে যদি সন্তান হয়, আর সন্তান নষ্ট করিতে কোন বাধা থাকে, তবে তাহারা হয়, মুসলমান না হয় বৈষ্ণব হইবে। বগুড়ায় এরূপ মুসলমান ও বৈষ্ণব অনেক আছে।

৪। ঘোষবংশীয় একজন জমিদারের কর্ম্মচারীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছিল, সেখানে কায়স্থ নাই, মুসলমান ও বৈষ্ণব, তিনি অন্ত্যেষ্টির সুবিচারজন্য ভেক লইলেন, শেষে বাঁচিয়া উঠিয়া বৈষ্ণব রহিয়া গেলেন।

৫। এক গ্রামে একঘর সম্ভ্রান্ত হিন্দু

আছেন, আর কোন জাতি নাই, বৈষ্ণব আছে, তাহার উঠা বসা সমাজ প্রাপ্তির জন্য তিনি বৈষ্ণব হয়েন।

এইরূপ আদম সুমারী দেখিলে বুঝা যাইবে, যে বৈষ্ণব ও মুসলমান হিন্দু সমাজের বিপদে উপায়, safety valve, এজন্য দুই সম্প্রদায়ই বাড়িতেছে। যে মুসলমান হয়, সে সমাজ মধ্যে অচিরে মিশিয়া যায় ও বুদবুদের ন্যায় সমুদ্র মধ্যে মিশিয়া যায়, আর হিন্দুর সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না। বৈষ্ণব হইলে তেমন সমান পায় না। হিন্দুরাও তাহাকে ত্যাগ করেন, সুতরাং সেই পতিত হিন্দু বৈষ্ণব হইয়া গেল। হিন্দুর চাকর হিন্দুর গায়ক, হিন্দুর জলচল ভৃত্য হইয়া দাড়ায়।

আগে বৈষ্ণবেরা ভিক্ষা বৃত্তি করিত, কিন্তু এক্ষণ মেঠাইওয়ালা, দোকানদার, কামার, কুমার অনেকে ব্যবসা পূর্ব্ববৎ চালাইতেছে, কেবল নামে বৈষ্ণব হইয়াছে। যাহাদের জল-চল ছিল, না তাহাদের জল চল হইতেছে, সুতরাং নীচজন বৈষ্ণবরূপে উন্নীত হইতেছে। শ্রীচৈতন্য দেব মনেও করিতে পারেন নাই যে, নিম্ন হিন্দু সমাজ, যাহাদের জন্য তাঁহার প্রাণ কান্দিত, তাহারা তাহার সম্প্রদায় পুষ্ট করিবে, কিন্তু এক্ষণে তাহা হইয়াছে।

কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ কেহই মনে করিতে পারেন নাই যে, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুব্রাহ্ম হইবে, কিন্তু শতাব্দীর পরে, শতাব্দীর অন্তে দেখা যাইবে," যে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থেরা ব্রাহ্ম হইবে। শূদ্র ও ব্যবসায়ীর দল বৈষ্ণব হইল, সুতরাং ব্রাহ্মণাদি বর্ণের আর প্রভুত্ব করিবারস্থান রহিল না, ক্রমে বিবাহাদি অসুবিধা হইল। সুতরাং জাতিভেদের বন্ধন আর রাখা যায় না, আর বর্ণাশ্রম চলে না, তখন হয় মুসলমান, না হয় বৈষ্ণব, না হয় ব্রাহ্ম, এই তিনের এক হইবেন।

আমার বিশ্বাস, ভিখারী, নীতিহীন সমাজ-হীন দরিদ্র বৈষ্ণব তাহাদের লক্ষ্য হইবে না, মুসলমান হইতেও তাহারা রাজি হইবেন না, কারণ ইহাদের বিবাহ প্রণালীর হীনভাব, সুতরাং জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, শ্বেতকেতু দত্তাত্রেয় শিব গুরু নারদের যে উপাস্য ব্রহ্ম, এবং তাহাদের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত ও উন্নত, অথচ জাতিভেদ-বিহীন এই ব্রাহ্মসমাজই তাহাদের লক্ষ্য হইবে। যেমন বিলাত-ফেরত ব্রাহ্ম, যেমন বিদেশগামী সমাজ-হীন ব্রাহ্ম যেমন ব্রাহ্মসমাজে বিশ্বাসী ব্রাহ্ম, তেমনি, এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্রাহ্ম না হইয়া আর উপায় নাই। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের দল সন্ন্যাস অবলম্বী, তাহাদের প্রতি ভক্তি থাকিলেও সমস্ত জাতি সন্ন্যাসী হইবে না। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন অবশ্যম্ভাবী।

আমি দুই দিনের কি দুই বৎসরের কথা বলিতেছি না, আমি দেখিতেছি ১০০ কি দুই শত বৎসর পরে বঙ্গদেশে দুই জাতি থাকিবে, ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণব। সকল নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু পতিতপাবন বৈষ্ণব সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। আর যাহারা ভারতের এই পবিত্র গৌরবের পক্ষপাতী, পবিত্র ধর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুরাগী উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ-যুক্ত, তাহারা অচিরে এই ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রত্নতত্ত্বের বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

রায় যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ বাহাদুর।

মৃত্যু—৫ই ফাল্গুন ; ১৩২৬। মেহেরপুর।

হে আদর্শ গ্রন্থকার, যোগেন্দ্রকুমার,
সমাপ্ত হইল তব ভ্রমণ এবার।
সেই যে পথের মাঝে দিয়েছিলে দেখা,
স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাসিমুখে, সেই চিত্রলেখা
মুছিবে না, যতদিন এ বিপুল ভবে
ধূলিমাখা পথশ্রান্তি শান্ত নাহি হবে।
এ পথের আনাগোনা—দিবারাত্রি ঘিরি
মানবের দেখাশুনা নিয়া। ঘুড়ি' ফিরি'
কাছাকাছি পাশাপাশি চ'লে যেতে হয়,
অশ্রান্ত প্রবাহ মাঝে বিশ্বে সমুদয়।
—অনন্ত জ্যোতিষ্ক চলে, চলে গ্রহগণ
চলিতেছে দিবারাত্রি চন্দ্রমা তপন,
আকাশ বাতাস চলে, চলে জল-স্থল,
মহাচক্রে বিঘূর্ণিত বিশ্ব-ভূমণ্ডল।
—দ্রুতগতি তাদের পথ পারি না বুঝিতে
অন্ধকারে ডুবে আঁখি সে পন্থা খুঁজিতে।
—পথমাঝে দাঁড়াইয়া নগণ্য পথিক
চাহে কা'র মুখ-পানে বুঝে না তা' ঠিক ;
আপন গরবে আত্ম সমুন্নত শিরে
চলে যায় কত জন, চাহে না ত ফিরে
কোন দিকে, দুর্ব্বল পড়িয়া থাকে পাশে।
—লতিকার জয়মাল্য পুষ্পিত বিলাসে,
কি মদিরা, কি আনন্দ, কি মাধুরী আছে—
সাগর সঙ্গীতে কি যে মহিমা বিরাজে
কি গরিমা চন্দ্রমার অপূর্ব্ব বৈভবে,
তপনের কি মাধুরী কনক-শৈশবে ;
কে করে তা নিরীক্ষণ আকুল লোচনে !
যে দেখে চাহিয়া তাহা, দীন আর্ত্তজনে
আগুলিয়া বক্ষে যেবা লয়, প্রাণপণে
ঢেলে দিয়া সরবস্ব অনন্ত যতনে
করি অন্বেষণ—আপনারে ভুলি' গিয়া,
যে হইবে আত্মহান আত্ম বিলাইয়া,
সে জন মহৎ ধন্য—পদপ্রান্তে তার
ব্রহ্মাণ্ড করিয়া করে প্রীতি নমস্কার।
—হে বন্ধু বিদেশী, এ প্রবাসে, এই পথে
কত চিহ্ন আছে তার পরতে পরতে।
প্রত্যক্ষে পরোক্ষে কিম্বা সে পবিত্র রেখা
চিরদিন হেম-চিত্রে রবে দীপ্ত লেখা।
—আমরা কাঁদিয়া উঠি স্মরিয়া তোমায়,
"বড় আপনার জন" চলে গেলে হায় !
—কাঁদে "শাখা পরিষৎ" সাহিত্যিক দল,
কাঁদে ধর্ম্মসভা, কাঁদে দরিদ্র দুর্ব্বল,
কাঁদে বরিশালবাসী। কাঁদিছে সঙ্গিনী
প্রাণ-প্রিয়া তব দেবী সরোজিনী*
বরিশালে—শ্মশান শয্যায় !—একবার,
এস হেথা একবার !—সুযাত্রা তোমার
যেথায় করিলে শেষ—পুণ্য হরি নামে
মিশেছ অতুল প্রেমে যে পবিত্র ধামে,
নিয়ে এস সে দেশের মহাযাত্রীদল,
প্রেমের প্রবাহ আনি ভাসাও সকল।
—তিতিয়া গৈরিকবাস স্রোত বহি ধূলে
সাজিবে মরুভূ খানি বিকশিত ফুলে ;
অসংখ্য মৃদঙ্গ বাজি, বাজি করতাল,
হুঙ্কারে কাঁপিবে সর্ব্ব আকাশ পাতাল !
এস তুমি হে যোগেন্দ্র, আন মহা রোল,
নবদ্বীপ চন্দ্রনাথে—'বোল হরি বোল'।

শ্রীঅনাথবন্ধু সেন।

---

* মৃত্যু—বরিশাল, ১৩২৩,১৭ই শ্রাবণ। সমাধি-স্তম্ভের প্রস্তর ফলকে খোদিত আছে।

"তোমারি দেওয়া নিধি
তোমারি কেড়ে নেওয়া।"

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

কেনরে কাঁদিস্ প্রাণ স্মরিয়ে তাঁহার নাম
জীবনে নয়নে যারে হের না কখন ;
কেন বজ্রাঘাত সম হৃদয়ে বাজিল মম
শুনি যবে অকস্মাৎ তব তিরোধান। ১।

সুদূর প্রবাসে থাকি নয়নে নাহি নিরখি
কেনরে আকৃষ্ট প্রাণ কে বলিবে হায়!
কেন যে আপন মানি ছুটিত পরাণখানি
তোমার সমীপে বল জানিনাত তায়। ২।

গোকুলে বাঁশী বাজিলে ছুটিত বালক দলে
অথবা উৎকর্ণ হয়ে শুনিত সে ধ্বনি
হে রামেন্দ্র! সেই মত শুনে কীর্ত্তিধ্বনি শত
অলক্ষে আকৃষ্ট হোত এ ক্ষুদ্র পরাণে। ৩।

বঙ্গভাষা সেবা তরে দিলে প্রাণ অকাতরে
ব্যোমকেশ সহযোগী ব্যোমেতে মিলন!
শুভ্র জ্যোতি চন্দ্রমার সমখ্যাতি যে তোমার
বঙ্গাকাশে সদা নিত্য দ্যুতিরে তেমন। ৪।

সাহিত্য মন্দির নব বঙ্গ কীর্ত্তিস্তম্ভ তব
অক্ষয় রাখিবে তোমা ওহে কর্ম্মবীর!
স্মরিয়ে তোমার নাম সাহিত্য সেবকগণ
দুঃখে কষ্টে সেবাকার্য্যে হবেনা অস্থির। ৫

সুপবিত্র শ্রেষ্ঠকুলে জন্ম তুমি লভেছিলে
সেই মত কার্য্য তুমি সাধিলে ভূতলে
ত্যাগ রূপ মহামন্ত্রে দীক্ষিলে শরীর যন্ত্রে
আত্মত্যাগ মহাশিক্ষা সবে প্রদানিলে। ৬।

কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরি চলি গেলে কর্ম্ম করি
সফল জনম তব বঙ্গে হয়েছিল
রামেন্দ্র সুন্দর নাম! হে ত্রিবেদী গুণধাম
পুণ্যবান পিতামাতা তব রেখেছিল। ৭।

জনমিলে মৃত্যু হয় নাহিক ইথে সংশয়
বিধাতার অলঙ্ঘ নিয়ম এই ভবে
ধন্য জন্ম তার হয় ধন্য যারে লোকে কয়
যাহার অভাব পরে লোক অনুভবে। ৮।

মৃত্যুরূপ মুক্তিদ্বারে পশেছে অমৃতাগারে
সাহিত্য কানন যথা সদা শোভাকরে।
নিরাপদে সেইস্থানে সেবো আকাঙ্ক্ষিত ধনে
আশীষবর্ষণ কোরো আমা সব প'রে। ৯।

জন্ম মৃত্যু জরাময় মানব জীবন হয়
মুক্ত হয়ে এবে শান্তি লভ সে স্বরগে।
জগদীশে নতি করি কহি অঞ্জলি পুরি,
দীন হীন আজ—এই ভিক্ষা মাগে। ১০।

শ্রীরাজকিশোর রায়।

কে তুমি?

শোক দুঃখ তাপ ভারে ভারাক্রান্ত এ হৃদয়
মায়ামোহ অশান্তিতে যবে অন্ধকারময়,
কে তুমি হৃদয়ে এস পরিয়া উজল সাজ,
শান্তির আলোক জেলে আঁধার হৃদয়মাঝ? ১

জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ভুলিয়া হায়
আত্ম সুখ লয়ে যবে হৃদয় বিব্রত রয়
সংসার-পাথার হ'তে কে তুমি গো প্রেমময়
কোলে তুলে সম্মুখেতে দেখাও কর্ত্তব্যচয়? ২

প্রতারিত পরিশ্রান্ত যবে এ হৃদয় আর
সহিতে পারে না দেব সংসারের গুরুভার
ধৈর্য্য শান্তি সাথে লয়ে হৃদয় দুয়ারে এসে
তৃপত কর এ হৃদি কে তুমি সুহৃদ্ বেশে? ৩

কে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়ে জাগ্রত থাকি,
কুপথ অশান্তি হ'তে সতত টানিয়া রাখি
পূরিছ অপূর্ণ হিয়া প্রেম-ভক্তি-শান্তিধনে
সরস করিছ আর তব কৃপা-বরিষণে? ৪

কাহার কৃপায় হস্ত প্রসারিত সাথে সাথে
কাহার প্রশান্ত মূর্ত্তি উজ্জ্বল জীবন-পথে?
সততই প্রেমময় জীবনসখা হে তুমি—
কেমনে চিনিব তোমা?
অগম্য অচিন্ত্য তুমি।

শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ।

তিলোত্তমা ও আয়েষা।

তিলোত্তমা ও আয়েষা প্রণয়ের দুই আদর্শ মূর্ত্তি। দুইই সুন্দর, দুইই কাঙ্ক্ষিত। তিলোত্তমা সরস্বতীর মত মৃদু স্রোতা। আয়েষা যমুনার মত স্রোতস্বতী। তিলোত্তমা পদ্মশ্রী। আয়েষা রাজলক্ষ্মী। প্রথমটী স্ফুটনোন্মুখা নবমল্লিকা। দ্বিতীয়টী পূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদল। একটী পূর্ণচন্দ্রের বিমল প্রভা, অন্যটী বালসূর্য্যের উজ্জ্বল রশ্মি। এটী স্বপ্নের ফুল। ওটী আরাধনার ফল। এ আবেশ। ও সুখ। শিরীষসুকুমারা তিলোত্তমা দেখিবার জিনিষ, আদরের বস্তু। জ্যোতির্ম্ময়ী আয়েষা স্পর্শের সামগ্রী, ভোগের মূর্ত্তি। তিলোত্তমা বুদ্বুদের মত ফুটে। আয়েষা উৎসের মত ছুটে।

তিলোত্তমা।

তিলোত্তমা নামটী সার্থক। বিশ্বের সমগ্র সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিল তিল আবরণে এই মূর্ত্তির নির্ম্মাণ। কবির সৃষ্ট এ মূর্ত্তিখানি স্বর্গের অপ্সরা-স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। সৌন্দর্য্যের মানসী মূর্ত্তি মর্ত্ত্যের অধিবাসিনী হইয়া যেন নামিয়া আসিয়াছে ; ইহার অঙ্গে পারিজাতের অম্লান সৌরভ, নয়নের নন্দন নিকুঞ্জের শ্যাম শোভা, বাক্যে ত্রিতন্ত্রীর মৃদুল ঝঙ্কার। আর প্রেমে অমৃতের মধুর আস্বাদ। ইহার ছায়াতরল মৌন সৌন্দর্য্য এ পৃথিবীর নহে।

অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মে তিলোত্তমা সমধিকলজ্জাবতী, প্রথমাবতীর্ণ যৌবন মদন-বিকারা মুগ্ধা নায়িকা।

প্রথমাবতীর্ণ যৌবন মদন বিকারা রতৌ বামা। কাঙ্ক্ষিতা মৃদুশ্চ মানে সমধিক লজ্জাবতী মুগ্ধা। (সহিত্য দর্পণ, ৩য়)

তিলোত্তমা ষোড়শী, প্রথম যৌবনাবির্ভাবে রমনীয়া, মুগ্ধকরী। ভাবে সারল্যে কিশোরী। বুদ্ধিতে বালিকা। আর অভিমানে অতি মৃদু। প্রণয়ে নিরভিমানিনী।

প্রণয়ে নিরভিমানিনী সংসারে বড় দুর্লভ। পাশ্চাত্য সাহিত্যে দেসদিমনা চরিত্রটী নিরভিমানিতার আদর্শ চিত্র। পিতার অভিশাপের জলন্ত দাহে সে কোমল কুসুম অকালে শুকাইয়া গেল। আর তিলোত্তমা মরণের কোল থেকে ফিরিয়া আসিল। নিরভিমানিতা আদর্শ প্রেমের লক্ষণ, ইহা কবির উক্তি। প্রেমাস্পদের সুখ যেখানে কাঙ্ক্ষিত, আপনার স্বার্থ যেখানে বিসর্জ্জিত, সেই খানেই প্রণয়ের নিরভিমানিতা। সংসারে ইহা স্বাভাবিক নহে। আত্মদানই সেখানে আত্ম বিসর্জ্জন বা আত্মত্যাগ।

অভিমান সাধারণত প্রণয়েরই লক্ষণ। ইহারও দ্বিবিধ আদর্শ, দুইটী দিক্। এক, ভ্রমর। অপর শ্রীরাধা।* প্রণয় যেখানে যত প্রবল, অভিমানও সেখানে তত অধিক। প্রণয়ী তেমন ভালবাসিল না, তেমন আদর করিল না, সে আত্মহারা ভাব দেখাইল না, অমনই অভিমান। মতে মত মিলিল না, আচরণে ঔদাসীন্য প্রকাশ পাইল, অমনই অভিমান। অন্যাসক্তি, সেত সহ্যের অতীত।

* অর্চ্চনায় ১৩২০।২।১২২ সালে। শ্রীরাধা নব্যভারতে ১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ।

তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য বাসন্তী মল্লিকার মত নবস্ফুট, ব্রীড়াসঙ্কুচিত, কোমল পরিমলময় বলিয়া তাহার প্রেমও চন্দ্রকিরণের মত শীতল, কোমল ও মনোরম। তাই সে প্রেমে মাধুর্য্য আছে কিন্তু দাহ নাই, আবেশ আছে কিন্তু উন্মত্ততা নাই। মগ্ন প্রেমের বিপুল আত্মবিস্মরণ কালিদাসের শকুন্তলার স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়।

তিলোত্তমা একাধারে বালিকা, কিশোরী, নবীনা যুবতী। প্রকৃতি কোমলা আর সরলা। শিক্ষা, সংসর্গে ও গ্রন্থপাঠে সে কোমলতা, সে সরলতা হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। বয়সের ধর্ম্মে যৌবনসুলভ চাতুর্য্য, কুটিলতা ও আবিলতা দেখা যায় নাই। দেহে যৌবনের শ্যাম শোভা পুষ্পিত, মুখখানি কিন্তু বালিকার মত নির্ম্মল ও সুকুমার। প্রকৃতির কোমলতায় অভিজ্ঞান শকুন্তলে অনসূয়া বৃত্রসংহারে ইন্দুবালা, বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনী অনুরূপচিত্র, সরমে কুণ্ঠিত, ভয়ে জড়সড় মিলন সুখে বিবশ, প্রণয়ে নিরভিমান—এ চিত্র বিশ্বে কয়খানি মেলে?

প্রথমাবতীর্ণ যৌবন মদনবিকারা, নবপ্রণয়বতী মুগ্ধা তিলোত্তমার প্রেমে সংযমের আশা করাই বৃথা। প্রথম দর্শনে যে অবগুণ্ঠনের কিয়দংশ অপসৃত করিয়া জগৎ সিংহের প্রতি অনিমেষ লোচনে চাইয়াছিল, না ভাবিয়া না চিন্তিয়া একেবারে প্রাণমন নিবেদন করিয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল, ক্ষণেকের মিলনে আত্মহারা হইয়া অদর্শনের আশঙ্কায় কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিল, প্রণয়নৈরাশ্যে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িয়া তবুও সেই জগৎসিংহের ধ্যানে নিমগ্না ছিল। তার কাছে চিত্তবলের বা চিত্তসংযমের আশা কোথায়? হৃদয়ের টানে, ভাবের স্রোতে গা ভাসাইয়া বহিয়া যাওয়াই একজাতীয় প্রকৃতির ধর্ম্ম। তিলোত্তমা সেই নারী মাত্র।

তিলোত্তমার নূতন প্রেম কতকটা রূপজ, কতকটা বা অহেতুক। কবিগণ রূপজ ভালবাসাকে মদনশরজ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। আর অহেতুক প্রণয় ভবভূতির ভাষায় চক্ষুরাগ বা তারামৈত্রিক নামে অভিহিত হইয়াছে। সংযমানভ্যস্তা, কোমলহৃদয়া ভাবময়ী বলিয়াই তিলোত্তমা তাই প্রথম প্রণয়েই এমত বিহ্বলা, এরূপ অধীরা হইয়া পড়িয়াছে।

তিলোত্তমার রূপালোক বালেন্দু জ্যোতির মত সুবিমল, সুমধুর ও সুশীতল। সে রূপালোকে প্রেমের খেলা বেশ চলে, আমোদ ভালই জমে, হৃদয়ের আঁধার একেবারে দূরে যায়, কিন্তু তাহাতে সংসারের বড় কার্য্য হয় না, জীবন-সংগ্রামে যথার্থ সঙ্গিনীর উপকার পাওয়া যায় না। তাহার চক্ষু শান্ত, স্থির। সে চক্ষুতে যৌবন-সুলভ চাপল্য, চাতুর্য্য ছিল না। বিদ্যুদ্দামস্ফুরণ চকিত কটাক্ষ" খেলিত না। হাব ভাব, বিলাস, বিভ্রম ও ভ্রূভঙ্গী দেখা যাইত না। তাহা সায়াহ্ন আকাশে নক্ষত্রের মত সুন্দর। সে দৃষ্টিতে সরল স্নেহ যেন ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িত, স্বর্গের অমৃত গলিয়া গলিয়া ক্ষরিত। তার গতি স্থির, কিন্তু গজেন্দ্র গতির সহিত তুলনীয় নহে। সে তন্বী, গজেন্দ্রগমনা নহে। সে সুকুমার পবিত্রহৃদয় গঙ্গাজলের সহিতই উপমিত। ভালবাসার দাগ কোমল হৃদয় পাইয়া তাহাতে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গেল। মদনের শর কোমল বুকের মধ্যে তীক্ষ্ণ শলাকার মত আমূল প্রোথিত হইয়া পড়িল।

এত সরলা—ভালবাসিবার পূর্ব্বে কোন বিচারই করিল না। এমত বালিকা—লতা পাতা লিখিতে বলিয়া জগৎসিংহের নাম লিখিয়াছে বলিয়া ভয়ে চোর হইয়া গেল। নূতন প্রণয়ে বিভোরা গীতগোবিন্দ পড়িতে পড়িতে সলজ্জ ঈষৎ হাসিয়া লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া গিয়া পুস্তক ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তিলোত্তমার প্রাণ বড় দুর্ব্বল, ভয়াতুর। মোগল আক্রমণ সংবাদেই চীৎকার করিয়া পালঙ্কের উপর একেবারেই মূর্চ্ছাপ্রাপ্তা। বড় ভাবময়ী সে। তাই বীণার ঝঙ্কারের মত প্রিয়তমের কণ্ঠলগ্নই হইল, কিন্তু ভেরী-ধ্বনির মত বীরের উৎসাহ বর্দ্ধন করিল না। যুদ্ধের শেষে শান্তির মত, শ্রমাবসানে বিশ্রান্তির মত সে প্রিয়া হইল, কিন্তু জীবনের প্রকৃত কর্ম্মরূপা, বীরত্বের প্রত্যক্ষ সহায়রূপা হইতে পারিল না। রাজপুতনার ক্ষত্রিয় কন্যা বাঙ্গালার জলবাতাসের গুণে বাঙ্গালীর মেয়ের মত হইয়া আসিল।

আয়েষা।

আয়েষা স্থিরা, ধীরা, সংযতহৃদয়া ও মহীয়সী নারী। বেহেস্তার রাণী মূর্ত্তি ধরিয়া যেন ধরায় অবতীর্ণা। মুখে দেবীর করুণা, ভঙ্গীতে সম্রাজ্ঞীর ভাব। সেই উন্নত আকার, সেই সুপরিপুষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সেই নব সূর্য্য-করোজ্জ্বল বর্ণ আর সেই মহিমাময় পদবিন্যাস সম্রাজ্ঞীর উপযুক্ত।

অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুশাসনে আয়েষা "মধ্যা" শ্রেণীর নায়িকা। প্ররূঢ়স্মর যৌবনা ঈষৎ প্রগল্‌ভ বচনা, মধ্যম ব্রীড়িতা নারীই মধ্যা নায়িকা। তিলোত্তমা নব প্রস্ফুটিতা, আয়েষা পূর্ণ প্রস্ফুটিতা। দ্বাবিংশতি বৎসরের আয়েষা পূর্ণ-যৌবনা। বাক্য বীণাধ্বনিবৎ সুস্পষ্ট, কিন্তু স্থান বিশেষে ঈষৎ প্রগল্‌ভ। না নির্লজ্জা, না-সমধিক লজ্জাবতী আয়েষা।

আয়েষার সৌন্দর্য্য "নবকরিকুম্ভদল নলিনীর ন্যায় সুবিকাশিত, সুবাসিত, রসপরিপূর্ণ, রৌদ্র-প্রদীপ্ত কোমল অথচ উজ্জ্বল। তাহার রূপ ভুবনমনোমোহন, পূর্ব্বাহ্ণের সূর্য্যরশ্মির মত প্রদীপ্ত, প্রভাময়, যাহাতে পড়ে, তাহাই যেন হাসিতে থাকে। রাজোদ্যানের বসোরা গোলাপ। ধ্যানলভ্যা আরাধ্যা মূর্ত্তি। প্রথম দর্শনেই জগৎসিংহের নিকট দেবকন্যাবৎ প্রতীয়মানা। জগৎসিংহ তাহার বায়ুকম্পিত নীলোৎপল-দলতুল্য কটাক্ষের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন। তার লীলাময় মধুর পদবিন্যাস, "বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ মেঘবৎ চঞ্চল হাসি" আর লাবণ্যময় গ্রীবা-ভঙ্গী তাহাকে অলোকসামান্য বিশেষত্বের অধিকারিণী করিয়া তুলিয়াছে। তাহার অন্তঃকরণ কুসুমের মত কোমল, আবার কদাচিৎ প্রয়োজন বোধে বজ্রবৎ কঠোর। তরুর মত সহিষ্ণু,স্বভাবতঃ করুণাময়ী আঘাত প্রাপ্তে ক্বচিৎ সহিষ্ণু, প্রখর জ্বালাময়ী।

আয়েষা জগৎসিংহকে প্রথম দর্শনেই তিলোত্তমার মত ভালবাসিয়া ফেলে নাই। এ ভালবাসা একদিনে একক্ষণে জন্মে না। ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া আপন প্রভাব বিস্তার করে। ছদ্মবেশে গোপনে প্রবেশ করিয়া শেষে অকস্মাৎ আপনার প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়া দেয়। বন্দী রাজপুত্রের প্রতি সমবেদনা, মুমূর্ষুর প্রতি করুণা, ব্যথিতের উপর সান্ত্বনাই ক্রমে ভালবাসায় পরিণত হয়। আয়েষা জানিত, পীড়িতকে সেবা করা, ব্যথিতকে সান্ত্বনা দেওয়া নারীর ধর্ম্ম। ওসমানের অনুরোধও পরিচর্য্যার ভার গ্রহণের অন্যতম হেতু। করুণায় সমবেদনায় তাহার নারীহৃদয় দিনে দিনে দ্রবীভূত হইতে লাগিল। সুপুরুষসংস্পর্শে দেবকান্তি রাজ-

পুত্রের সাহচর্যে সেই দ্রবীভাব অনুরাগে পরিণত হইল। মৃত্যুর কোলে শুইয়া জগৎসিংহ যখন আয়েষাকে সান্ত্বনার মত আঁকড়াইয়া ধরিত, তখন তাহার চক্ষুদুটী জলে ভরিয়া যাইত। বড় আগ্রহে ব্যথাকাতর রাজপুত্র যখন আয়েষার করদুটী গ্রহণ করিত, তখন তার নারীহৃদয় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিত। যৌবনের বৃত্তিগুলি জাগিয়া উঠিয়া মাথা খাড়া দিত। আয়েষা তাহার বিস্ফারিত তৃষাতুর দৃষ্টি দ্বারা পলে পলে রাত্রিদিন রাজকুমারের রূপমদিরা পান করিতে লাগিল। তাহার মন সেই মদিরা পানে ভিতরে ভিতরে বিহ্বল হইয়া উঠিল। স্নানের সময় উত্তীর্ণ না হইলে স্নান করিতে যাওয়া ঘটিত না। মাতার নিকট আহ্বান না আসিলে পীড়িতের সান্নিধ্য ত্যাগ করা হইত না।

আয়েষা প্রতিদানের আশা না করিয়া ভালবাসিয়াছিল। জানিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া ত আর সে ভালবাসে নাই। নতুবা যেখানে মিলনের আশা নাই, সেখানে বুদ্ধিমতী হইয়া কেন সে ভালবাসিবে? আয়েষা সাধ করিয়া ত আর সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হয় নাই।

আয়েষা ভাবময়ী অথচ কর্ম্মময়ী। বীণার ঝঙ্কারের মত সে যেমন কণ্ঠে থাকিবার যোগ্যা, ভেরীধ্বনির মত তেমনই বীরের উৎসাহ বর্দ্ধয়ত্রী। যুদ্ধাবসানে শান্তি, যুদ্ধাবির্ভাবে উত্তেজনা। গৃহে গৃহলক্ষ্মী, যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী।

তিলোত্তমা।

তিলোত্তমা পিতৃগৃহে নবমল্লিকার মত মন্দবায়ু হিল্লোলে বিধূত হইয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত, আর আজ সে কতলুখাঁর গৃহে বন্দিনী। নৈদাঘ ঝটিকাতে অবলম্বিত বৃক্ষ হইতে ভূতলশায়িত লতার দশায় উপনিতা। মুখের সে জ্যোৎস্নামধুর হাসি বিলুপ্ত, চক্ষুর সে ধীর প্রশান্ত দৃষ্টি নৈরাশ্যভারে অবনমিত, বিষাদ-প্রতিমা কোমলপ্রাণা বালা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শয্যায় অবসন্ন ভাবে শায়িতা।

দুঃখে পড়িলে মানুষের অনেক শিক্ষা জন্মে। দুঃখশোক মানুষকে নূতন করিয়া গড়ে। তিলোত্তমা আর সে হাস্যময়ী বালিকা নাই, লজ্জাশীলা নবপ্রণয়িনী নহে। দেখিলে বোধ হয়, যেন দশ বৎসর বয়স বৃদ্ধি পাইয়াছে। কতলুখাঁর জন্মোৎসবে যোগ দিবার জন্য বিমলা বেশবিন্যাস করিয়া তিলোত্তমার কক্ষে উপস্থিতা। সে সাজসজ্জা তিলোত্তমার সহ্য হইল না। কহিল, "তবে মা এ সকল অলঙ্কার খুলিয়া ফেল। আমার চক্ষুশূল হইয়াছে।" তিলোত্তমার এ করুণ ছবি কুমারসম্ভবের রতির অবস্থা স্মরণ করাইয়া দেয়—

গত এব ন তে নিবর্ত্ততে স সখা দীপ ইব নীলাহতঃ।

অহমস্য দশের পশ্য মামবিসহ্যব্যবসেন ধূমিতাং॥ (৪র্থ সর্গ)

বিমলা আজ প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসংকল্পা, তাই রূপের ফাঁদ পাতিয়াছে। সে আজ নবাবকে সেই ফাঁদে ফেলিয়া পতিহত্যার প্রতিশোধ দিয়া স্বর্গগত পতির তৃপ্তিসাধন করিবে। বিমলা তিলোত্তমাকে ওস্মান্-প্রদত্ত মুক্তি-চিহ্নস্বরূপ অঙ্গুরীয়টী দিয়া তৎসাহায্যে এ রাক্ষসীপুরী ত্যাগ করিয়া অভিরাম স্বামীর কুটীরে যাইবার পরামর্শ দিয়া গেল। আশমানী অভিরামস্বামীর প্রেরিত হইয়া নবাবান্তঃপুরে নূতন পরিচারিকারূপে

প্রবেশ করিয়াছে, সেই আশমানী দ্বারাই বিমলার সহিত অভিরামস্বামীর সংবাদ আদান প্রদানের কার্য্য চলিত।

তিলোত্তমার বড় সাধ, জানিয়া লয় যে রাজপুত্র কি অবস্থায় আছেন। (বিমাতা) মায়ের কাছে প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইল, "জগৎসিংহ দুর্গমধ্যে এবং শারীরিক ভাল আছেন।" এখন তিলোত্তমা বাষ্পাকুললোচনা হইয়া ভাবিতে বসিল, "রাজপুত্র আমার জন্য কারাগারে বন্দী। কেমন সে কারাগার! আচ্ছা, এ অঙ্গুরী দ্বারা তাঁহার উদ্ধারের কৌশল করা হয় না? একবার তাঁহার সাক্ষাৎ মেলে না?"

তিলোত্তমা অঙ্গুরী লইয়া, গা কাঁপে, হৃদয় কাঁপে, মুখ শুকায়—তবু চলিতে লাগিল। প্রহরীর "কোথায় লইয়া যাইব" এই প্রশ্নের উত্তরে কোনরূপে অর্দ্ধস্ফুট "জগৎসিংহ" এই কথাটী মাত্র উচ্চারণ করিল। তৎপরে প্রহরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যন্ত্রচালিত পুত্তলিকা মত কারাগার দ্বারে আসিয়া পৌছিল। পা আর সরে না। কপাটে মাথাটী রক্ষা করিয়া কোনমতে দাঁড়াইয়া রহিল। একবার মনে করিল "ফিরিয়া যাই" কিন্তু ফিরিতেও পা উঠে না। তখন তিলোত্তমার "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থা। (কুমারসম্ভব সর্গ শেষ)

তারপর জগৎসিংহের নয়নে নয়ন মিলিল, তিলোত্তমা বেতস লতার মত কাঁপিয়া উঠিয়া সম্মুখে ঢলিয়া পড়িবার মত হইল। জগৎসিংহ পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইল। অমনই তিলোত্তমার দেহ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। ক্ষণপ্রস্ফুটিত হৃৎপদ্ম সঙ্গে সঙ্গে শুকাইয়া উঠিল। "বীরেন্দ্রসিংহের" কন্যা এই নিষ্প্রণয় সম্বোধনে "এখানে কি অভিপ্রায়ে"? এই সোবহেল ব্যবহারে তিলোত্তমার মাথা ঘুরিয়া গেল। কক্ষ, প্রাচীর, শয্যা, প্রদীপ যেন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, তিলোত্তমার বাকশক্তি তখন বিলুপ্ত, ইন্দ্রিয় অসাড়, চিত্ত বিমূঢ়। সে কথার উত্তর দিবে কি? এযে স্বপ্নের অগোচর। তারপর শুনিল, "তুমি ফিরিয়া যাও, পূর্ব্ব কথা বিস্তৃত হও", তখন আর ভ্রম রহিল না। বৃন্তচ্যুত পল্লীবৎ নিঃসঙ্গ হইয়া সে স্বর্ণপ্রতিম ভূতলে পতিত হইল।

ভবভূতির সীতা পতি কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিতা হইয়া দুঃখ শোক সম্বরণে অসমর্থা হইয়া সজ্ঞানে ধরণীগর্ভে ঝাঁপ দেন। আর তিলোত্তমা মানসিক বেদনায় বিগত-চেতনা হইয়া সজ্ঞানে ধরণীবক্ষে লুটাইয়া পড়ে। ভবভূতির সীতা, কালিদাসের শকুন্তলা, কোন উপায়ে অবসন্ন প্রাণটী ধরিয়া রাখিয়াছিল; তিলোত্তমা কিন্তু সে দুঃখশোক সহ্য করিয়া কোনমতেই প্রাণকে ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল। জগৎসিংহের প্রণয়বারিসেচনে সে নিদাঘ-তপ্তা বল্লরী ধীরে ধীরে বাঁচিয়া উঠিল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপটী বিন্দু বিন্দু তৈল সঞ্চারে আবার হাসিয়া উঠিল। প্রণয় অনেক সময়ে মৃতসঞ্জীবনী শক্তির পরিচয় দেয়। কুমার জগৎসিংহ আসিয়াছেন শুনিয়া তিলোত্তমা কি করিল?

শুধু নিমীলিত নয়নপদ্ম উন্মীলিত করিয়া এক দৃষ্টে জগৎসিংহের প্রতি চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি কোমল কেবল স্নেহব্যঞ্জক। তিরস্করণভিলাষের চিহ্নমাত্র-বর্জ্জিত।

তিলোত্তমা ভালবাসার ক্রীড়নী। তাহার প্রেমপ্রতিম মুখখানি সংসারের অনেক জ্বালা যন্ত্রণা ভুলাইয়া দেয়। কর্ম্মজগতে সে কর্ম্মময়ী হইয়া আইসে নাই। কবিতার রাণী, স্বপ্নের ছবি, হৃদয়ের বিশ্রামরূপা। ধনাঢ্য

গৃহে থাকিয়া সহচরিদের সাহায্যে তিলোত্তমার সরলবুদ্ধি কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। বুদ্ধিতে আয়েষার নিকট সে বালিকা মাত্র। আয়েষা যখন বহুমূল্য অলঙ্কারে তিলোত্তমাকে মনোমত সাজাইয়া বলিয়াছিল "তুমি যে রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ সকল তাঁর চরণরেণুর তুল্য নহে।" এ কথার ভিতর তিলোত্তমা আদৌ প্রবেশ করিতে পারিল না। আমার—তোমার "সাররত্ন" বলিতে বলিতে যখন আয়েষার কণ্ঠরোধ হইল, নয়নপল্লব জলভারস্তম্ভিত হইয়া কাঁপিতে লাগিল, তখনও তিলোত্তমা কিছুই বুঝিল না; সমদুঃখিনীর ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল মাত্র "কাঁদিতেছ কেন?" তারপর দরদরধারে নয়ন বারিস্রোত বহিতে লাগিল। তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতবেগে আয়েষা গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল; তবুও তিলোত্তমার চিত্তে কোন সংশয়ের রেখাটুকুও পড়িল না। এমত সরল অন্তঃকরণ পাওয়া বহু তপস্যার ফল। খেলার পুতুলের মত তিলোত্তমাকে দিয়া মিলনের খেলাই চলে—তাই তিলোত্তমা সংযম ও সহিষ্ণুতার মূর্ত্তি হইল না। সংযম ও সহিষ্ণুতার বলে আয়েষার মত বাঁচিয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। জগৎসিংহকে পতিরূপে পাইয়া তিলোত্তমা কৃতার্থ হইল।

"প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা"

আয়েষা।

আয়েষা কোমলা ও তেজস্বিনী। বালসূর্য্য-প্রভা আবার কার্য্যক্ষেত্রে নৈদাঘসূর্য্যরশ্মি। কারাগারে আয়েষা যখন কোনরূপ দ্বিধাসঙ্কোচ না করিয়া স্নেহময়ী রমণীর মত মূর্চ্ছিতা তিলোত্তমাকে কোলে তুলিয়া লইল, প্রেমময়ী নারীর ন্যায় কোমলকরপল্লবে রাজপুত্রের করপল্লব গ্রহণ করিল, রাজপুত্রের ব্যথা দর্শনে কাতরা হইয়া দরদরধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল—সে কোমলমূর্ত্তি। করপল্লবে উক্ত ব্যাধির বিন্দুপাত অনুভব করিয়া জগৎসিংহ যখন সবিস্ময়ে আয়েষাকে কহিল "তুমি কাঁদিতেছ আয়েষা?" তখন আয়েষা সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। ধীরে ধীরে গোলাপফুলটী নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া ফেলিল মাত্র। এ প্রেমিকা মূর্ত্তি। আপনি স্থলে এই তুমি সম্বোধনে আয়েষা বুঝিল। জগৎসিংহ তাহাকে কত আপনার ভাবিয়াছে। আয়েষা ইষ্টদেবী ভবানীর মত জগৎসিংহকে মুক্তি দিবার প্রস্তাব করিল। তাহাকে বিপদে ফেলিয়া জগৎসিংহ মুক্তি চাহে না—দেখিয়া আয়েষার চক্ষে দরদরবারি ধারা বহিল—এ করুণাময়ী দেবী মূর্ত্তি।

আয়েষা স্নেহময়ী ভগিনীর মত ওস্‌মানকে স্নেহ করিয়া আসিয়াছে। তাহাকে বিবাহ করিবে, এমত ইচ্ছা সে পোষণ করে নাই। ওসমান যে তাহাকে প্রণয়িণীর চক্ষে দেখে, সেই মত ভালবাসে, তাহা আয়েষা জানিত। আয়েষা যখন জগৎসিংহের হাতখানি আকুল আগ্রহে ধরে দরদর ধারায় কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়—তখনই তাহার প্রেম কতকটা ব্যক্ত হইয়া উঠে। তিলোত্তমাকে অগ্রে হৃদয়দান না করিলে আয়েষার আকর্ষণে জগৎসিংহ অবশ্যই তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। আয়েষা যদি জগৎসিংহের ভালবাসা লাভ করিত, তাহাদের মিলনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিষম বাধা না থাকিত—তাহা হইলে আয়েষার প্রেম এমত নিঃস্বার্থ হইতে পারিত না।

আয়েষার অশ্রু তখনও শুকায় নাই, এমন সময়ে কারাগারে কাহার ছায়া পড়িল। ওস-

মান স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ক্রোধ-কম্পিতস্বরে কহিল "নবাবপুত্রি, এ উত্তম।"

ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া কথার অভিপ্রায় বুঝিয়া আয়েষার মুখ রক্তবর্ণ হইল। কোনমতে ধৈর্য্য ধরিয়া স্থির স্বরে উত্তর দিল "কি উত্তম ওসমান?"

"নিশীথে একাকিনী বন্দী-সহবাস নবাব-পুত্রীর পক্ষে উত্তম!" আয়েষার কর্ণে কে যেয তপ্ত সলিল ঢালিয়া দিল। এ তিরস্কার তাহার পবিত্র চিত্তে সহ্য হইল না। এ হিংস্র বাণী তাহাকে উত্তেজিতা করিয়া তুলিল। প্রত্যেক বিশেষণটী এক একটী তীক্ষ্ণশরের মত তাহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিল।

"আমার কাজ উত্তম কি অধম, সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।" ওসমানের ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, ব্যঙ্গস্বরে কহিল "আর আমিই যদি জিজ্ঞাসা করি!" আয়েষার বিশাললোচন তখন আরও বর্দ্ধিতায়তন হইল। মুখপদ্ম আরও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। স্বর গার্ব্বিত ও গম্ভীর হইয়া আসিল, তখন তেজস্বিনী মূর্ত্তি।

তেজস্বিনী নারী মস্তকের একদেশ হেলাইয়া তরঙ্গান্দোলিত শৈবালদলবৎ হৃদয় উৎকম্পিত করিয়া ওসমানকে কহিল "এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।"

সেই মুহূর্ত্তে কক্ষ মধ্যে যেন বজ্রপতন হইল। আয়েষার নীরব রোদনের কারণ জগৎসিংহের চক্ষে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইল। তিল তিল করিয়া অনেকদিনের অনেক ব্যবহার অনেক কথা স্মৃতিপথে আসিল। ওস্মান অবিশ্বাসিনী ভাবিয়াছিল বলিয়া আয়েষার ভিতরকার সুপ্ত তেজ জাগিয়া উঠিল। সতীত্বের উপর আঘাতের মত বড় আঘাত মেয়েমানুষের আর নাই। নারী-সম্মানে ঘা লাগিয়াছে, নারী-হৃদয় মাথা খাড়া দিয়া উঠিল। উত্তেজনার বশে তাহার রুদ্ধ ভালবাসা প্রকাশ হইল। ভাবের মূর্ত্তি ভাষায় ফুটিয়া উঠিল। আয়েষার চক্ষু ফাটিয়া তপ্ত অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। ক্রমে তাহার সেই জ্বালাময়ী মূর্ত্তি ক্রমশঃ কোমলভাব ধারণ করিল। আয়েষা অশ্রু মুছিল। যে আয়েষা, সেই আয়েষাই হইল। কেবল একটী জলোচ্ছাস নদীর উপর দিয়া বহিয়া গেল। মাত্র একটী ভূমিকম্প ধরার আপাদ মস্তক টলাইয়া দিয়া গেল, প্রবল ঝটিকাবসানে প্রকৃতির মত কক্ষের অবস্থা নিথরভাব ধারণ করিল।

ওসমান কথা কহিবে কি? তাহার মনের সংশয় যে সত্য হইবে, এ যে স্বপ্নেরও অগোচর। যে আশা-লতিকার মূলে এতদিন জলসেচন করিয়া আসিয়াছে, আজ যে তাহা সমূহ উৎপাটিত হইয়া যাইবে, ইহা কে জানিত? আয়েষা স্নেহময়ী ভগিনীর মত ওসমানকে সান্ত্বনার কথা বলিয়া দাসীর ফিরিয়া আসা অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেল। ওসমান কিয়ৎক্ষণ বিহ্বলের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজ মন্দিরে প্রস্থান করিল।

সেই রাত্রেই সুরাপানোন্মত্ত কতলুখাঁর বক্ষে আমূল ছুরিকা বসাইয়া দিয়া বিমলা পতিহত্যার প্রতিশোধ দিল। সাংঘাতিক আহত হইয়া নবাব সেই কক্ষে পতিত হইল।

মুমূর্ষু পিতার মস্তক ক্রোড়ে করিয়া আয়েষা নিঃশব্দে উপবিষ্টা। নয়নাশ্রুধারায় মুখখানি পরিপ্লাবিত। সে মূর্ত্তি স্থির গম্ভীর নিঃস্পন্দ। জগৎসিংহও আহুত হইয়া সেখানে উপস্থিত। সন্ধির প্রার্থনায় জগৎসিংহ কতকটা সম্মত হইলে নবাবের মুখ, মৃত্যু-পীড়িত মুখ প্রদীপ্ত হইল। সেই সাংঘাতিক মুহূর্ত্তেও আয়েষার কি সংযমের পরাকাষ্ঠা

দেখা গেল। পিতার কাণে কাণে আয়েষা কি বলিয়া দিল, অমনই সেই মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে নবাব 'বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা সাধ্বী তুমি দেখিও" ইহা বলিয়া গেল। আয়েষার নাম মুখে উচ্চারণ করিতে করিতে নবাবের নিষ্জীব মস্তক ভূমে লুটাইয়া পড়িল আয়েষা মূর্চ্ছিতা হইল না, কেবল শোকভীর-স্তম্ভিতা হইয়া বসিয়া রহিল।

এইবার জগৎসিংহের ফিরিবার পালা। যাইবার সময় আয়েষার সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়াও তাহার সাক্ষাৎ মিলিল না। ওসমানের হৃদয়ের আগুন আরও জলিয়া উঠিবে, সে বিষম বেদনা পাইবে, তাই আয়েষা পাষাণীর মত সাক্ষাৎ না করার কষ্ট সহ্য করিল। আত্ম-ধৈর্য্যের প্রতি অবিশ্বাসিনী বলিয়া যে সে সাক্ষাত করিল না, তাহা নহে। তবে বারান্তরে সাক্ষাতের প্রত্যাশা আর সে করিতে পারে না; কারণ "নারীহৃদয় দুর্দ্দমনীয়,অধিক সাহস অনুচিত." এ আশঙ্কাও ছিল। তবে এই প্রদেশে যদি জগৎসিংহ বিবাহ করেন, তবে যেন আয়েষাকে সংবাদ দেওয়া হয়, এইমাত্র অনুরোধ করিয়া রাখিল।

বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিতা হইয়া আয়েষা তিলোত্তমার জন্য অন্যজনদুর্লভ হীরকাদি-খচিত রত্নালঙ্কার প্রস্তুত করাইয়া, রাখিয়া-ছিল। মনোমত সাজাইয়া তিলোত্তমার মুখ খানি ধরিয়া এ সরল প্রেমপ্রতিমমুখখানি দেখিলে প্রাণেশ্বর মনপীড়া পাইবেন না, ভাবিয়া আশ্বস্তা হইল। "যখন বিধাতা অন্তরূপ ঘটাইলেন না, তখন ইহার দ্বারা তিনি সুখী হউন।" আয়েষা এই প্রার্থনাই করিল। অন্তরূপ, জগৎসিংহ-আয়েষা মিলন বাকী।

পূর্ব্বে নবাবপুত্রী বন্দীরাজপুত্রকে তুমি সম্বোধন করিত। আর আজ জগৎসিংহের সে প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী দাসী হইয়া কেমন করিয়া তুমি সম্বোধন করিবে? জগৎসিংহ আপনি ছাড়িয়া তুমি ধরিল। আয়েষা তুমি স্থলে আপনি আরম্ভ করিল।

আয়েষা সংযমে, সহিষ্ণুতায় এবং স্বার্থ-ত্যাগে আদর্শ। তবু সে হৃদয়ে নারী; রক্ত-মাংসে গড়া মানবী। "আমার—তোমার সার-রত্ন" বলিতে গিয়া তাই তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। এত বড় আত্মবলি দিতে যাইয়া যার প্রাণ একেবারে কাতর না হয়, সে কেমন নারী! কেমন তার হৃদয়! প্রেমিকা যুবতী ব্যর্থ জীবনভাবে নৈরাশ্য বেদনার চাপে পীড়িতা হইয়া যদি নাই কাঁদিল; তবে তাহার নারীত্ব, তাহার হৃদয়বত্তাই যে পরিস্ফুট হয় না। সে ত আর পাষাণ-নির্ম্মিতা নহে যে, তাহার সান্ধ্য-সমীরণ-কম্পিত নীলোৎপলদল-বৎ চক্ষু অশ্রুভরে একটু টলমল করিবে না? তৃষাতুর বিশুষ্ক অধর প্রণয়বারি পান লালসায় ক্ষণেকের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে না?

নিরাশপ্রণয়িনী হইয়া আয়েষা সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী। তিলোত্তমাকে বঞ্চিত করিয়া, প্রাণেশ্বরের ধর্ম্মলোপ করাইয়া নিজের সুখ-ভোগ বা স্বার্থসিদ্ধি সে চাহে না, ওসমানের হৃদয়ে ব্যথা লাগিবে বলিয়া সে সাক্ষাৎ পর্য্যন্তই করিল না। প্রলোভনের বস্তু বলিয়া (একবার সকল যন্ত্রণা জুড়াইবে বলিয়া মনস্থ করিয়া-ছিল) গরলাধার অঙ্গুরিয়টী পর্য্যন্ত জলে ফেলিয়া দিল।

প্রলোভন জয়ই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। সংযম, সহিষ্ণুতা ও ত্যাগই মানবকে দেবত্বে উন্নীত করে। প্রলোভন জয়ের একদিক্‌কার আদর্শ প্রতাপ, অপরদিক্‌কার আদর্শ আয়েষা। প্রতাপ দেবতা, আয়েষা দেবী। প্রতাপ

শৈবলিনীর প্রণয়-যাচ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার মঙ্গলের জন্য তাহারই কথায় প্রাণ-বিসর্জ্জন করিয়াছিল, প্রতাপ দেবতা। আর আয়েষা দুর্ব্বল-হৃদয়া নারী হইয়া স্মৃতি মাত্র সম্বল করিয়া তাহারই ধ্যানে সন্ন্যাসিনী-জীবন কাটাইয়া দিল—আয়েসা দেবী। প্রতাপ কঠিনচেতা বীর হইয়াও রূপসীকে, যে কার সেই হউক, বিবাহ করিয়া (সাধারণ চক্ষুতে) সংসার পাতাইল। আয়েষা কোনদিনই বিবাহের কল্পনা পর্য্যন্ত মনে স্থান দিল না। একদিকে,—জগৎসিংহের স্মৃতি আয়েষার জীবনের বন্ধনা। সেই স্মৃতিই তাহার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা এখন প্রলোভনের বস্তু। অন্যদিকে, শৈবলিনী প্রতাপের গুরুপত্নী; কাজেই সে স্মৃতি তাহার জীবনের বিষম বেদনা। সে স্মৃতি বিষের মত সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত, রক্তের অণু পরমাণুতে সঞ্চারিত; অথচ সেই স্মৃতিতে তার অধিকার নাই। সে স্মৃতি মহাপাপ। দুইজনে দুই দিকে বড়।

রিপুজয়ে, প্রলোভন জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে আমরাও বলি, সে স্বর্গ আয়েষা তোমার। আয়েষা, তোমার এই নিঃস্বার্থ প্রেমের পুরস্কার পরলোকে পাইবে। ইহ-লোকে যতদিন বঙ্গসাহিত্যের জীবন, ততদিন তোমার যশ জনে জনে কীর্ত্তন করিবে। আশীর্ব্বাদ কর দেবি, যেন ভারতের নরনারী তোমার মত সংযম ও স্বার্থত্যাগ শিক্ষা করিয়া ধন্য হইতে পারে।

(সাহিত্যসভায় পঠিত)

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

স্বর্গীয় রামকানাই দত্ত।

শ্রদ্ধাভাজন ৺রামকানাই দত্ত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য অদ্য আমরা এইস্থানে সমবেত হইয়াছি। কি ভাবে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করা যায়, তাহা বিবেচনা করার পূর্ব্বে ও করার জন্য তাঁহার জীবনের ধারা কোন প্রণালীতে প্রবাহিত হইয়াছিল, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক হইবে। রাম কানাইবাবু ১২৫৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে জন্ম গ্রহণ করেন ও শৈশবে পিতৃহারা হন। তাঁহার মাতৃদেবী জীবনী-শক্তির একটী সূক্ষ্মসূত্র অবলম্বন করিয়া অদ্যাপি মরজগতে রহিয়াছেন। মাতার প্রতি রামকানাই বাবুর অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। মায়ের সামান্য সামান্য আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তিনি সর্ব্বদা উগ্রীব থাকিতেন এবং তৎসম্বন্ধে বিত্তশাঠ্য করাত দূরের কথা, বরং সময়ে সময়ে নিজ আয়ের অতিরিক্ত খরচ করিতেন। রামকানাই বাবুর একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল যে জীবলীলা সাঙ্গ করার পূর্ব্বে তাঁহার মাতৃদেবীর ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াদি সম্পাদন করিয়া যান, কিন্তু ভগবান তাঁহার সেই সাধ পূর্ণ করেন নাই।

রামকানাই বাবু প্রণীত "আনন্দগীতা" তাঁহার কৃতজ্ঞ-চিত্ততার অন্যতর নিদর্শন। উক্ত গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি শ্রীমদাচার্য্য আনন্দ স্বামী মহাশয়কে তাঁহার প্রতিপালক ও শিক্ষাদাতাগুরু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রামকানাই বাবু বর্ত্তমান যুগের ইউনিভার্সিটি-প্রদত্ত উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, কিম্বা তিনি স্কুলে কি অন্যত্র রীতিমত সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন পাঠ করারও সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। অথচ হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি

যে মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিয়াছেন,তাহা বর্ত্তমান যুগের অতি উচ্চ শিক্ষিত ও উদার-মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের মীমাংসার অনুরূপ দেখিয়া সময় সময় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আনন্দগীতা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, আচার্য্য উর্ব্বর ক্ষেত্রেই শস্যবপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কৃপাতেই রামকানাই বাবু দুর্বোধ্য ধর্ম্মতত্ত্বগুলি অতি সহজে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঋণ-শোধ।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ একসময়ে এই পৃথিবীকে ঋণশোধের স্থান মনে করিতেন এবং আমাদের জীবন গ্রহণ ও জীবন-ধারণজনিত ঋণকে তিন ভাগে বিভাগ করিয়া গিয়াছেন, দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ।

ঋণং দেবস্য যাগেন ঋষীণাং পাঠ কর্ম্মনা
সন্তত্যা পিতৃঋণঞ্চ শোধয়িত্বা পবিব্রজেৎ।

দেবঋণ জিনিষটা কি, বুঝা আজকাল একটু কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। দেব শব্দের ভাবার্থের সঙ্গে যোগ করিয়া দেবঋণের অর্থ এইরূপ দাঁড়ায়—যে সকল শক্তি প্রকৃতির অন্তরালে থাকিয়া জগতে ক্রীড়া করিতেছে, তাহাদের নিকট আমাদের ঋণ। আমাদের দেশের মত কৃষিজীবির দেশে বৃষ্টি এক অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ। বৃষ্টির অভাব হইলে শস্য জন্মেনা, অত্যধিক হইলে শস্য নষ্ট হয়, সমতা থাকিলে প্রচুর শস্য জন্মে। যে শক্তি প্রকৃতির অন্তরালে থাকিয়া এই বৃষ্টির ক্ষমতা সাধন কি অক্ষমতা উৎপাদন করিতেছে, তাহার সন্তোষ বিধান করা আমাদের কর্ত্তব্য এবং এই কর্ত্তব্য বোধে বৃষ্টির সমতা সাধনার্থ যজ্ঞদ্বারা তৎপ্রতিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করা হইত। কালক্রমে যাগ যজ্ঞে মানুষের বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িল এবং হিন্দুজাতীয় জীবনে এমন সময় আসিল, যখন তাঁহারা মনে করিলেন যে, সকল দেব-শক্তির এক মূল আধার এবং আধারভূত সেই মূলকে তৃপ্ত করার জন্য যাগযজ্ঞের কোনও আবশ্যকতা নাই, ক্রিয়াবহুল যাগযজ্ঞ বিনাই তাঁহার তৃপ্তি সাধিত হইতে পারে। বর্ত্তমান যুগে দেবঋণের বোঝা অনেকটা লাঘব হইয়াছে, কিন্তু তৎস্থলে আমরা অন্য আর একটা ঋণ মানিয়া নিতেছি। তাহা দেশ-ঋণ। শ্রীমদ্ আনন্দস্বামীর বচন উদ্ধৃত করিয়া রামকানাই বাবু বলিতেছেন :—

"পিতৃঋণ, মাতৃঋণ, ঋষিঋণ যত,
করিলে আগেতে শোধ হইবে উন্নত।
তার পর দেশঋণ করি পরিশোধ,
হইলে অঋণী তুমি পাইবে প্রবোধ।
এসেছ বিশ্বেতে কাজ করিতে সাধন,
অবিরত সেবাব্রত কর দিয়া মন।"

উদ্ধৃতস্থলে যদিও পিতৃঋণের সঙ্গে মাতৃঋণ যোগ করা হইয়াছে, এই দুই শব্দের ব্যবহার দ্বারা হিন্দুশাস্ত্রকারদের পিতৃঋণ শব্দে যাহা বুঝাইত,তদধিক কিছু বুঝাইতেছে না। পিতৃঋণ শোধ করিতে হইলে পিতা, মাতা ও পিতৃমাতৃ স্থানীয়দের সেবা ও প্রতিপালন করিতে হয়। সন্তান উৎপাদন ও তাহাদের লালন পালন ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হয়। সর্ব্বশেষে সন্তানগণকে এইরূপ শিক্ষা দিয়া যাইতে হয় যেন জীবনের যে আদর্শ আমরা পিতৃপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহারা ঐ আদর্শ মলিন না করিয়া বা তাহা উজ্জ্বলতর করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইতে পারে। রামকানাই বাবুর মাতৃভক্তির বিষয় আপনাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সন্তানবাৎসল্য সহজসাধ্য, কিন্তু মাতৃ-ভক্তি তেমন সহজসাধ্য নহে। রামকানাই বাবুর মত মাতৃভক্ত সন্তান যে নিজে সন্তান-

বৎসল হইবেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি নিজ সন্তানগণের ও জামাতাদের শিক্ষা ও দীক্ষার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় ও নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। যদি তাঁহার সন্তানগণ তাঁহার প্রদর্শিত পন্থানুসরণ করিয়া চলিতে না পারে, তবে তাহা রামকানাই বাবুর দুর্ভাগ্যের ফল মনে করিব, তাহা তাঁহার নিজ ত্রুটি কি কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখতার ফল নহে।

দেশ-ঋণ।

আমরা যে ত্রিবিধ ঋণের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তন্মধ্যে এক প্রকার ঋণ পরিশোধ করিয়া উঠাই, অনেকের ভাগ্যে ঘটে না। পিতৃঋণ শোধের ব্যাপার বরং অনেকটা সহজ, দেশঋণ শোধ করার চেষ্টা তত সহজ নহে। অনেককে দেখিয়াছি, নিজ আত্মীয় স্বজনগণের সঙ্গে যখন ব্যবহার করেন, তখন বেশ মানুষ, কিন্তু একটু বাহিরের মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইলেই অন্যরূপ হইয়া উঠেন। অবশ্য আমি স্বীকার করি যে, অনেক সময় কার্য্যক্ষেত্রে বাহিরের লোকের সঙ্গে ব্যবহারে এমন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় যে তখন সাধারণ মানুষের পক্ষে আত্মসংযম করা কঠিন হইয়া উঠে। এইরূপ সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেও যিনি অবিচলিত থাকিতে পারেন, যিনি মানুষের কৃত অন্যায়ব্যবহারকে তাহাদের অজ্ঞতার ফল মনে করিয়া তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দে ক্ষমা করিতে পারেন, তিনিই দেশ সেবা করার যোগ্য ব্যক্তি। এই ভাবের দ্বারা চালিত হইতেন বলিয়াই রামকানাইবাবুর প্রকৃতি অতি মিষ্ট। তাঁহাকে কাহারও প্রতি রুক্ষ ভাষা ব্যবহার করিতে দেখা যায় নাই। রামকানাই বাবুর দেশসেবা ব্রতের প্রথম ফল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এড্‌ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশন-স্থাপন। উচ্চশিক্ষার পথ সুগম ও প্রশস্ত করার জন্য তিনি যখন মনে করিলেন যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে দ্বিতীয় একটী উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া আবশ্যক, তিনি তৎক্ষণাৎ এখানকার কয়েকটী বন্ধুর সাহায্য লইয়া এই বিদ্যালয়টী স্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে তখন দুইটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় চলিবে কিনা, এই বিষয়ে ঘোর মতদ্বৈধ ছিল এবং এড্‌ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশন স্থাপন সময়ে ও তাহার কিছুকাল পরে উক্ত বিদ্যালয় পরিচালনা সম্বন্ধে বহুবিধ বাধা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। রামকানাইবাবু নির্ভীকতার সহিত ঐ সকল বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন ও পশ্চাৎ জয়যুক্ত হইয়াছেন।

রামকানাই বাবু নিজ জাতিকে অতি উচ্চ আসনে সমাসীন দেখিতে ইচ্ছা করিতেন এবং জাতীয় অধঃপতনের জন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'সন্তান" নামক গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন "যে ভারত, বেদ দর্শন প্রভৃতি অধ্যাত্মতত্ত্বের ভুরি২ গ্রন্থ রচনা করিতে সমর্থ ছিল, সেই ভারত আজ পরকীয় তত্ত্বে তত্ত্ববান, পরকীয় জ্ঞানে জ্ঞানবান, চর্ব্বিত চর্ব্বণ ব্যতীত (ভাব) প্রকাশে অসমর্থ। ইহা অপেক্ষা দুর্গতি ও অবনতি আর কি হইতে পারে, জানি না। নিষ্ঠাবান, ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীর চরণ-রেণু গ্রহণ করিয়া বিনীত ভাবে বলিতেছি, এখনো গতি ফিরিলে কল্যাণের আশা আছে। গতি ফিরাইবেন কি?"

রামকানাইবাবু জানিতেন যে, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোন জাতি কখনও উন্নত হয় নাই ও হইতে পারে না, তাই সত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং তিনি নিজ দেশবাসীকে সত্যনিষ্ঠ হইতে অনুরোধ করিয়াছেন ও তাহাদের সমক্ষে আগ্রহসহকারে মহাত্মা বুদ্ধদেবের শেষ কয়টী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ধরিয়া দিয়াছেন "যাহার জন্ম

হয়, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সত্যই মৃত্যুকে জয় করিয়া নিত্যকাল বিদ্যমান থাকে, তোমরা যত্ন পূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম পালন করিবে।” এই সত্যনিষ্ঠার ফলেই তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, হিন্দুজাতীয় জীবন সংগঠনে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব যৎসামান্য নহে। তাই তিনি বুদ্ধদেবের জীবনীর সমালোচনা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন, “যে ধর্ম্মের আশ্রয়ে ভারতবর্ষ একদিন উন্নতির চূড়ায় আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যে ধর্ম্মের প্রভাবে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, ধনে মানে, ক্ষমতায় সমুন্নত হইয়া, ভারতমাতা একদিন জগতের পূজ্যা হইতে পারিয়াছিলেন, মাতৃভূমিকে যাঁহারা ভালবাসেন, মাতৃভূমির যাঁহারা হিতকামনা করেন এবং মাতৃভূমিকে যাঁহারা পুনরায় উন্নতির শিখর দেশে দেখিতে বাসনা করেন, তাঁহারা অবশ্য বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনাপরায়ণ হইবেন।” জাতীয় জীবনের উন্নতিসাধনের জন্য রামকানাই বাবু কেবল আমাদিগকে আমাদের নিজ জাতীয় মহাপুরুষগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই বিরত হইতে বলেন নাই, তিনি সকল দেশের সকল সাধুমহাপুরুষগণের শরণাপন্ন হইতে এবং প্রত্যেকের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতেই অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি মহাত্মা খ্রীষ্টের জীবনের আদর্শ দেশবাসীর সমক্ষে ধরিয়াছেন এবং খৃষ্টীয় জাতির উন্নতির মূল কারণ সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের বচনাবলি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, “তাঁহার (খ্রীষ্টের) যোগ ক্রিয়াশীল ও পরহিতকর ছিল। ইহা কেবল ধ্যান ও নির্ব্বাণ-যোগ ছিলনা। এ যোগ ঈশ্বর ও মানব, উভয়ের সহিতই যুক্ত ছিল।” অন্যত্র বলিতেছেন—“তাই খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ইউরোপে যুগান্তর ঘটাইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্মই ইউরোপের উন্নতির কারণ। সেই উন্নতির বশেই আজ ইউরোপে নরবলির প্রথা শিশুবধ, নিষ্ঠুরতা, পোপের স্বর্গে গমনেচ্ছু টিকিটদান প্রভৃতি প্রাচীন প্রথা রহিত হইয়াছে, ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত হইয়াছে, দরিদ্রের সাহায্য ও শিক্ষাদান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি ও নীতি জ্ঞানের বিস্তৃতি হইয়াছে। তাই যীশু জগৎগুরু।”

ঋষি-ঋণ।

পাঠকার্য্যদ্বারা ঋষিঋণ শোধ করাই হিন্দুশাস্ত্রকারদের অভিমত। পাঠকার্য্যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, উভয় বিভাগকেই বুঝিতে হইবে। অধ্যয়ন করিয়া ঋষিদের প্রচারিত সত্য জানিতে হইবে ও তাহা অন্যকে শিখাইতে হইবে। যেখানে যে সত্য সংগ্রহ করা সম্ভব, তাহা করিয়া রামকানাই বাবু ঐ সকল গ্রহণ জন্য দেশবাসীদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে রামকানাইবাবু অতি উদার সার্ব্বভৌমিক মত গ্রহণ করিয়াছিলেন ও পোষণ করিতেন। তিনি জৈন ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক ঋষভদেবের জীবনী সমালোচনায় বলিতেছেন—“জৈনধর্ম্ম বহুপুরাতন উদার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। এই উদার পরম পবিত্র ধর্ম্ম-বিটপির ছায়াতে উপবেশন করিলে প্রাণ শীতল হয়, হৃদয় স্বর্গীয় আনন্দরসে প্লাবিত হয়, সর্ব্বপ্রকার আধিব্যাধি দূরে প্রস্থান করে। আনন্দগীতায় বলিতেছেন :—

“সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় আছে যেইখানে।
প্রকৃত ধর্ম্মের তত্ত্ব পাবে সেইখানে॥
সর্ব্বতত্ত্ব লাভ করি যেই মহাজন।
দেয় ধর্ম্ম নীতি শিক্ষা—তিনি প্রিয়জন॥
ধর্ম্মালোক পেয়ে লোক কৃপাতে তাঁহার।
সাধন-সোপানে উঠে নাশি অন্ধকার॥”

ধর্ম্মলাভের জন্য সংসারত্যাগী যোগী হইতে হইবে, রামকানাই বাবু ঐ মত পরিহার

করিয়া গৃহী হইয়াই ধর্ম্মলাভ করার চেষ্টা করা উচিত,এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আনন্দ-গীতায় দেহ ও আত্মার একত্ব স্বীকার করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"দেহ আত্মা ব্রহ্মভূত একবস্তু চমৎকার।
দেখেনা পৃথক তাহা সিদ্ধঋষি যোগাচার॥
সামঞ্জস্য রক্ষা করি ব্রহ্মের বিধান ধরি,
করিতেছে বিশ্বকার্য্য দেহ আত্মা অনিবার।
ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন দেহ আত্মা নহে ভিন্ন
করিতেছ শান্তিযোগে একত্রে নিত্য
বিহার।"

ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"ইন্দ্রিয়ে গঠিত কায়া ইন্দ্রিয় ভাণ্ডার,
থাকেনা ইন্দ্রিয় বিনা অস্তিত্ব তাহার।
জলের অভাবে যথা বাঁচেনাকো মীন,
বায়ুর অভাবে যথা ভুজঙ্গম ক্ষীণ।
সেরূপ ইন্দ্রিয় বিনা বাঁচেনা মানব,
থাকেনা ভুবন মাঝে কিছুই গৌরব।
ইন্দ্রিয় সেবাতে মিলে অতীন্দ্রিয় যোগ,
বিশ্বাসী মানব করে প্রেমানন্দ ভোগ।
ইন্দ্রিয় বিনাশ ক্রিয়া বটে বিপরীত,
ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় জানিও নিশ্চিত।"

কর্ম্মদ্বারাই ধর্ম্মলাভ করা যায়, রামকানাই বাবু এইমত পোষণ করিতেন। কর্ম্ম সম্বন্ধে আনন্দগীতায় তাঁহার উপদেশ এই :—

"কর্ম্ম কর উচ্চ নীচ না করিয়া জ্ঞান,
লিখনী লাঙ্গল বটে একই সমান।
কর্ম্ম কর গলগ্রহ থেকোনা কাহারো,
পরপ্রত্যাশায় শিরে ঝাটা ছটা মারো।
কর্ম্ম কর কর্ম্ম কর কর্ম্মীর সন্তান,
আকাশে পেতোনা ঘর হইবে কল্যাণ।
বুনিবে যেমন বীজ ফলিবে তেমন,
কর কর্ম্ম হবে ধর্ম্ম—পাইবে রতন।
ভিক্ষাবৃত্তি শিক্ষা করি হইলে পতন,
রবে না উত্থানশক্তি হারাবে জীবন।
কর্ম্ম কর লক্ষ্যস্থির করিয়া ত্বরায়
হইবে উন্নত তুমি অবশ্য ধরায়।
হও যদি ক্রীতদাস, অলস, বিলাসী,
করিবে তোমাকে গ্রাস দরিদ্রতা আসি।"

অন্যকে যেমন উপদেশ দিয়াছেন, নিজ জীবনেও তদ্রূপ কর্ম্মের সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে পরিমাণ কাজ জীবনে করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিলে এত কাজ করার অবসর কর্ম্মীপুরুষগণ কোথায় প্রাপ্ত হন, ঐ চিরন্তন প্রশ্নই মনে উদিত হয়। ঐ প্রশ্নের উত্তরও রামকানাই বাবু তাঁহার আনন্দগীতায় দিয়া গিয়াছেন। তাহা এই :—

"ভেবো না অন্য ভাবনা পরমেশ্বর বই,
চাইও না অন্য দিকে নীচে মাটী বই।
ভরিওনা পেট কভু না হলে ক্ষুধিত,
বিলাইতে হরি নাম হও না কুণ্ঠিত।
বলিওনা মিথ্যা কথা রাখিও নিয়ম,
করিও সর্ব্বদা যত্নে ইন্দ্রিয়-সংযম।
আলস্য করিও ত্যাগ, রাখিও শরীর,
ভাল হয়ে ভাল কর সাজি ধর্ম্মবীর।
পরচর্চ্চা বিষসম করিয়া বর্জ্জন,
করিবে নিখিল জীবে প্রেম বিতরণ।"

স্মৃতি-রক্ষা।

আমরা রামকানাইবাবুর জীবনের যে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিলাম, তাহা হইতে আপনারা দেখিবেন যে, রামকানাই বাবুর শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। নিজে বহুপরিশ্রমে জ্ঞানলাভ করিয়া ঐ জ্ঞান সাধারণ্যে বিতরণ করিয়াই তিনি আনন্দভোগ করিতেন। আপনারা যদি তাঁহার স্মৃতিরক্ষার কোনও ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাদের সেই ব্যবস্থা শিক্ষার বিস্তার-কল্পে বিনিয়োগ করাই সঙ্গত হইবে।

শ্রীরমণীমোহন দত্ত।

শিশু।

কত সুকোমল-কোরক-কমনীয়-
হাস্য-স্ফুরিত অধর ;—
কত সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে তাহে, নিরমল-
তনু-ভাস্বর।
কত প্রীতিগাথা, কত গীতি পূর্ণ,
সুরভি-স্নাত মলয়ে,—
ঐ সূক্ষ্ম রশ্মি ফুটে উঠে মৃদু আঁধার
সংসার-নিলয়ে।
ফুল্ল প্রসূন-কচি-পর্ণ-পূট, সিঞ্চিত-
মধু-চন্দ্রিমা ;
ফুল্লার-বিন্দ গোলাপী-আননে, প্রকাশিছে
কিবা মহিমা!
মাতৃস্তন্যে তাই, ক্ষীর সুধা-ধারা স্নেহে
নিষিক্ত করি,—
ওহে কৃপাসিন্ধো! করুণাভাণ্ডার
দিয়াছ হৃদয়ে পূরি।
মেদুর-রুচির কনক মঞ্জির, যেন
কত মনলোভা ;—
নাচিয়া নাচায়ে, হাসিয়া হাসায়ে
ফুটায়েছ হাস্যপ্রভা।
সুষমা দিয়াছে অঙ্গ আভরণ
কোকিল দিয়াছে কাকলী ;—
গোলাপ দিয়াছে পাপড়ি খসায়ে,
প্রসূন দিয়াছে অঞ্জলি ;—
তপন দিয়াছে নব উষারাগ
চাঁদ দেছে স্নিগ্ধ জ্যোতি ;—
অম্বর দিয়াছে নীল নয়নে,
মিটি মিটি তারা দুটী ;—
স্বপন দিয়াছে সুকোমল ক্রোড়,
নিদ্রা দিয়াছে শান্তি ;—
ধরণী দিয়াছে শ্যাম শষ্প শোভা,
প্রকৃতিভাণ্ডার লুটি।
মলয় মৃদুল পরশি গায়,
শ্রান্তি স্বেদধারা মুছায়ে দেয় ;—
ভ্রমর মোহন মধুর গুঞ্জনে,
কাণে কাণে কয় কথা ;—
কোমল বাঁশরী বিনায়ে বিনায়ে
নিঙ্গারিয়া স্বর-সুধা,—
সে অস্ফুটন্ত আধ আধস্বরে,
মিশায় ললিত গাথা।
ক্রোড়ে দিয়ে তুমি সে চান্দ বয়ান,
বেন্ধে দিয়ে স্নেহ ডোরে,—
ওহে দয়াময়! মানবে বেন্ধেছ,
কঠিন মোহ নিগড়ে॥

শ্রীআনন্দচন্দ্র দত্ত।

পরলোকগত মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব।

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে পরলোকগত মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার পুস্তকখানির নাম দিয়াছেন "নরদেব শিবচন্দ্র দেবের ও তৎসহধর্ম্মিণীর জীবনালেখ্য।" পুস্তকের নামে "নরদেব" কথা না লেখা থাকিলেও জীবনালেখ্য খানি পাঠ করিয়া, তিনি যে নরশ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সদাশয় কুসংস্কারবিহীন অজাতশত্রু ও দয়ালু শিবচন্দ্র দেব দেশের মঙ্গলের জন্য যে কত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনী পাঠ করিলে জানা যায়। তিনি স্বয়ং নেতা হইয়া

কেবলমাত্র মতের অনুরোধে কেশবচন্দ্র সেনের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবস্থৃত নূতন দল বাঁধিয়া নিজ উদার মতের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিনয়ী, ধীর ও শান্তস্বভাব লোক অতি অল্পই দেখা যায়।

বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কোনও প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, হিন্দু কলেজের প্রথম শিক্ষিত যুবকদলের মধ্যে দুইটী মানুষ আবাল্য ভাল মানুষ, প্যারীচাঁদ মিত্র ও তাঁহার দীর্ঘজীবন-ব্যাপী অকৃত্রিম সুহৃদ্ ও পরবর্ত্তীকালে বৈবাহিক স্বর্গীয় শিবচন্দ্রদেব। নব্যশিক্ষার ফলে যে যুবকদল উন্মার্গগামী হইয়া সে সময়ের সমাজ ও প্রবীণগণকে বিব্রত ও বিপন্ন করিয়াছিলেন, প্যারীচাঁদ ও শিবচন্দ্র সেই সুহৃদমণ্ডলী-ভুক্ত হইয়াও কালা পাহাড়ের মূর্ত্তি ধারণ করেন নাই। ইহারা শান্ত প্রকৃতি ও স্থিরবুদ্ধি-বিশিষ্ট ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উভয়েই উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী ব্রাহ্মজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। কবি কালিদাস লিখিয়াছিলেন, "মণৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যে বাস্তি মে গতিঃ।" আমরা রঘুবংশের এই শ্লোকার্দ্ধ স্মরণ করিয়া শিবচন্দ্র দেব মহাশয় সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব।

প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় তাঁহার "Education in Bengal" প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,সে সময়ে ইংরাজি শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্য যুবকেরা দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়া পল্লীস্থ দরিদ্র বালকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। এইরূপ একটী বিদ্যালয় মিত্র মহাশয়ের ভবনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিদ্যালয়ে শিবচন্দ্র দেব, রাধানাথ সিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, কালাচাঁদ শেট ও রাজকৃষ্ণ মিত্র শিক্ষকতা করিতেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারা কেহই কোনও পারিশ্রমিক না লইয়া অবৈতনিকভাবে কার্য্য করিতেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বঙ্গসমাজের কুসংস্কার দূরীভূত করিবার অভিপ্রায়ে "সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ্ (Association of friends for the promotion of social improvement) সমিতি স্থাপনা করিয়াছিলেন। এই সভার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি ও স্বয়ং কিশোরীচাঁদ ও অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদক ছিলেন। শিবচন্দ্রদেব মহাশয় এই সভার ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিশোরীচাঁদের ডায়েরী পাঠ করিয়া আমরা অবগত হই যে, প্রথম বিধবা-বিবাহে দেব মহাশয় কিশোরীচাঁদের সহিত উপস্থিত ছিলেন। মৌলিক ও গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রচার করা সভার আর একটী অনুষ্ঠান ছিল। এতদর্থে এক সব-কমিটি নিয়োজিত ছিল। দেব মহাশয় এই কমিটির সদস্য ছিলেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৬ এপ্রিল তারিখে কলিকাতার টাউনহলে এক বিরাট সভা আহূত হয়। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর ফৌজদারী বিচারালয়ের মোকর্দ্দমা কেবল সুপ্রীম কোর্টেই হইত, মফঃস্বল ফৌজদারী বিচারালয়ে এই সমুদায় বিচার হইতে পারে কিনা, এতৎ সম্বন্ধে এই সভায় আলোচনা হয়। হিন্দু-পেট্রিয়টে প্রকাশিত ৯ই এপ্রিল তারিখে এই সভার বিবরণীতে আমরা শিবচন্দ্র দেবের নাম দেখিতে পাই। তিনি একটী প্রস্তাবের পোষকতা করেন। বোধ হয়, এই সভাতে তাঁহার যোগ ছিল বলিয়া পুস্তকে লিখিত ৮০ পৃষ্ঠার ঘটনাটী

ঘটিয়াছিল। এতৎবিষয়ে হিন্দুপেট্রিয়ট কাগজে ১৮৫৭ খ্রীঃ জুন মাসের ৪ তারিখে বর্ণিত আছে।

শিশুপালন পুস্তক সম্বন্ধে বর্ণাকুলার লিটরেচার সোসাইটি কমিটী ২৮ আগষ্ট ১৮৫৬ খ্রীঃ অধিবেশনে রেভেরেণ্ড জে লং বলিয়াছিলেন যে, ডাক্তার জে আর বেডফোর্ড সাহেব স্বয়ং শিবচন্দ্র দেবের জে কুম্ব সাহেবের প্রণীত Treatise of infancy পুস্তকের অনুবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন, এবং তিনি স্বয়ং অনুবাদের ভাষা ও পুস্তকের তত্ত্বগুলি পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছেন। (হরকরা ১ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৬)। গ্রন্থকার শিশুপালন পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগের সমালোচনা হিন্দুপেট্রিয়ট হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রথমভাগের সমালোচনা ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ তারিখের পেট্রিয়টে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাও উল্লেখ-যোগ্য।

বিখ্যাত অধ্যাত্মবিদ ডাক্তার জে, এম, পিবলস (Doctor G. M. Peebles) ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় তিনি কেশবচন্দ্র সেন, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত সহোদয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার Around the world পুস্তকে Oriental spiritualist শির্ষক প্রবন্ধে তিনি শিবচন্দ্রদেবের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"Shib Chandra Deb, another devoted spiritualist introduced by Peary Chand Mitra, presented us a neat volume that he had receutly published upon spiritualism. It contains liberal extracts from American authors; in fact the works of Davis, Tuttle, Sargent, Denton, Edmonds and others are well known in India. This gentleman had also translated a large porti n of my book "Seers of the ages" into the Bengali language and they are now being circulated as tracts in India. Expressing regret that I had not a copy of the "Seers" to tender him in turn for his valuable volume, smiling he said, "I have read the Seers of the Ages and others of your latter works, quite a number of which have reached our country from Mr. Burn's Publishing House in London."

(5th Edition, Page 234).

"আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার দীর্ঘজীবন-ব্যাপী অকৃত্রিম সুহৃদ্ ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ নবেম্বর তারিখে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইলে দেব মহাশয় তাঁহার পৌত্র ও নিজ দৌহিত্র প্রকাশচন্দ্রকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন :—

Konnagore,
26th November 1883.

My dear Prokas,

I feet great sorrow for the death of your venerable grandfather. In him I have lost a most kind and valuable friend. I will ever remember the various kind offices which he did me during his long and useful career. Convey to your father and the rest of the dear family my sincere condolence. Considering the long suffering which my friend had to undergo during his protracted illness, I think we should be thankful to the merciful Father for relieving him

from all the troubles incidental to earthly life. May God grant peace to his spirit and consolation to his bereaved family. Believe me.

Yours very affectionately,
Shib Chandra Deb.

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ জানুয়ারি তারিখে ডাক্তার প্রকাশচন্দ্রের পরলোকগতে বিজয়লাল দত্ত কর্ত্তৃক শোকগাথা ১৩১৯ চৈত্রসংখ্যা নব্যভারতে প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য সময় সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পুস্তক প্রণেতাদিগকে পারিতোষিক দিতেন। পুস্তক নির্ব্বাচন ভার এক সমিতির হস্তে অর্পণ করা হইত। শিবচন্দ্রদেব মহাশয় ঐসকল সমিতির সভ্য প্রায়ই হইবেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ইণ্ডিয়ান মিরর সংবাদপত্রে আমরা এইরূপ এক কমিটিতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র ও শিবচন্দ্র দেবের নাম দেখিতে পাই।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসের ৫ই তারিখে দেশপূজ্য ভারতবিখ্যাতবাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবাস আদেশ হইয়াছিল। দেশের লোকেরা এই শোকে কাতর হইয়া সহানুভূতি দেখাইয়া ১৬ মে তারিখে বিডন ষ্ট্রীটে নেশান্যাল থিয়েটারে এক বিরাট সভা আহূত করিয়াছিলেন। ২১ মে তারিখের হিন্দু পেট্রিয়ট সংবাদ পত্রে আমরা অবগত যে, প্রথম প্রস্তাবটী রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পোষকতা ও শিবচন্দ্র দেব সমর্থন করেন।

প্যারীচাঁদ মিত্রের মৃত্যুর পর ২৮ জানুয়ারি ১৮৮৪ তারিখে এক শোকসভা আহূত হইয়াছিল। শিবচন্দ্র দেব মহাশয় ঐ সভায় একটী প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন।

শ্রীসুরেন্দ্রলাল মিত্র।

ভারতবাসীর উপনিবেশ।

(অমূল্যবিদ্যাভূষণের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর)।

বর্ত্তমানমাসের (ভাদ্রের) "ভারতীতে" "ভারতবাসীর উপনিবেশ" শীর্ষক আলোচনায় শ্রীযুক্ত অমূল্য বিদ্যাভূষণের আত্মম্ভরিতা দেখিয়া একান্ত বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের মত যে সে ব্যক্তিতো তাঁহার চক্ষেই লাগেনা ; তাঁহার নিকট Cyclopaedia of Ind a সঙ্কলয়িতা ও বিশ্বকোষকার নগণ্য ঐতিহাসিক এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Phayre ও বিজয়চন্দ্র-মজুমদার গল্পিকা সেবী। যাঁহার এখনও গুরুমহাশয়ের নিকট ইতিহাসের শিক্ষানবিশী চলিতেছে এবং যাঁহার ইতিহাস রচনা এখনও গুরুমহাশয়ের দ্বারা সংশোধিত হইতেছে তাঁহার পক্ষে এরূপ বড় বড় কথা না বলিলেই বোধ হয় ভাল হইত। তিনি যে কবে এবং কাহার দ্বারা ঐতিহাসিকের নবাবীপদে বরিত হইয়াছেন, তাহা জানিতে স্বতঃই কৌতূহল জন্মে। ঐতিহাসিক হঠাৎ নবাব মহাশয় আমার প্রতিবাদ তাঁহার পক্ষে নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু কতিপয় বন্ধুর অনুরোধেই মাত্র ইহার আলোচনা করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার প্রথমেই কর্ত্তব্য।

তিনি প্রথমেই নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হই-

লেও আমি কোথায় "কনিকানগরীকে স্বর্ণগ্রাম মনে করিয়াছি তাহা উল্লেখ করিয়া আমার ঐতিহাসিক গবেষণার উপর বিদ্রূপ-বর্ষণ করিয়া আমোদ ভোগ করিয়াছেন। আমার ঐতিহাসিক গবেষণা অদ্ভুত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার যে ঐতিহাসিকগবেষণায় কুষ্মাণ্ড জয়পালের রূপান্তর বলিয়া কল্পিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা উহা কখনই অধিক অদ্ভুত নহে। যিনি "ত্রিবেণী" পত্রিকায় ত্রিপুরা নামের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিতে যাইয়া স্বয়ং ত্রিপুরার পীঠস্থানে গমনও তথ্যাদি সংগ্রহ করা সত্ত্বেও, ত্রিপুরার পীঠেশ্বরীর কোনও উল্লেখ না করিয়াই, এসিয়াটিক সোসাইটী লাইব্রেরী ও ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী কেটলগের ঝুড়ি ঝুড়ি পুঁথির নামের দ্বারা অনাবশ্যকরূপে প্রবন্ধের কলেবর পূর্ণকরতঃ ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন, এবং যিনি তাঁহার এই অভূতপূর্ব্ব ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্যের জন্য 'ত্রিবেণী' সম্পাদকের নিকট হইতে হাতে হাতেই, বিনা বাক্যব্যয়ে যথেষ্ট নগদ দক্ষিণাপ্রাপ্ত হইলেও তাহা এত শীঘ্র হজম করিয়া ফেলিতে পারিয়াছেন, ঐতিহাসিক গবেষণার বড়াই তিনি না করিলে আর কে করিবে?

নওগাঁতে হস্তিনাপুর নামে স্থান থাকা সম্বন্ধে নওগাঁও ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের কথা উল্লেখ করিয়া বিদ্যাভূষণ বড়ই আস্ফালন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রথম প্রবন্ধে পাদটীকায় অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক বহুপ্রমাণের নির্দ্দেশ থাকিলেও এই প্রমাণটীর কোনও নির্দ্দেশ দেখাযায় না। তাহাতে ইহা যে পরবর্ত্তী আবিষ্কার তাহাই কি বুঝায় না? এবং কোনও নির্দ্দেশ না থাকাতেই যে, আমাদের প্রশ্নের কারণ হইয়াছে তাহাও কি বুঝায়না?

শিলালিপির প্রতিলিপির কথা লিখায় বিদ্যাভূষণ বড় গলা করিয়া তাঁহার প্রবন্ধে বরাত দেওয়া থাকিলেও প্রথম শিলালিপির বরাতটীরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় শিলালিপি সম্বন্ধে প্রবন্ধে কোনও কোনও বরাত না থাকিলেও তৎসম্বন্ধে কোন বক্তব্যই করেন নাই তাঁহার এইরূপ পাশ কাটানভাবের কথা হইতে মূল শিলালিপি দূরান্তাং, শিলালিপির উল্লেখও ইংরেজী অনুবাদব্যতীত প্রতিলিপি পর্য্যন্তও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে কিনা তদ্বিষয়ে আমাদের এখনও গভীর সন্দেহ রহিয়াছে। বর্ম্মায় হস্তিনাপুর রাজ্য স্থাপনের সম্বন্ধে বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাদের পাশ্চাত্য সাফাই বাতিল করিতে যাইয়া, বিশেষ আস্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সাফাই তিনি বাতিল করিতে পাইয়াছেন কি? একজনের পরিবর্ত্তে বরঞ্চ তিনি অন্যজনকে মানিয়াছেন। সাফাই সম্বন্ধে যাহাই হউক, হস্তিনাপুর স্থাপনের সময় তাঁহারই মতে খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ না ধরিয়া খৃষ্টাব্দ ধরিলেও, যে গোল থাকিয়া যায়। তাঁহার নিজেরই লিখিত বৃত্তান্তে হস্তিনাপুর রাজ্যধ্বংসের পর ভূকাম ও অরিমর্দ্দনপুর ধ্বংসের সময় খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ বিবেচিত হইয়াছে ও তাহার সমর্থক প্রমাণ Burmese inscription of the Pou A. D. Daung Pagoda 1774 উদ্ধৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী ভূকামও অরিমর্দ্দনপুর ধ্বংসের সময় কি করিয়া খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে পারে? ইহাই আমরা পূর্ব্বেও জিজ্ঞাসা

---

* এই প্রত্যুত্তরটী "ভারতীতে" প্রকাশার্থই প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু ভারতী কার্য্যাধ্যক্ষ প্রকাশ না করিয়া প্রতি প্রেরণ করায় "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইল। লেখক।

করিয়াছিলাম। কিন্তু বিদ্যাভূষণ ইহাতে কর্ণপাত করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠার সময় গঞ্জিকা সেবনের ফলেই যেন খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে পারে কিন্তু ভূকাম ও অরিমর্দ্দনপুর ধ্বংসের সময়তো শিলালিপির দ্বারাই প্রমাণিত 'প্রোমে' রা - ধানী পরিবর্ত্তনের কথাতো বিদ্যাভূষণের নিজেরই দ্বারা দৃঢ়তার সহিত প্রতিপাদিত। তবে কি এই খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত তা-াকু সেবনেরই ফল! অতঃপর এই কথা বলিলে বোধ হয় বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন যে তাঁহার গর্ব্বিত মস্ত ঐতিহাসিক বিদ্যা খরচ করিয়া দেখাইলেও হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠার সময় সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেও যে "তিমিরে" ছিলাম এখনও সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছি।

হস্তিনাপুর স্থাপনের সময় খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে অবধারণ গঞ্জিকাসেবনের ফল হইতে পারে; কিন্তু হস্তিনাপুরে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের সহিত চন্দ্রবংশীয় জ্রহ্যুসন্তানদিগের যোগসম্পাদন কেবল গঞ্জিকা সেবনে কুলায় না ইহাতে "কমলাকান্তেরই" ন্যায় অহিফেন সেবনেরই প্রয়োজন হয়।

গোপালের পুত্র জয়পাল, ইহা আমরা লিখিয়াছি বটে। জয়পালকে গোপালের বংশোদ্ভূত বলায় এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন সম্পর্কের নির্দ্দেশ না করায় অথচ ইহাঁদের মধ্যে অন্য কোনও রাজার নাম উল্লিখিত না হওয়ায় জয়পালকে গোপালের পুত্র বলিয়া মনে করা কতটা স্বাভাবিক হয় পাঠকবর্গই বিচার করিয়া দেখিবেন।

অব্দ সম্বন্ধে যে ধাঁধাঁর কথা আমি লিখিয়াছিলাম তাহার উত্তরে বিদ্যাভূষণ মহাশয় গুপ্তাব্দের ভুল "ভারতী" সম্পাদকের! ঘাড়ে ফেলিয়া দিয়া কোনমতে একদিক্ রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু অপরদিকে খৃষ্টাব্দের সম্পর্কে আমাদের ধাঁধাঁ যে এখনও পূর্ব্ববৎই রহিয়া গিয়াছে।

আমার আলোচনা ধীরভাবে পাঠ করিলে, পাঠকগণ অবশ্যই দেখিতে পাইবেন যে, বিদ্যাভূষণ আমার আলোচনার কেবল শাখা পল্লব লইয়াই নাড়া চাড়া করিয়াছেন, মূল বিষয়ের ধার দিয়াও যান নাই। অবান্তর বিষয় সকল লইয়া এইরূপে বাগ্‌জাল বিস্তার করায় তাঁহার কালি, কাগজ সময় ও শক্তির কোন অপব্যবহার হইয়াছে বলিয়া অবশ্যই তিনি মনে করেন না।

আমাদের মূল জিজ্ঞাস্যগুলির কোন উত্তর না দিয়া তাঁহার প্রকাশ্যমান ইতিহাসে এইগুলি বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার অমূল্য ঐতিহাসিক রত্নরাজি, যদি প্রকাশ করিতেই তিনি না চাহেন, তবে প্রবন্ধটী লিখিবারই তাঁহার কি উদ্দেশ্য ছিল? তাঁহার অপূর্ব্ব ইতিহাস যে প্রকাশ হইতেছে তাহা জাহির করিয়া সকলের তাক লাগাইয়া দেওয়াই বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রকাশ করিলে তাঁহার যত্নের মূল্য পাছে কমিয়া যায় এই ভয়েই তিনি এইগুলি এখন সিকায় তুলিয়া রাখাই সঙ্গত মনে করিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁহার প্রকাশ্যমান ইতিহাসের পূর্ব্বাভাসরূপ প্রবন্ধে যে হেঁয়ালী রচনার পূর্ব্বসূচনা দেখিতে পাইয়াছি তাহাতে তাঁহার প্রকাশ্যমান ইতিহাসে সে বৃহদাকার হেঁয়ালী বিরচিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে আমাদের আর বাকীনাই।

বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রবন্ধের

শেষে "এসম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। পরে আলোচিত হইবে।" এইরূপ লেখা থাকিলেও আমরা কেন তাঁহার নিকট "সমগ্র মহাভারতের ফর্দ্দ চাহিলাম তাহা তিনি রহস্য মনে করেন। তাঁহার প্রবন্ধ আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর দুই মাস গত হইয়াছে। ইহার মধ্যে তো তাঁহার অনেক কথার কোন কথাই বাহির হইল না। প্রতিবাদকরা সত্ত্বেও তো প্রত্যুত্তরে বহু কথা লিখিত হইলেও সেই সমস্ত "অনেক কথা" অপ্রকাশ্যই রহিয়া গেল। অথচ "এসম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলা আবশ্যক মনে করিনা" লিখিয়া তিনি একেবারে নিরস্তই হইয়া গেলেন। ইহাও কি রহস্য নহে?

মহাভারতের ফর্দ্দ চাহিয়াছি বলিয়া বিদ্যাভূষণ যেন বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি তো "মহাভারতই" লিখিতেছেন তবে মহাভারতের ফর্দ্দ চাহিলে দোষ কি? ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস লিখিবার জন্য 'ডষ্ট্র'ক্ট গেজেটিয়ার ঘাঁটিলেই চলিবেনা, ইহার জন্য মহাভারতে দেখিবারও প্রয়োজন হইবে।

গোপালের নাম রাজমালায় নাম থাকিলেও তাঁহার নামান্তর বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানেন বলিয়া আমাদিগকে ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহার ঐতিহাসিক পরম রহস্য সুতরাং ইহা তিনি ব্যক্ত করিবেন না। কারণ রূপান্তর ও নামান্তরের রহস্য দ্বারাই তিনি তাঁহার ইতিহাসের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতেছেন। এই রহস্য এত শীঘ্র প্রকাশ হইয়া পড়িয়া তাঁহার ইতিহাসের সাধের ইন্দ্রজাল ভেদ হইয়া গেলে, তাঁহার ইতিহাসের উপায় কি হইবে এবং নিজেরই বা উপায় কি হইবে?

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
আগরতলা ত্রিপুর,

সঙ্গণিকা।

২৭)

আমরা নিম্নলিখিত পত্রে ঋষিকল্প ভুবনমোহন কর মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাঁহার জীবনের কথা পরে বিবৃত করিব।

"শ্রদ্ধাস্পদেষু—

গভীর শোক-সন্তপ্তচিত্তে জানাইতেছি যে, ঋষিকল্প দেবচরিত্র, দুস্থ ও গরীবের মা-বাপ পণ্ডিত ভুবনমোহন কর মহাশয় গতকল্য (১৯শে ভাদ্র) অপরাহ্ন ২—৭ মিনিটের সময় মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে সমস্ত লোক হাহাকার করিতেছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও জজসাহেব সমস্ত আফিস আদালতের কার্য্য বন্ধ করিয়াছিলেন। ২০।২২ জন অস্ত্রধারী পুলিশ শবানুগমন করিয়াছিল। তাঁহার গৃহ হইতে শ্মশান ন্যূনাধিক ৪ হাজার লোক শবানুগমন করিয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, শূদ্র নির্ব্বিশেষে তাঁহার শব বহন করিয়াছিলেন। সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া শ্মশানাভিমুখে শবসহ শ্মশান বন্ধুগণ অগ্রসর হইলেন। রাস্তার দুইধারে সহরবাসীগণ বিষণ্ণচিত্তে সমবেত হইয়া শেষ-সম্মান প্রদর্শন করিলেন। কুলবধূগণ স্থানে স্থানে সমবেত হইয়া তাঁহাদের পবিত্র হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। এ শ্মশানযাত্রা নয়, শোভাযাত্রা হইয়াছিল। হরিনাম ও ব্রহ্মনাম লইতে লইতে শবানুগামীগণও ঘণ্টা-

কাল সহরে। বিভিন্নস্থান পর্যটন করতঃ শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। এই মহাপুরুষের তিরোধানে দিনাজপুরবাসীগণ গভীর শোকে আচ্ছন্ন আছে। আপনি ভাদ্র মাসের নব্যভারতে পণ্ডিত মহাশয় বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য এখানকার চিকিৎসকগণও পণ্ডিত মহাশয়ের সেবা করিয়া নিজেরা ধন্য হইয়াছেন। শুশ্রূষাকারী শুশ্রূষাকারিণীগণ কৃতার্থ হইয়াছেন, বহু সম্পন্ন গৃহস্থের বধূগণ পণ্ডিত মহাশয়ের শেষ পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের একটী প্রধানকীর্ত্তি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়। যাহাতে তাঁহার এইকীর্ত্তি রক্ষিত হয়, সে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নিবেদন ইতি—বিনীত নিবেদক—শ্রীকেদারনাথ সেন।

(২৮)

MRS. NAIDU'S ALLEGATIONS.

Mr. Montagu's Reply.

London, Aug. 28.

In connection with Sir W. Joynson Hicks' question in the House of Commons with regard to Mrs. Naidu's allegation of the stripping and flogging of Indian women, Mr. Montagu has sent a letter to Sir W. Joynson-Hicks stating that the Viceroy reports that the women mentioned are prostitutes of wandering criminal tribes. Safardahs and Pernas, who have settled at Amritsar for the purpose of prostitution. The charges made are absolutely false and have been made as a revenge against officers who gave evidence before the tribunals and participated in the recovery of property stolen from the National Bank by Mirasis and Porna." "Reuter".

আমরা উপরোক্ত মন্তব্য পাঠ করিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছি। আমরা যত দূর জানি, ভদ্রমহিলাদিগের প্রতিই অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল। ১৯শে ভাদ্রের বঙ্গবাসীতে পুনঃ তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। মানুষের কতদূর অধোগতি হইতে পারে উপরোক্ত মন্তব্য তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ছদ্মবেশী সুসভ্য জাতি এতদিনে ধরা পড়িয়াছেন। যদি বেশ্যাই হয়, তবু কি তাহারা বেত্রাঘাতের যোগ্য? তোমরা না এতদিন মহিলা-সম্মানের দাবী করিতে? প্রকাশ্য পত্রিকায় এরূপ মন্তব্য কিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ভাবিতেও পারিতেছি না। আমরা জানি, উপরোক্ত মন্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হইবে এবং ঐ মন্তব্য যে মিথ্যা, তাহাও প্রমাণিত হইবে। আমরা কেবল ভাবিতেছি, গর্ব্বিত জাতির এত দূর অধোগতি হইয়াছে! হায় রে হায়।

(২৯)

জাতীয় মহাসমিতির বিশেষ অধিবেশন।

পঞ্জাবের অত্যাচার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য কলিকাতায় এবার কংগ্রেসের একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। আয়োজন খুবই হইয়াছিল জনতাও খুব হইয়াছিল, তবে নরমপন্থীরা সকলে যোগ দেন নাই। দিবেন কেন, তাঁহারা যশমানের ফিকিরে ঘুরিতেছেন। ফিকিরে ঘুরিতেছেন অনেকেই। শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি, অনেক মাথায় চড়িয়া বসিয়াছে। সকল স্বধর্ম্ম সংরক্ষণের আটঘাট বাঁধিয়া সহযোগিতাবর্জ্জন প্রস্তাববাদীর নেতাদের প্রতিবাদ প্রস্তাব স্বত্বেও গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু কোন বিশেষ কাজ হইবে কিনা, গভীর সন্দেহের বিষয়। একা গান্ধী কি করিবেন?

তিনিও ত মাড়োয়ারীর মমতা ছাড়িতে পারিতেছেন না! দুই কুল রাখিয়া এ জগতে কেহই উন্নতি করিতে পারেন নাই, কেহই পারিবে না। এই বিশেষ অধিবেশনের এক বিশেষত্ব এই, এবার মাসিক পত্রিকার সম্পাদকদিগকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। শুনিয়াছি, স্থানের অভাবে এইরূপ কাজ হইয়াছে। ১৫০৬০ লোকের স্থান হইতে পারে, তদুপরি আর ৬০।৭০ জন লোকের স্থান হয় না!! উদ্ধত কম্প্লিমেণ্টারি টিকিটেরও তাঁহারা যোগ্য নহে? বোঝার উপর শাক আঁটি চলে না, ইহা আমাদের বুদ্ধিতে প্রবেশ করে না। তবে বণিকবৃত্তির কথা, লাভ লোকসানের কথা স্বতন্ত্র। লাভের জন্য কংগ্রেস হইলে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাঁহারা বলেন, বণিকবৃত্তি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নয়; তবে কেন এরূপ বিচার হইল? সুরেন্দ্রনাথ বৈকুণ্ঠনাথের আমলে ত এরূপ না। গত বারেও বৈকুণ্ঠনাথের আমলে আমরা টিকিট পাইয়াছিলাম, তবে এবার কেন এরূপ হইল? বালখিল্যদের উত্তাপ বড় বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া কি? কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে?

(৩০)

এ দেশকে জাগাইবে কে? তুমিও না, সেও না, কোন বালখিল্যও না, কোন চরিত্রহীন নবনেতাও নাই, এ শোকে জাগাইবে শুধু সাহিত্য ও ধর্ম্ম। জানিও, এ জগতের সকল উত্থান-সাহিত্য ও ধর্ম্মের অভিব্যক্তিতে। শরীরের রক্ত জল করিয়া, কঠোর তপস্যা করিয়া যাঁহারা দেশকে জাগাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারাই নিত্য উপেক্ষিত।

তাঁহাদের উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, মস্তক রাখিবার উপাদান নাই, জলবৃষ্টি নিবারণের গৃহ নাই, পায়ে পাদুকা নাই। আছে কি? আছে কেবল চক্ষের জল, হৃদয়ে কামনা-আগুন এবং সর্ব্বাঙ্গে দেশানুরাগের জলন্ত চিতা। সংসার দাহে জলিয়া পুড়িয়া তাঁহারা অঙ্গার হইয়া যাইতেছেন, কেহ সাহায্য করিবার নাই! অভাবের তাড়নায় অস্থির এবং অবসন্ন হইতেছেন, কোন সহানুভূতি নাই!! অত্যাচার, নিষ্পেষণ ও ভ্রূভঙ্গিতে নিষ্পেষিত হইয়া পড়িতেছেন, কোন সান্ত্বনা নাই! এ হেন ব্যক্তিগণের দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রতিনিয়ত আকাশে দেশের কল্যাণ কামনায় উত্থিত হইতেছে, কিন্তু সংসারে কেহ দেখিবার, শুনিবার, অনিবার সহানুভূতি প্রকাশ করিবার নাই। "ছিন্ন কন্থা বার মাস পথের কাঙ্গাল হরিদাস, অকিঞ্চন দীন।" কংগ্রেস নাকি জাতীয় যজ্ঞ, সেখানে সকলের ঠাঁই মিলিল, কিন্তু এই এক শ্রেণীর নিত্য-উপেক্ষিত লোকদিগের মিলিল না। বস্তুত, তোমার এত সাধের কংগ্রেসকে আমরা সকলে আদর করিব কি করিয়া?

তোমরা দল বাঁধিতেছ, দেশোদ্ধার করিবে, কিন্তু কই তোমাদের নিষ্ঠা, চরিত্র, স্বার্থত্যাগ? একটু স্বার্থত্যাগ করিলেই তোমরা দমিয়া যাও, একটু মানের হানি হইলেই চমকিয়া উঠ, একটু কিছু করিতে বলিলেই ভ্রূকুঞ্চিত কর, অথচ তোমরা দেশোদ্ধার করিবে? আগে চরিত্রে অটল হও, স্বার্থত্যাগে সিদ্ধ হও, পরোপকারে মুক্তহস্ত হও, তবে আসিও। নিজে কিছু যে না করিতে পারে, শুধু উচ্চ ভিক্ষাবৃত্তিদানে তাহার দ্বারা কিছু হয় নাই, কিছু হইবে না। ভিক্ষাবৃত্তিতে সে কিছুই করিতে পারিবে না? তোমাদের সহযোগিতা কে চায়? কেহ চায় না, তবুও তাহা বর্জ্জন করিতে ইতস্ততঃ কেন? শুধু মায়ামরীচিকায় ঘুরিয়া মরিতেছ, কূল-কিনারা কিছুই পাইলে না। কেন এত অহঙ্কার বল ত? হায়, দর্পহারী ভগবান আছেন তিনি অবহেলিত আমাদের কাতর প্রার্থনা শুনিয়া তোমাদের দর্প খর্ব্ব করিবেনই করিবেন। আমরা আর কখনও তোমাদের দ্বারস্থ হইব না।

(৩১)

আমরা এনিবেসাণ্টের লাঞ্ছনা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছি না। তোমরা লাল মুখ দেখিয়া প্রমত্ত হও, "গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লোটাও" তোমাদের হাবভাব দেখিলে আমাদের হাসি পায়। এবার মহাত্মা চক্রবর্ত্তী সাহসের সহিত বলিলেন, "তাঁহারা শুধু লুণ্ঠনের জন্যই আসিয়াছে" একথা শুনিয়াছ কি? এতদিন আমাদের কথা কাণে ধরে নাই, এবার ধরিবে কি? তাঁহারা সর্ব্বদাই জাতির

মর্য্যাদা, দলের দাবী রাখিতে তৎপর, এবার পঞ্জাবের বিচার-বিভ্রাট ও হোয়াইট-ওয়াস করার কথার মর্ম্ম বুঝিয়াছ কি? ডায়ারের জন্য নরনারী যেরূপ চাঁদা দিতেছে, তাহাতেও বুঝিতে পার নাই? বুঝিয়া থাক যদি, সংযত হইয়া নির্ব্বাক হইয়া যাও, লাল মুখের ত্রিসীমায়ও যাইও না। আর যদি তাহা না পার, আহ্বান করিয়া শেষে "সেম সেম" বলিয়া লাঞ্ছনা করিতে যাইও না। আহ্বানও করিবে, এবং অপমানও করিবে, ইহা অসহ্য। শুধু করতালি দিলে বা "সেম সেম" বলিলেই দেশোদ্ধার হয় না। চাই সংযম, চাই নিষ্ঠা, চাই ঐকান্তিকতা, চাই ধৈর্য্য চাই বীর্য্য, চাই মন্ত্রগুপ্তি, চাই স্বার্থত্যাগ, চাই কঠোর সাধনা। শুধু নাচানাচি বা মাতামাতিতে কি হইবে? ম্যাট্‌সিনি গ্যারিবল্ডি কি করিয়া গিয়াছেন, ঐ শোন, ঐ শোন।

(৩২)

সহযোগিতা বর্জ্জনের কোন আশা নাই, অনুষ্ঠানেই তাহা বুঝা যাইতেছে। উপাধি পরিত্যাগের কথা, তাহাও সর্ব্বত্র হইবে না। হইলেই বা কি? উপাধি বর্জ্জনে গভর্ণমেণ্টের কি ক্ষতিলাভ হইবে? গভর্ণমেণ্টের আদালত, স্কুল, কলেজ, লাটসভাও বন্ধ হইবে না, হইলে সকলের খরচ চলিবে কেন? ৭ দিন সব বন্ধ রাখিতে পারিলেই সব ঠিক হইয়া যায়, কিন্তু ৭ দিনের মায়া বিষম মায়া, কে এত স্বার্থত্যাগ করিবে? বাঙ্গালার সকল নেতারই এক বাণী, সুতরাং আশা নাই। একসাইস ডিপার্টমেণ্ট বন্ধ করাও সোজা কথা নয়, কেশবচন্দ্র, প্যারীচরণ পারেন নাই, তোমরা পারিবে কি? তোমরা নিজেরাও কি মদ্যপানের মমতা ছাড়িতে পারিয়াছ? বিশেষতঃ জনসাধারণের মধ্যে মদ্যপান যেরূপ বাড়িতেছে, স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া বন্ধ না করিলে বন্ধ হইবার নয়। গভর্ণমেণ্টের ঋণ বিভাগ বন্ধ করিবার প্রস্তাব ও কার্য্যকরী হইবে না, কেন না, কেশোরাম-পোদ্দারেরা থাকিতে গভর্ণমেণ্টের ভাবনা কি? দেখ না, মিউনিসাল বোর্ডের মামলা উঠিল, কিন্তু অনেকেই ঘুষ দিয়া রক্ষা পাইলেন! গভর্ণমেণ্ট এক শ্রেণীকে রক্ষা করিবেনই করিবেন। সৈন্যবিভাগ বন্ধ করিতে পারিলে সব মিটিয়া যায়, কিন্তু লাজপত-রায়দিগের সে ক্ষমতা নাই! সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন আশা নাই। বিদেশীয় দ্রব্যাদি বর্জ্জনের কথা? তাহা ত অসম্ভব ব্যাপার. এ দেশের শিল্পীকুল ধ্বংস হইয়াছে, কে সব যোগাইবে? আঙ্গুল কাটিয়া তাঁতিকুলকে যাঁহারা নষ্ট করিল, চাঁদা দিয়া চিনির কারখানা যাঁহারা নষ্ট করিল, তাঁহাদের মায়া ছাড়া সোজা নয়। তাঁহাদের বাণীতে মধুবর্ষণ, আচরণে সুধাকর্ষণ, হরি হরি, তাঁহাদের ছাড়া যায় কি? সুতরাং কোন আশা নাই। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়! "ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, মধ্য হইতে বাঙ্গালা নির্লজ্জতার অভিনয় করিলেন। এখনও তাঁহাদের ভিক্ষাবৃত্তিরও নেশা ঘুচিল না।

(৩৩)

পরলোকগত কুমার বসন্তকুমার।

রাজসাহী জেলার স্বর্গীয় রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের মধ্যম পুত্র কুমার বসন্তকুমার রায় তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কুমার বসন্তকুমার তাঁহার সহধর্ম্মিণীর অকাল মৃত্যুর দুঃসহ শোকে যৌবনারম্ভেই সংসার ধর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছিলেন। অতি শৈশবে পিতৃহীন হইয়া রাজকুমারেরা চারি ভ্রাতা কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে বাল্য এবং ছাত্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন ;—এই ছাত্রজীবনেই বসন্তকুমার বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি ও চরিত্রের যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় শ্রীমন্ত ঘরের আদরের দুলালগণের পক্ষে একান্ত অসম্ভব ও অসাধ্য না হইলেও, দুঃসাধ্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রবেশিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ এম এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত যতগুলি পরীক্ষা আছে, তাহার সকল গুলিতে তিনি কায়ক্লেশে কেবল মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা নহে, কোনও পরীক্ষাতে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানের নিম্নে আর তাঁহাকে যাইতে হয় নাই। বি-এ পরীক্ষায় সাহিত্য এবং দর্শনে 'ডবল অনার্স' লইয়াও অনায়াসে তিনি পাশ হইয়া গিয়াছেন; সর্ব্বাপেক্ষা

নীরস যে ব্যবহার শাস্ত্র, তাহার পরীক্ষাতেও তিনি দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার বান্ধব মণ্ডলী এবং আত্মীয়স্বজন যাঁহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা কেবলমাত্র পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ করিবার জন্য বসন্তকুমারের একান্ত পক্ষপাতী হন নাই;—যৌবনারম্ভে বিপত্নীক ও নিঃসন্তান হইয়াও তিনি যে পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই, ইহা অনেকের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইলেও হয়ত বা নিতান্ত অসাধ্য নহে; কিন্তু বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী এবং সুস্থ সুন্দর সবল ও নীরোগ এই রাজনন্দন, দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সঙ্গসুখ হইতে জন্মের মত বঞ্চিত হইয়াও, নিজের চরিত্রের নির্ম্মলতা যেরূপ ভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে কেবল তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুগণ কেন, আপামর সাধারণ সকলকেই একান্তভাবে তাঁহার গুণমুগ্ধ হইতে হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিভব, যৌবন ও প্রভুত্ব—ইহার একটিতেই যে অনর্থ উৎপাদন করে ইহা শাস্ত্র-বচন, এবং সকলগুলি একাধারে বিদ্যমান থাকিলে, উৎসন্নের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায় ইহাও মহাজনেরই পরম সত্য, অভ্রান্ত ও অস্খলিত বাণী। কিন্তু বসন্তকুমারের জীবনে ইহার সকলগুলির একত্র সম্মিলন অমৃত উৎপাদন করিয়াছিল। বাইশ বৎসরের উন্মুখ যৌবন, মোহময় সংসারের অদম্য প্রলোভন এবং অফুরন্ত কুবের ভাণ্ডার—ইহারা কেহই বসন্তকুমারকে তাঁহার যোগী-জীবনের কণ্টকময় কঠোর পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই।

স্ত্রীবিয়োগের মরণাশৌচের দিন হইতে বসন্তকুমার যে হবিষ্যান্ন আরম্ভ করিয়াছিলেন, স্বদেশে বিদেশে, রোগে স্বাস্থ্যে, কোন স্থানে বা অবস্থাতেই সে নিয়মের ব্যতিক্রম তিনি একদিনের জন্যও করেন নাই। সাক্ষাৎ কালস্বরূপ 'ক্যান্সার' ব্যাধি যখন তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তখন চিকিৎসকের আদেশেও তাঁহার ভোজ্য ভোজনাদি যাবতীয় কার্য্যের কোন ব্যতিক্রম তিনি ঘটিতে দেন নাই। ফলতঃ ইন্দ্রিয়-দমন, আচার নিষ্ঠা, ধর্ম্মে আস্থা, কর্ম্মফল ও অদৃষ্টে বিশ্বাস এবং দয়া দাক্ষিণ্য পরহিতৈষণা প্রভৃতি নানাবিধ সদ্গুণে তাঁহার চরিত্রকে সত্য সত্যই মাধুর্য্য মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল। সর্ব্বোপরি তাঁহার সর্ব্ববিষয়ে সংযম এবং ইন্দ্রিয়-দমনের শক্তি দেখিয়া, তাঁহাকে পুরোণোক্ত ভারতীয় ঋষিগণের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। সময় ও অবস্থাবিশেষে মুনির মনও টলিয়াছে, ঋষি চিত্তও চঞ্চল হইয়াছে, যোগিজনেও যোগপথভ্রষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষব্যাপী বসন্তের জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে নাই, বারেকের জন্যও তাঁহার পদস্খলন হইতে পারে নাই।

বসন্ত তাঁহার জীবনবসন্তেই প্রিয়জনের বিয়োগবেদনায় একান্ত কাতর হইয়া সংসার-ধর্ম্ম হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। বিদ্যা বুদ্ধি ও আভিজাত্যের বলে তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে বা সংসারের অপরাপর কর্ম্মে যে স্থান অধিকার করিয়া যে সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হয় নাই। সেইজন্য তাঁহার যোগী-হৃদয়ে দেশপ্রীতি এবং পরহিতৈষণা প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তি যে কত অধিক পরিমাণে ছিল, তাহা তাঁহার একান্ত আপনার জন ব্যতীত অপরে জানিতে পারে নাই। এম-এ, বি-এল পাশ করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, তিনি সংসার হইতে সুদূরে সরিয়া নিভৃত পল্লী-নিকেতনে নিতান্ত নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার স্বীয় জীবিকার জন্য অতি সামান্য অর্থেরই প্রয়োজন হইত। তাঁহার বিস্তৃত ভূ-সম্পত্তির উপস্বত্বের অধিকাংশ যাহা তিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজসাহী কলেজের Chair fo Agricultureএর জন্য সেই সঞ্চিত অর্থ হইতে আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। বিপত্নীক নিঃসঙ্গ জীবনের রোগে স্বাস্থ্যে সুসময়ে অসময়ে যাহারা এই রাজকুমারের সেবা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তাঁহার মৃত্যুকালে কাহাকেও তিনি বঞ্চিত করিয়া যান নাই—সকলকেই যথাযোগ্য দান করিয়া গিয়াছেন; কেহ কেহ পঁচিশ হাজার টাকা পর্য্যন্তও দানরূপে তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছে। মানসী—ভাদ্র ১৩২৭।

ময়ূরভঞ্জ রাজবংশ।

উড়িষ্যা।

উড়িষ্যা বিভাগের রাজ্য সমূহের মধ্যে ময়ূরভঞ্জ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশীয় করদরাজ্য। প্রাচীনকালে এই স্থানে নিবিড় অরণ্য থাকায় "ঝাড়িখণ্ড" নামে পরিচিত ছিল। এই রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্তে মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলা, পশ্চিমে কেওঞ্জর রাজ্য, উত্তরে সিংভূম ও মেদিনীপুর জেলা এবং দক্ষিণে বালেশ্বর জেলা ও নীলগিরি রাজ্য। ইহার পরিমাণ ৪২৪৩ বর্গ-মাইল। কুচ-বিহার রাজ্যের প্রায় সাড়ে তিন গুণ এবং দুইটী ব্রিটীশ জেলার সমান। ১৯১১ খৃঃ এই রাজ্যের লোকসংখ্যা প্রায় নয় লক্ষ। রাজধানী বারিপদ ব্যতীত প্রায় চারি সহস্র গ্রাম আছে। প্রতি বৎসর সার্ব্ব-ভৌম ব্রিটীশরাজকে রাজস্ব স্বরূপ সম্মানের জন্য ১০০১৲ টাকা "নজর" দিতে হয়; জমিদারগণের ন্যায় ভূরাজস্ব দিতে হয় না। পূর্ব্বে এই নজর কয়েক কাহন কড়িমাত্র ছিল। ব্রিটীশ রাজ্যের প্রবর্ত্তিত শাসন নীতির আদর্শে ময়ূরভঞ্জের শাসনকার্য্য নির্ব্বা-হিত হয়। রাজধানীতে একটী এবং মহ-কুমায় তিনটী জেলখানা আছে। বারিপদ রাজধানীতে একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় এবং রাজ্যমধ্যে ৩১৪টি স্কুল আছে। ডাক বিভাগের অধীনে ৭টি পোষ্টাফিস এবং ৬টি ঔষধালয় আছে। রাজস্ব ৩১০১৭৬৲।

স্থানীয় ঐতিহাসিকগণের মতে ময়ূরভঞ্জ রাজ্য প্রায় ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিম্বদন্তী এই যে রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুরের ক্ষত্রিয় মহারাজের বংশীয় জয় সিংহ নামক জনৈক আত্মীয় তাঁহার আসন্নপ্রসবা পত্নীসহ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব দর্শনে পুরুষোত্তম যাইতে ছিলেন, পথিমধ্যে পত্নীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে, তিনি পত্নীকে তথায় রাখিয়া একাকী গমন করেন। অনন্তর তিনি প্রত্যাগত হইয়া দেখেন, তদীয় পত্নী একটি সুন্দর পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন।

আদি ভঞ্জদেব—কালক্রমে সেই পুত্র স্থানীয় ময়ূরধ্বজ নামক জনৈক নরপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আদিভঞ্জ, আদিপুরে প্রথম রাজ্য স্থাপন করেন বলিয়া তাঁহার রাজ্যের নাম ময়ূরভঞ্জ এবং রাজবংশের উপাধি "ভঞ্জ" হইয়াছে।

বৈদ্যনাথ ভঞ্জ—১৫৭২ খৃঃ এই বংশোদ্ভব রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ বারিপদ নামক স্থানে আসিয়া বসতি করেন। তিনি তথায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে বহু তীর্থযাত্রী উহা দেখিতে গিয়া থাকেন। রাজা বৈদ্যনাথের নামানুসারে ঐ বিগ্রহের নাম শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথ জিউ হইয়াছে। ঝাড়ে-খণ্ডের শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথ জিউ হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ দেবতা।

যদুনাথ ভঞ্জ—১৮০৩ খৃঃ মহারাষ্ট্রীয়গণ হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উড়িষ্যা, বেরার প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশ জয় করিয়া হায়দ্রা-

বাদের নিজাম বাহাদুরের সহিত বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এই সময় তৎকালীন রাজা, মহারাষ্ট্রীয়দিগের করদরাজরূপে পরিণত হন। অতঃপর ১৮২৯ খৃঃ রাজা যদুনাথ ভঞ্জদেব বাহাদুর ব্রিটীশ রাজের সহিত একটি সন্ধি করেন; তদ্বারা তিনি প্রবল প্রতাপ ব্রিটীশ রাজের অধীনে করদ-রাজ্য পরিচালনে স্বীকৃত হন।

শ্রীনাথ ভঞ্জ—অতঃপর শ্রীনাথ ভঞ্জদেব প্রতিনিধি হন। তাঁহার সময়ে রাজ্যের আয় কথঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া রাজ্যের নানা-প্রকার উন্নতি এবং বহুবিধ দেশ-হিতকর কার্য্য করেন। তিনি সাধারণ হিতকর কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ দিতেন।

কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ—আদি ভঞ্জ দেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশে স্বর্গীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেব বাহাদুর জন্মগ্রহণ করিয়া বংশের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়া যান। তিনি প্রথমে ইংরাজরাজ্যের শাসন প্রণালীর অনুকরণে স্বরাজ্য পরিচালনার চেষ্টা করেন এবং নানাপ্রকার লোক হিতকর বিষয়ের অব-তারণা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রথমতঃ "মহা-রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। মহারাজের মধ্যম ভ্রাতা স্বর্গীয় বৃন্দাবনচন্দ্র ভঞ্জ দেব ছোট রায় সাহেব বাহাদুর মিষ্ট ও স্নেহ-শীল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি কলিকাতায় সুপরিচিত ছিলেন, তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র ভঞ্জ দেব বড়লাল সাহেব বাহাদুর বর্ত্তমান আছেন। মহারাজার তৃতীয় ভ্রাতা স্বর্গীয় রাউত রায় সাহেব বাহাদুরের বিধবাপত্নী এবং লালসাহেব শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ভঞ্জ দেব ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ভঞ্জ দেব নামে দুইটী সুযোগ্য পুত্র বিদ্যমান আছেন। ১৮৮২ খ্রীঃ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেব পত্নীসহ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। মহারাজ বাহাদুর, গুরগুজার রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তিনি তিনটী পুত্র ও কয়েকটী কন্যা রাখিয়া লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেব দশম বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমকালে উত্তরাধি-কারীসূত্রে পিতৃরাজ্য লাভ করেন। মহা-রাজের মধ্যমপুত্র শ্রীযুক্ত শ্যামচন্দ্র ভঞ্জ দেব হরিচন্দন মরদরাজ, নিকটবর্ত্তী নীলগিরি রাজ্যে পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হইয়া উক্ত রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীদামচন্দ্র ভঞ্জ দেব রাউৎ রায় সাহেব গৃহে থাকিয়া পারিবারিক বিভাগ পরি-দর্শন করেন। মহারাজের কন্যাদ্বয় সিং-ভূম—পোড়াহাটের রাজার সহিত এবং বারপল্লীর রাজার সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ—মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেব বাহাদুর ১৮৭২ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে বারিপদ রাজধানীতে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮২ খ্রীঃ পিতা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হওয়ায় দশম বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমকালে রাজ্য প্রাপ্ত হন। সেই সময় হইতে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে এচ পি ওয়াইলি সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত হন। দেওয়ান স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঘোষাল মহাশয় ম্যানেজার সাহেবের অধীনে কর্ম্ম করিয়া নানাবিষয়ে রাজ্যের উন্নতিসাধন করেন। তৎকালে মহারাজকুমার বাহাদুর কটক কলেজে বিদ্যা শিক্ষারম্ভ করেন। অতঃপর কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে

অধ্যয়ন করিয়া যথোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "বি, এ" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই; কিন্তু অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছিলেন। অকালে পিতৃহীন হওয়ায় তিনি পিতামহী ও খুল্লতাত মহাশয়ের স্নেহে প্রতিপালিত হন। ১৮৯২ খ্রীঃ মহারাজ কুমার রাজ্য ভার স্বহস্তে প্রাপ্ত হইয়া দুই বৎসর ম্যানেজারের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। তখন তাঁহার শিক্ষক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধর "এম. এ, বি, এল, মহাশয় জুডিশিয়াল সেক্রেটারী, অতঃপর দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার যত্নে ফৌজদারী, দেওয়ানী প্রভৃতি বিভাগের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধর মহাশয় দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হইলে, তাঁহার সুযোগ্য সহকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু বি, এল, মহাশয় ষ্টেট জজ নিযুক্ত হইয়াছেন। অধুনা মোহিনীমোহন রাজকার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রিটিশরাজের প্রবর্ত্তিত শাসন নীতির আদর্শে ময়ূরভঞ্জের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। অন্যান্য করদরাজ্য অপেক্ষা মহারাজের শাসন ক্ষমতা অধিক ছিল। একজন প্রধান দেওয়ান এবং তিন জন সহকারী রাজ্য শাসন কার্য্যে মহারাজকে সহায়তা করিতেন। এতদ্ব্যতীত মহারাজের এক জন প্রধান জজ, একজন সব জজ এবং দুইজন মুন্সেফ আছেন, তাঁহারা বিচার বিভাগের কর্ম্মচারী। দেওয়ানী, ফৌজদারী, কালেক্টারী, পুলিস, বনবিভাগ, জরিপবিভাগ ও সেটেলমেণ্ট প্রভৃতি বিভাগ স্থাপিত করিয়া মহারাজ, রাজ্যের বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। এ দেশের হাইকোর্টের ন্যায় মহারাজ একটি "জুডিশিয়াল' কমিটী" প্রতিষ্ঠা করেন। চারিজন সাধারণ ও চারিজন অতিরিক্ত সভ্য এবং মহারাজ সভাপতিযুক্ত একটি ব্যবস্থাপক সভা স্থাপন করেন। দেওয়ান, ইঞ্জিনিয়ার, জজ ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এই সভার সাধারণ সভ্য। মহারাজ, ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্ত হইতে পুলিশকে স্বতন্ত্র করেন এবং পুলিশের অধীনে রীতিমত পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত করেন। রাজধানীতে নূতন সুন্দর রাজপথ, ভিক্টোরিয়া ডায়মণ্ড জুবিলী নামক সাধারণের জন্য সুন্দর পুস্তকাগার, ময়ূরভঞ্জ কুষ্ঠাশ্রম, স্বর্গীয়া মহারাণী লক্ষ্মীকুমারীর নামে ধর্ম্মশালা, বারিপদ অনাথ আশ্রম, বারিপদ এনট্রান্স, স্কুল প্রভৃতি মহারাজের লোকহিতৈষিতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজধানীতে মিউনিসিপ্যালিটী এবং রাজপথে আলোক স্তম্ভ মহারাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজধানীর চতুর্দ্দিকে রাস্তা এবং রূপসা হইতে বারিপদ পর্য্যন্ত ত্রিশ মাইল রেলপথ তাঁহার নাম অমর করিয়া রাখিবে। রাজ্যের শিল্পোন্নতি মহারাজের জীবনের ব্রত ছিল; তদ্বিষয়ে তিনি নানারূপ উৎসাহ ও উদ্যম প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহারাজ ইউরোপ, চীন, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি ভূপ্রদক্ষিণ করিয়া শিল্প ও কলাবিদ্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তাঁহার, রাজ্যের খনিসমূহের কার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে মহারাজ এক নূতন উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই তিনি অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। মহারাজ স্বয়ং সুদক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালন

করিতেন। তাঁহার সময়ে রাজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। স্বর্গীয় রাজা যদুনাথ ভঞ্জ দেবের সময় রাজ্যের প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় ছিল। তৎপরে শ্রীনাথ ভঞ্জ দেবের সময়ে কিঞ্চিৎ বৰ্দ্ধিত হয়। অতঃপর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেবের সময় প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। অনন্তর মহারাজ যখন স্বয়ং রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তখন ম্যানেজার ওয়াইলি সাহেব ও দেওয়ান প্রসন্নকুমার ঘোষাল প্রভৃতির কার্য্য দক্ষতা গুণে প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ টাকা আয় হয়। অতঃপর মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের সময় রাজ্যের প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। মহারাজ ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, উৎকল সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি নানা বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। দর্শন বিজ্ঞান, গণিত, ধৰ্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতিতেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সর্ব্বদা পণ্ডিতগণের সহবাসে থাকিতে ও গভীর তত্ত্বের আলোচনা করিতে তিনি ভাল বাসিতেন। প্রজাপুঞ্জের কল্যাণ সাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। প্রজার ও রাজ্যের মঙ্গলের জন্য অকাতরে বহু অর্থব্যয় করিতেন। প্রজারঞ্জনই তাঁহার একমাত্র বিলাসের সামগ্রী ছিল। তিনি দাম্ভিক ও ধর্ম্মধ্বজী ছিলেন না। মহারাজ কোন দিন হিন্দুত্ব অস্বীকার বা তৎপ্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই। ধর্ম্ম শাস্ত্রে অনেক সময় অকপট হরিভক্তি পরিলক্ষিত হইত। ধর্ম্ম সাহিত্য ও চিন্তায় তাঁহার গভীর অভিনিবেশ ছিল। ইতিহাস পুরাণ, বিজ্ঞান প্রভৃতি ও কার্য্যকারী বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিতে ভাল বাসিতেন। শীকারে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। মহারাজ সদ্‌গুণ সম্পন্ন কৰ্ম্মবীর, প্রজাবৎসল আত্মীয় স্বজন প্রতিপালক, পরোপকারী, ধাৰ্ম্মিক, নিরহঙ্কারী, ও আড়ম্বর শূন্য ছিলেন কৰ্ম্মচারীদের প্রতি মহারাজ স্নেহশীল ছিলেন।

মহারাজ একজন আদর্শ নরপতি ছিলেন। তিনি ময়ূরভঞ্জের নিষ্ঠাবান হিন্দু রাজবংশীয়; কিন্তু তিনি স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহোদয়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বংশ গত অনুসারে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তৎপরে ১৯০৩ খৃঃ ১লা জানুয়ারী স্বর্গীয় ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে লর্ড কর্জ্জনের দিল্লী দরবারে শ্রীরামচন্দ্র "মহারাজা" উপাধি সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন। ১৯১০ খৃঃ ২৪শে জুন বর্ত্তমান ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের জন্ম তিথি উপলক্ষে তিনি উত্তরাধিকারক্রমে "মহারাজা" উপাধিসনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৯১১ খৃঃ ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের অভিষেক সময়ে নিমন্ত্রিত হইয়া বিলাত গমন করেন। বিলাতে তৎকালে অবস্থান সময়ে মহারাজের এক কন্যার নামকরণ উৎসব হয়; সেই তনয়ার নাম "মেরী" হইয়াছে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজ প্রতিনিধির পত্নী লেডী মিন্টো মহোদয়া রাজকুমারীর "ধৰ্ম্ম-মাতা" হন। মহারাজ কয়েক জন আত্মীয় স্বজন ও ইংরাজ সমভিব্যাহারে স্বীয় রাজ্যের এক নিবিড় জঙ্গলে শীকার করিতে গিয়াছিলেন। মহারাজের জনৈক আত্মীয় তাঁহাকে ভল্লুক ভ্রমে গুলি করিয়াছিলেন; তাহাতে আহত হইয়া মহারাজ শয্যাশায়ী হন। কালকাতা আলিপুরের বজবজ রোডে মহারাজের

প্রাসাদে তাঁহার চিকিৎসা হয়—সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ব্রাউন সাহেব, শ্রীযুক্ত সুরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার প্রভৃতি চিকিৎসা করেন; কিন্তু নিয়তির শাসনে জীবনের মধ্যাহ্নে মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেব ১৯১২ খৃঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী জগতের রঙ্গভূমি হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। কালীঘাটের কেওড়াতলার শ্মশান ঘাটে গঙ্গাতীরে সৎকার হইয়াছিল। ছোট লাটের একজন এডিকং বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপে ঐ দিবস মহারাজের সৎকার সময়ে শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ এবং ময়ূরভঞ্জ ও কুচবিহারের বহু সম্রান্ত ব্যক্তি সৎকার সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

মানভূম জেলার অন্তর্গত পঞ্চকোট কাশীপুরের লোকান্তরিত মহারাজ নীলমণি সিংহ দেও বাহাদুরের পৌত্রী লক্ষ্মীকুমারী দেবীর সহিত ময়ূরভঞ্জাধিপতি মহারাজের প্রথম বিবাহ হইয়াছিল। সেই রাণীর গর্ভে পূর্ণচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র নামক দুইটী পুত্র এবং একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর অতীত হইল কন্যাটির বসন্ত রোগে বিয়োগ হয়। অতঃপর স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুচারু দেবীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই রাজ্ঞীর গর্ভজাত একটী কন্যা এবং পুত্র শ্রীযুক্ত ধ্রুবেন্দ্রচন্দ্র বর্ত্তমান আছেন। রাণীমাতা এক্ষণে মাসিক পেন্‌সন্ প্রাপ্ত হইতেছেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ কুমার শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুর ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের বর্ত্তমান অধীশ্বর। ১৯১২ খৃঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী কুমার বাহাদুর রাজ্যাধিকার লাভ করিয়াছেন। নাবালক অবস্থায় একজন সিবিলিয়ান্ সাহেব ম্যানেজার গবর্ণমেণ্টের অধীনে নিযুক্ত হইয়া রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, অধিকন্তু একজন পলিটীক্যাল এজেণ্টও আছেন। জ্যেষ্ঠ কুমারদ্বয় রাজপুতনার অন্তর্গত আজমীঢ়ের সামন্ত রাজকুমারদিগের কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিগত আগষ্ট মাসে ময়ূরভঞ্জের নাবালক মহারাজ পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। এখন তিনি অপত্য নির্ব্বিশেষে সুযশে পিতৃরাজ্য সুশাসন করিয়া দেশের ও দশের মঙ্গল করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।

মাতৃ-পূজা।

কাল বিবর্ত্তনে ভারতের প্রাচ্য ভাব ম্লান হইয়াও কিন্তু তাহার চির সৌন্দর্য্যের এখনও সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি ছয়টী ঋতু বর্ত্তমান—সৌগন্ধবাহী মলয় মারুতের স্নিগ্ধ সান্ত্বনার বিরাম নাই। আর্য্য ঋষিদিগের সাধন কেন্দ্র সকল এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। পূত-সলিলা তুঙ্গ তরঙ্গিণী সমূহ নানা দুর্ঘটনায় ক্ষীণ শক্তি হইয়াও প্রবাহিতা হইতেছে। হিমাচল, নীলাচল, ওঙ্কারনাথ, নৈমিশারণ্য, কাশী গয়া, বৃন্দাবন

প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে কোথাও বেদ পাঠ, কোথাও বা সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, গীতা, বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা, কোথাও বা যোগতত্ত্বের গভীর ব্যাখ্যা, কোথাও বা হরিনামামৃত পান করিয়া ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তনে বিভোর।

এই পবিত্র প্রাচ্য ভারতে আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব ও বিজ্ঞান রসায়ন নানা শাস্ত্রের জ্বলন্ত ভাব প্রতীচ্য ভাবের সংমিশ্রণে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। সময় বা কালের পরিবর্ত্তনে প্রকৃতির যুগপৎ ভাবান্তর বুঝা যায় না। এই শরৎকালও নির্ম্মল জ্যোতিঃ সম্পন্ন ও চির সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত নহে। ঐ দেখুন, ঘন বারি-বিধৌতিত দিবাকরের কর নিকরে পৃথিবী যেন শুভ্র পরিচ্ছদে আহ্লাদিত। আঃ! ঐ আকাশেরই বা দিব্য দীপ্তি শোভা কি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। আবার রজতনিভ নিন্দিত শরচ্চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণে রজনীরও শ্রী সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। জ্যোৎস্না প্রবাহিনী নভোমণ্ডলে সুধাংশু সুধা-প্রয়াসী চকোর-কুল অনুকূল ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া মধুর কণ্ঠে দিবা-তাপিতগণকে যেন তৃপ্তি দান করিতেছে। এই সময় ভারতবাসী নর নারীর আনন্দের সীমা নাই। প্রত্যেক গৃহে মাতৃ পূজার আয়োজন—ষষ্ঠ্যাদি কল্পে উদ্বোধনের নিমিত্ত স্মৃতির ঘন উত্তেজনায় ঘট স্থাপন। কেহ ঘটে, কেহ চিত্রপটে, কেহ বা মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ অর্চ্চনা বন্দনা করিতেছেন। বস্তুতঃই ভারতবাসী হিন্দুমাত্রই জগজ্জননীর আরাধনায় উন্মত্ত। এই শারদীয় মহাশক্তি পূজায় কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি গৌর, সকল সম্প্রদায়ের ভক্তগণ মতের গণ্ডি-রেখা সমূহ মুছিয়া দিয়া এক প্রাণতার সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত!

এখন মাতৃ পূজার কথা! মায়ের আরাধনাও সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, তিনটী ভাবে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। প্রথমটী আধ্যাত্মিক নিষ্কলঙ্ক নিত্যভাবে, দ্বিতীয়টী হিংসা-বর্জ্জিত বিশুদ্ধভাবে, তৃতীয়টী হিংসা-জড়িত নির্ম্মমভাবে ব্যবস্থা। বস্তুতঃই বৈষ্ণবগণ পবিত্র উপকরণে অর্থাৎ ধূপদীপ নৈবিদ্যাদি দ্বারা মায়ের পূজা বন্দনা করেন। শাক্তগণ ছাগাদি পশু বলিরবিধানে উঁহাদের রুধিরদানে মাতৃপূজার উৎকৃষ্ট উপকরণ এবং ভোগোপযুক্ত অন্যান্য দ্রব্যাদির আয়োজনেও ত্রুটী করেন না। যাহা হউক, সম্প্রদায় বিশেষে মত ও পদ্ধতির যাহা নিয়ম আছে, তাহাই সকলে পালন করিতে বাধ্য। এখানে হিংসা বা অহিংসা সম্বন্ধে বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই। তবে একটু মনে মলিনতা আসিয়া পড়িতেছে যে, তিনি বিশ্বমাতা তিনি কি এই পশু রুধিরের জন্য লালায়িত? কখনই ইহা সম্ভব নহে। যদি রক্তপান করিতেই ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে লবণ সমুদ্রই বা কেন?—উহা রক্ত সমুদ্রই থাকিত! যাহা হউক, শাস্ত্রে যখন সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, এই ত্রিবিধ পূজার বিধি দেখা যায়, তখন ইহার ভিতরের গূঢ় তত্ত্ব অনুশীলন করিতে গেলে, ভীষণ যুক্তি তর্কের তরঙ্গে পড়িতে হয়। অতঃপর যাহার যে বিশ্বাস, তিনি তাহাই করুন। মূলকথাটী ত আনন্দ সম্ভোগ! যে ভাবেই হউক না—একটু প্রাণে শান্তি পাইলেই যথেষ্ট। পিণাক পটহ বাদ্য ধ্বনিতেই হউক, আর যাত্রা থিয়েটার প্রমোদজনক ব্যাপারই হউক, যে কোন উদ্যমই চলুক না—ইহার উদ্দেশ্য তো মাতৃ পূজা বটে। বিশেষতঃ জগজ্জননী জগদ্দুর্গতি হরণ করেন বলিয়া এই উৎসব দুর্গোৎসব নামে অভিহিত হইয়াছে। হায়! দুঃখের কথা এই যে,

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, তিনদিন পর আনন্দ-ময়ী মা সকল প্রকার আনন্দ উৎসাহ লইয়া চলিয়া যান। দশমীর দিন বিজয়া অর্থাৎ মায়ের বিসর্জ্জন

গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং যত্রো দেব মহেশ্বরঃ।
সম বৎসরে ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ॥

মায়ের সুসজ্জিত প্রতিমা তুঙ্গ তরঙ্গিণীর অতল তলে নিমজ্জিত হইল। জয় কোলা-হল উৎসাহ উদ্যম ধূমধাম সকলি মিটিয়া গেল। মণ্ডপ গৃহটী যেন শ্মশানে পরিণত। ভক্ত সন্তানগণ হৃদয়ভেদী দুঃখানল দহন যাতনায় যারপর নাই সন্তাপগ্রস্ত হইলেন। এক বৎসরের জন্য মায়ের আগমন পথ চাহিয়া রহিলেন। কবে মা আবার আসিবেন, ইহা প্রাণের চিন্তা। এখানে বোধ হয় এ সঙ্গীতটী অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান ঠেকা।

কেমনে বাঁচি মা বল ক'রে তোমায় বিসর্জ্জন।
প্রাণে না থাকিলে তুমি প্রাণ কি থাকে কথন ?
প'ড়ে অন্ধকারে নরে, কল্পনায় খেলা করে
তাই ত এভাব ধ'রে, নিত্যভাবে অচেতন।
যাও আবার এস চ'লে,এ কথা মা কারে বলে
বলি চলি কার বলে, প্রতি পল প্রতিক্ষণ।
গগন ভুবন চয়, স্বরূপে মগন রয়,
কিরূপে সম্ভব হয়, জলে স্থলে বিচরণ ?
তোমা বিনা এ হৃদয়, শ্মশান বা মরুময়।
সকলই ত বৃথা হয়, শব যে দেহ তখন।

এই ত রাজসিক ও তামসিক ভাবে মাতৃ পূজা। এখন সাত্বিক পূজার বিষয় সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা নিষ্ফল প্রযত্ন নহে। মাদৃশ নীরস শুষ্ক প্রাণ হইতে যদি নিত্য পূজার আবেগে স্বর্গীয় প্রেমাশ্রু এক বিন্দুও পড়ে, তবে নিরাশার কথা নহে। পরদুঃখকাতর ঋষিরা মহাশক্তির সাত্বিক আরাধনার নিমিত্ত ও যথেষ্ট উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল সিদ্ধ মন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত হইয়া, প্রক্ষিপ্ত ছায়ায় প্রচ্ছন্ন থাকিলেও বিশেষভাবে অনুসন্ধিৎসু হইলে সাত্বিকতত্ত্বে বঞ্চিত হইতে হয় না। উদ্বো-ধন অর্থাৎ জাগ্রত হইবার জন্য ভক্তের অন্তর পটে বিশেষভাবে নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহ লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বিষয়াসক্ত মানবগণ ঐশ্বর্য্য লিপ্সার আতিশয্য বশতঃ অধীর হইয়া সাত্বিক পূজা অতি কঠোর ও অসম্ভব মনে করেন এবং প্রমোদ মিশ্রিত রাজসিক ও তামসিক পূজা পদ্ধতির অনুশীলনেই একান্ত অনুরক্ত। সুতরাং সাত্বিক তত্ত্বের বিষয় সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট। তাই বলিতেছি, ভারত সন্তানগণ কি পরস্পর জাগিবেন না। আসুন, সকলে একপ্রাণতার মহামন্ত্রে মহাশক্তির আরাধনায় ঘট স্থাপনা করি। জগতের প্রত্যেক নরনারী আপনাপন হৃদয় ঘটটী ব্রহ্মসিন্ধুর অতল তলে ডুবাইয়া দিয়া মাতৃ পূজার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই। হৃদয়ঘট হইতে নিশ্চয়ই মায়ের সান্ত্বনা বাক্য শুনিতে পাইব। এই ত পূজা আরম্ভ হইল। অখণ্ড চিন্ময়ীরূপে মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি সকল অদৃশ্য হইয়া গেল। মাতৃদেবীর নিত্য-স্থিতিত্বের আর কোনরূপ সন্দেহ রহিল না। বহির্জগতের বাহ্যভাবের বস্তু সমূহ অসীম জ্যোতিঃ মণ্ডলে ডুবিয়া গেল। নিত্যযুক্ত ভক্ত তখন অপার্থিব শ্রুতিতে মাভৈঃ শব্দে আশ্বাসবাণী শুনিতে পাইলেন। চকিৎ মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের আলো ফুটিয়া উঠিল—ভক্ত তখন জাগিলেন। হৃদয়াকাশে চিন্ময়ী মহাশক্তির আরাধনায় বাহ্য বস্তুর কোন প্রয়োজন নাই। মায়ের পূজায়

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য কিছু চাইনে, ছাগ মহিষাদি পশু বলি ও দুন্দুভি প্রভৃতির বাদ্যও চাইনে, তবে চাই কি? চাই স্বর্গীয় সুধা সুরভি গন্ধ, চাই জ্যোতির্ম্ময়ী জ্যোতিঃ, চাই প্রাণ মন জীবন, এই ত্রিসত্তার একীভূত শক্তির নৈবেদ্য, আর চাই প্রীতি পুষ্প, ভক্তি চন্দন অনিবার্য্য উদ্যম নিবন্ধন এটিও আবশ্যক, অবিশ্রান্ত অনাহত ভেরী ধ্বনি। আর চাই প্রকৃত পশু বলি। বস্তুতঃই পশু বৃত্তি সমূহকে বলি দিতে হইবে। বিশেষতঃ দম্ভ দ্বেষ অংহঙ্কার ইত্যাদিগেরও বিনাশ সাধন আবশ্যক। এজন্য পাশব বৃত্তির তিরোধান অতীব সাধু সঙ্কল্প কেননা, উহা দ্বারা মানব প্রকৃতি কলুষিত হইলে, হিতাহিত জ্ঞান কিছু থাকে না। অনায়াসে লোক-নিন্দিত অতি ঘৃণিত কার্য্য করিতে পারে। অতএব পাশব প্রবৃত্তিই পশু নামে অভিহিত, উহাকে বলি দিলে তখনই বিশ্বজননী দুর্দ্দান্ত মোহ-মহিষটীকে অব্যর্থ শক্তি শেল প্রয়োগ দ্বারা বধ করিয়া অশরীরি মহিষ-মর্দ্দিনী নামে মহাশক্তিরূপে প্রকাশ হন।* এবং অমিয় বাৎসল্য ও সান্ত্বনা বাক্যে ভক্তকে মুগ্ধ করেন। ভক্ত তখন আত্মহারা হইয়া যান। তাঁহার আর পার্থিব ভোগ বাসনা কিছুমাত্র মনে হয় না। বহির্জগতের বাহ্য পূজার প্রতি ততটা অনুরাগ থাকে না। ঐ সময় বাহ্যোদ্যমাদি সকল প্রযত্ন মধ্যে, ইহা প্রাণে উদয় হয়—

"উত্তম ব্রহ্ম সদ্ভাবো ধ্যান ভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জ্জপ ধমোভাব বহি পূজাঽধমাধমাঃ॥

ভক্ত যোগী, সকামজনিত বাহ্য ভাবের ঊর্দ্ধে উন্নত হইলে, তিনি কেনই বা আর সময় পাত করিবেন। আধ্যাত্মিক পূজার প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সমূহের জন্য তখন বড় আকুল হইয়া পড়েন। ঐ আকুল উৎকণ্ঠাই তো অনুকূল অবস্থায় আসিয়া শুভ সঙ্কল্পটিকে এমনই সুদৃঢ় করেন যে, একমাত্র নিত্যভাব ভিন্ন ভাবিবার বিষয় আর কিছু থাকে না। বস্তুতঃই জগত্তত্ত্বের কোন অংশ স্বর্গীয় মহত্তত্ত্বের সহিত ঐক্য হইতে সক্ষম হয় না। শুভ সাধুভাবের আবির্ভাবে, শমদম তিতিক্ষা নিদিধ্যাসন প্রভৃতি ইহারা সাত্ত্বিক ভাব হইতে পূজার উপকরণ সমূহ বহন করিতে আরম্ভ করে। ভক্ত তখন অনায়াস-লব্ধ পূজা সম্ভার প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হন এবং শাক্ত পূজার নিত্য পদ্ধতির গূঢ় তত্ত্ব সমূহ অল্প সময়েই বুঝিতে পারেন। তখনই তত্ত্ব জ্ঞানের আলোকে মহামণ্ডলের পথ পরিষ্কার দেখিয়া ভক্ত প্রাণ এতই অধীর হয় যে, মুহূর্ত্ত কালও বিলম্ব সহ্য করিতে অসমর্থ। এখন মাতৃ পূজার স্তোত্র পাঠ—

নমস্তস্মৈ মহাশক্তি ত্বংহি ভক্তবৎসলে
পামরে পরম শান্তি দেহি মে সর্ব্বমঙ্গলে।
জড়িত বিষয় ঘোরে ব্যথিত পাপ-কশাঘে
ত্রাহি মে চিন্ময়ী দেবী বাসনা বিষম বিষে।
ত্রিতাপ দহন তাপে তাপিত ভুবনেশ্বরী
যোগ শক্তি পরাভক্তি দেহী মুক্তি শুভঙ্করী।
অনাদ্যা ভুবনারাধ্যা বিতর করুণা কণা,
নীরস জীবনা ধারে সন্তরে সত্য সাধনা।
সংসার নিবিড়ারণ্য মোহ তিমির সংবৃত,
শত্রুসঙ্কুল সংগ্রামে ভয়ে শোণিত শোষিত।
বন্ধুর দুর্গম পান্থে দেহি জ্যোতিঃ জ্যোতির্ম্ময়ী
ত্বৎকৃপা কেবলং মাত্র সঙ্কটে ভরসা অয়ি।
কান্তার শ্বাপদ সিংহ বিচরে ভীম গর্জ্জনে,
নিস্তার নিখিল মাতা অতি ভীত দীনজনে।

* এরূপে মাতৃ পূজায় মহিষাসুর বধ হইয়াছিল।

ভারত বহু ধর্ম্মের আশ্রয়ে ও বহু শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও মাতৃ পূজায় এক-প্রাণ, একহৃদয়। বলিতে কি, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি সর্ব্বত্রই মহাশক্তির পূজার আনন্দ উল্লাসে বাল বৃদ্ধ যুবা সকলেই উন্মত্ত। প্রত্যেক নরনারীর প্রাণের ভিতরে এমন একটী মধুর আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয় যে, অতি অল্প বয়স্ক বালকেও মা মা বলিয়া পূজার পুষ্পাদি চয়ন জন্য ব্যাকুল। বাস্তবিকই এই মহা মহোৎসবে ধনী দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ আতুর সকলের জীবনেই মাতৃ-পূজার মহা তরঙ্গ অনিবার্য্য। কিন্তু হায়! এই উৎসব যদি চির সম্ভোগের আধার পাইত, তাহা হইলে কখনই ধর্ম্মভাবের ঐক্য বন্ধন শিথিল হইয়া যাইত না। আবার নিরাশারও কথা নহে। এখনও ভারতে অনেক নিত্য তত্ত্বদর্শী ভক্ত যোগী আছেন, তাঁহারা বস্তুতঃই জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃ পূজায় প্রাণ, মন, জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, চিন্ময়ী মৃণ্ময়ীর পূজা অর্চ্চনা যখন চিরপ্রসিদ্ধ আছে, তখন উহার মধ্যে কোনটীকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মৃণ্ময়ী মাতৃ পূজা রাজসিক ও তামসিক ভাবে বিজড়িত। তজ্জন্য পূর্ণ শক্তি পূজার আশা সুদুরপরাহত। এ বিষয় বাসুদেব মুখ-নিঃসৃত মহাযোগশাস্ত্র গীতায় সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক গুণত্রয়ের বিশেষভাবে মীমাংসা রহিয়াছে। তাহার মধ্যে তিনটী মাত্র শ্লোক এই স্থানেই উদ্ধৃত হইল। অবশ্যই মহাশাস্ত্র গীতার মহামন্ত্র শ্রবণ প্রবৃত্তি নিবৃত্তির নহে। অল্পেই সুধীগণ পূজার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিবেন।

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয় মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি
সাত্ত্বিকম্॥"
১৮ অঃ ২০ গীতা।

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজ সমুদাহৃতম্॥২৪
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামস মুচ্যতে॥২৫

এই গুণত্রয়ের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবের পূজাই শ্রেষ্ঠ। কেননা ইহার ভিতরে কোন প্রকার মলিনতা বা বাহাড়ম্বর কিছুই নাই। যোগশাস্ত্র গীতারও মন্ত্রভাগে চিন্ময়ী মাতৃ-পূজারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। যোগী, ভক্ত, সাধক সকলেই এই মীমাংসার বাধ্য। তবে ভক্তির উচ্ছাস তরঙ্গে পড়িয়া কল্পনা কল্পে স্থুল দৃষ্টির প্রখরতাই প্রবল হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সত্য বস্তুর চিন্তা বা তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া, এটি সহজ নহে। সাত্ত্বিক সিদ্ধ যোগী, ভাবমগ্ন ভক্ত, উচ্চ সাধক তান্ত্রিক ভিন্ন বিচারবিৎ পণ্ডিত দ্বারা উহার আশা করা নিরাশারই কথা। এটি অবশ্যই বলিব যে, যাহার যতটুকু সাধন শক্তি—তিনি সেইটুকু লইয়াই আরাধনা করুন। কিন্তু ঐ অভ্যাসটী যেন শোণিত গত না হইয়া পড়ে। ঋষিরা স্থুল যোগাভ্যাসেরও ব্যবস্থা দিয়াছেন সত্য। উহা প্রথম সোপান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও পরিত্যাজ্য। ঐ সাধনাভ্যাসটীকে জলৌকার ন্যায় পরিত্যাগ করিতেই হইবে। এই কারণেই প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ এই তিনটী সাধনের পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। অতঃপর যিনি যে ভাব ধরিয়াই চলুন, পরিশেষে মহাভাবের মহ মণ্ডলে উপনীত হইতে পারিলেই তো ঐ চিন্ময়ী মহাশক্তি

মা ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইবেন না। মৃৎ পদার্থ জাত যে কিছু সমস্তই কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে। এখন দেখুন, অখণ্ড চৈতন্যময়ীর জ্যোতিঃ মণ্ডলেই তো মহাযোগ অর্থাৎ মহামিলন। এইখানেই মহাশক্তির পূজার ভক্ত যোগীগণ সিদ্ধিলাভ করেন। এবং জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃরূপ দর্শন করিয়া ধন্য হন। এই স্থানটী কোথায়? ঐ যে সমাধিস্থ যোগীদিগের হৃদয়! আহা! যোগসিদ্ধ যোগীর হৃদয়াকাশের প্রসারও যে অনন্ত ঐ মহামণ্ডলের জ্যোতিঃ হইতেই তো মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র, গীতা, উপনিষদ্ বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি ও যোগ শাস্ত্র সকল বাহির হইয়াছে। আমরা পরবর্ত্তী প্রক্ষিপ্ত ছায়ায় মহত্তত্ত্ব সকল দেখিতে পাই না। এবং গ্রহণ করিতেও সক্ষম নহি। বাহ্যভাবের তরঙ্গাঘাতে হৃদয়াকাশে মায়ের অরূপে স্বরূপ দর্শনে বঞ্চিত। অনেকেই বলেন যে, নিরাকারে ধারণাই অসম্ভব—দর্শন কিরূপে সম্ভব হয়? এখানে এই কথাটি অসার মনে করিবেন না। সহজেই বুঝুন, আপনি বিদেশে চাকুরী করিতেছেন। হঠাৎ শুনিলেন, আপনার মাতৃদেবী মৃত্যু শয্যায় শায়িত; আর থাকিতে পারিলেন না, দ্রুতগামী বাষ্পীয় যানে অতি সত্বরে গৃহে আসিয়া দেখিলেন, তুলসী তলায় মাতার শব শরীর। তখন মাতৃ-দর্শন বিরহ-শোকে অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন। হায়! হায়! পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে আসিলেই মায়ের দর্শন পাইতাম। কেন? মাতৃদেবীর শরীরের তো কোন ব্যত্যয় হয় নাই। হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা সকলই তো আছে। তবে কেন মায়ের জন্য আক্ষেপ করিতেছেন? তাই বলিতেছি, মা যখন দেহটি ছাড়িয়া অন্তর্হিত হইলেন তখন কি কেহ তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন? তবেই দেখুন, মায়েতেও মা ছিলেন। যে মা দেহটী ছাড়িয়া গেলেন, তাঁর কি কোন আকার ছিল? সর্ব্বব্যাপিনী বিশ্বজননী সকলের মধ্যেই স্থিতি করিতেছেন। ভ্রান্তির আবরণে আমরা দেখিতে পাই না।

এখন নিরাকারে রূপ দর্শনের ধারণা সম্বন্ধে একটু বলা আবশ্যক। সিদ্ধ যোগীরা অখণ্ডভাবে হৃদয়েই ধারণা করিয়া থাকেন। এ বিষয় অতি সংক্ষেপে দুটীমাত্র কথা বলিতেছি। সুধীগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আপনি ঐ অসীম শূন্য দেখিতেছেন। উহার হস্ত পদাদি বিশিষ্ট কোন আকার নাই। তথাপি উহাকে অখণ্ড ভাবে ও বস্তুরূপে বুঝিতেছেন।* আরও দেখুন, আপনার হৃদয়ে আনন্দ আসিল, তাহারও কোন পার্থিব আকার দেখা যায় না। কিন্তু ঐ আনন্দকে কি আপনি আনন্দময়ীরূপে দর্শন করিলেন না? উপনিষদ্ কি বলিতেছেন। যোগীগণ জীবনাধারেই অরূপে রূপের ধারণা এবং চিন্ময়ী মাতৃ দর্শন করিয়া থাকেন।

বাস্তবিক একটু বাহ্য তৃপ্তির প্রতি বীতরাগ জন্মিলে স্বাভাবিক ভাবে জ্যোতিঃ মণ্ডল হইতে তড়িচ্ছটার ন্যায় মায়ের স্ব-রূপ ভাব ক্রমশঃ প্রকটিত হইতে থাকে। তখনই হৃদয় হইতে অনাহত দুন্দুভি বাজিয়া উঠে। স্বর্গীয় অমৃতধারায় মোহসন্তপ্ত শুষ্ক প্রাণ জুড়াইয়া যায়। বহির্ভাব বহিপূর্ণ জাগর উল্লাস তরঙ্গের প্রবল শক্তি আর থাকে না। অতি নিশ্চয় সত্য যে, অন্তশ্চক্ষুতে মহাশক্তির

* ঋষিরা এইভাবেই নিরাকার শূন্যকে ক্ষিত্যাদি তত্ত্বমধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন।

দর্শন হৃদয়েই হইয়া থাকে। বহিশ্চক্ষু মেলিয়া রহিলে ও কিছু দৃষ্ট হয় না! পার্থিব প্রকৃতিও বধির অপার্থিব প্রকৃতিতে প্রাণমুগ্ধ মধুর সান্ত্বনা বাক্যে যে একেবারে অধীর করিয়া ফেলে। কে বলে যে নিরাকারে ধারণা ও দর্শন হয় না? এটী নিশ্চেষ্ট মানবগণের সম্পূর্ণ ঔদাস্য ও নৈরাশ্যের কথা। এখন প্রার্থনা—

মা! আর প্রার্থনা কি করিব। তুমি তা আমি জন্মিবার পূর্ব্বেই মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলে! বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকল অবস্থায় রক্ষা করিয়াছ। তোমার কৃপার দান,দুর্ব্বিহ দুঃখ সন্তার বহন-ভার, অতি আনন্দের বিষয় বলিয়া, ব্যথিত হই নাই। দরিদ্রতার নিষ্পেষণে বরং সময়ে সময়ে কষ্ট যন্ত্রণার ভিতরেও সেবা ভাব জাগ্রত করিয়া দিয়াছ। কিন্তু আমি তাহা রক্ষা করিতে পারি নাই। তবুও অতি অধম অকৃতজ্ঞ সন্তান সত্বেও তোমার বাৎসল্য ভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। আমি যাহা প্রয়োজন বলিয়া মনেও করি নাই, তাহাও দিয়াছ। আমার অভাব যখন আমি বুঝি না, তুমিই তো পূর্ণ করিয়া দাও, তখন আর চাহিবার কি আছে মা! তবে প্রাণের এই একটী আকাঙ্ক্ষা যে, তোমার অভেদ কৃপার গুণে কোন সময়েও সাত্বিক তত্বের আভাস কিছু পাইয়া থাকি, তাহাই জগতের বিষয়-বিলাস-সুখ নিরত ভাই ভগিনীদিগকে দিয়া যদি কিঞ্চিন্মাত্রও সেবা করিতে পারি। তাঁহারা যেন তোমাকে আনন্দময়ীরূপে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। তোমার যে সকলেরই প্রতি স্নেহ বাৎসল্য অক্ষুণ্ণ—করুণার সীমা নাই। তবে আর অভাব কি?—এই মরুময় হৃদয়টা তোমাকে দিতে পারিলে, তুমি ত কখনই শূন্য হৃদয় রাখ না। আর এই চাই মা, শোক দুঃখ সন্তাপিত নিরাশ শুষ্ক জীবনে যাহারা সর্ব্বদা অশান্তি ভোগ করিতেছেন, তাহাদিগকে শান্তি দাও। আমাদের সকল ইচ্ছা তোমার অনন্ত ইচ্ছায় মিশিয়া থাক্। আমার বলিতে আর যেন কিছু না থাকে। প্রাণ মন জীবন এই ইচ্ছা-যোগে একীভূত হইলেই ত জীবন্মুক্ত—তাই প্রার্থনা করিতেছি, চিন্ময়ী মাতৃরূপে প্রকাশিত হও। জগৎ তোমার নিত্য পূজায় পরিতৃপ্ত হউক।

শান্তিঃ　　শান্তিঃ　　শান্তিঃ

শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস।

তাজমহল।

সেদিন, আমার একজন আপনার লোক আমাকে লইয়া, অভিনব দিল্লীর রাজধানীর আড়ম্বর পূর্ণ ভিত্তি দেখাইলেন; যাহা গঠিত হইলে ভারতে আর এক মহান কীর্ত্তি স্তম্ভ থাকিয়া যাইবে। পরদিন আগরার তাজ-মহল দেখিতে গেলাম।

আর্ট বিষয়ে স্থাপত্য বিষয়ে কত লেখক পৃথিবীর নানা ভাষায় তাজমহলের কত বর্ণনা

করিয়াছেন, আমি তাহা করিব না। কিন্তু তাজমহলের পরিপার্শিক দৃশ্য, শীর্ণকায়া যমুনার উপরে একান্ত বিশাল ধরণীর অলঙ্কার তাজমহল, আমার প্রাণে যে চিন্তা ধারা ঢালিয়া দিল, তাহাই কিছু বলিব।

সাজাহান, ওপারে ক্ষুদ্র একটী হর্ম্ম্যে বসিয়া তাজমহল নির্ম্মাণ দেখিতেছেন। একমাত্র সহধর্ম্মিনী মমতাজ মহলের নিকট পাশা খেলিতে২ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাজবিবি জিজ্ঞাসা করিলেন আমি মরিলে তুমি আমার জন্য কি করিবে? তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি যেমন ধরণীর অলঙ্কার, তেমনি এমন একটী জিনিস প্রস্তুত করিব, যাহা ধরণীর অলঙ্কার। সাজাহান সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাট, সাজাহান ঋষি, তিনি এই আমোদ কালীন প্রতিজ্ঞা ভুলিলেন না। রাজকোষে অগাধ টাকা। তাঁহার মহান উদার হৃদয়, ক্ষুদ্র ২ কারণে লোকের সর্ব্বনাশের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ করেন নাই।

রাজ্যে প্রগাঢ় শান্তি বিরাজিত। এই শান্তিময় রাজ্যে শান্তি প্রয়াসী নরপতি, এই জগতের অলঙ্কার বিচিত্র সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শত শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, সাজাহান চলিয়া গিয়াছেন, শত শত বৎসর চলিয়াছে, তাজবিবি চলিয়া গিয়াছেন, শত শত আক্রমণকারী ভারতের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু কাল ও অত্যাচারী দস্যুগণের আক্রমণ অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির রঙ্গভূমি আগ্রাবনে এই বিশাল সুন্দর হর্ম্ম্য জগতের প্রশংসা আকর্ষণ করিয়া জগতের একটী প্রধান আশ্চর্য্য সৌধ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। তাজমহলের উন্নত বারাণ্ডায় বসিয়া ভাবিলাম, একবার হায়,সাজাহান,হায় সাজাহান,বলিয়া ক্রন্দন করি যে,তুমি চলিয়া গিয়াছ, তোমার প্রিয় পত্নী তাজবিবি চলিয়া গিয়াছেন, তাজমহলের এক অন্ধকার গৃহে তুমি ও প্রাণ প্রিয়া পত্নী সমাহিত হইয়াছ। সেই মৃত প্রস্তর রাশির মধ্যে তোমরা মৃত, সাড়ে তিন হস্ত ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ। সকলেই মৃত। এই বিশাল হর্ম্ম্যের অসীম কারুকার্য্য বলিয়া দিতেছে মৃতের সমাধি। আর সাজাহান আসিবে না। আর মমতাজমহল আসিবে না। সে শৌর্য্য নির্ম্মাতা শিল্পীগণও আসিবে না, সেই রাজৈশ্বর্য্য সম্পদ, বিপুল অর্থপূর্ণ ভাণ্ডার আর আসিবে না। আজি যমুনার তটভূমি নীরব, আজি তাজমহল তোমার নহে, ভারতের লুপ্ত সমৃদ্ধির নীরব সাক্ষী, ভারতের মহত্ব, ভারতের কীর্ত্তি সকলেই অতীত সকলই নীরব। তাজমহল, তুমি মৃতের সমাধি, মৃত প্রস্তর ভূষণ লইয়া মৃত ঐশ্বর্য্যের গৌরব স্বরূপ তুমি মৃত। যমুনার নীল বারি, কত মৃতের অভ্যুদয় দেখিল, বিলীন দেখিল। কত মহা পুরুষের শ্মশান ভস্ম নীরবে ইহার দেহে মিশাইল। শেষে জীবিতেরাও মৃত হইল। কি হইলে, তাজমহল আজিও তুমি জীবিত থাকিবে? আজি আমাদের তাজমহল বলিয়া মনে করিতে পারিতাম? যদি এই মনোহর বনে সৌধের সহিত তোমাদের অক্ষয় কীর্ত্তি বিরাজিত হইত! মোগল চলিয়া গিয়াছে, হিন্দু রাজগণ,বৌদ্ধ রাজগণ, মুসলমান রাজগণ বিলীন হইয়াছেন। যেমন অতীত কাল শত শত সমাধিসহ নানা অতীত ঐশ্বর্য্যের সাক্ষী প্রদান করিতেছে। তেমনি অদৃশ্য ভবিষ্যৎ কত ঐশ্বর্য্যের মৃত্যু, রাজবংশের বিলোপ, রাজ পুরুষের অন্তর্দ্ধান গর্ভে লইয়া আমাদের নিকট সমুখিত হইবে। আর ও কত তাজমহল আসিবে, যাইবে,

তাজমহল, কি হইলে তুমি স্থায়ী হও। কি হইলে তোমার নব জীবন হয়?

যদি যখন শাহজাহানের রোগ আসিল, তখন পুত্রদিগকে না ডাকিয়া যদি প্রকৃতি-পুঞ্জকে আহ্বান করিতেন, যদি রাজ্য শাসনের জন্য এক মণ্ডলী স্থাপন করিয়া যাইতেন, যাহা যুগ যুগান্তরে নব নব ভাব গ্রহণ নব সজ্জায় সজ্জিত হইত। পুত্রগণের দুঃখের জন্য, তাঁহার কান্দিতে হইত না। রাজ্যের অমঙ্গলের জন্য, ব্যস্ত হইতে হইত না। এখানেই খাস, খানান, মন্ত্রীবর, সেনাপতি দেশ নায়কগণ বিরাজ করিত। নূতন নূতন সৌধ এইখানে বিহার করিত। নব পর্য্যায়ে নব নব দৃশ্য আগমন করিত। নব নব উন্নতি স্রোত রাজনৈতিক ধারা এখানে প্রবাহিত হইত। এখান হইতে ওয়াসিংটন জন্মিত ম্যাটসিনি জন্মিত, সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো বা নাম ধ্বনিত হইত।

সে সময়ে যদি সমস্ত সাম্রাজ্য আমি একক সম্ভোগ করিব, সমস্ত ভারতবাসিকে আমার মত মতন গঠন করিব? এই স্বার্থপরতা একজনের প্রাণে না আসিয়া চারি ভ্রাতা রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রকৃতি পুঞ্জের শাসন বিধান করিতেন, তবে এই তাজমহল, দিল্লীর দুর্গ, জুম্মা মসজিদ, সেকেন্দ্রা সকলের মনে ভারতও স্থায়ী হইত।

ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি, ভবিষ্যৎ দেখে না, যেজন্ত জীবনে মহাপাপ সঞ্চার করিয়া নিজের ভোগের জন্য সমস্ত জগৎ রাখিয়া পুত্রগণকেও দিব না, সেইজন্ত এই বিপুল সাম্রাজ্য কালে পর পদদলিত হইয়া বংশ শেষ হইল, সাম্রাজ্য ধ্বংশ হইল এবং এই বিপুল গৌরববাহী সৌধ, মৃতের সমাধিতে পরিণত হইল। জগতে যত রাজরাজেশ্বর আসিয়াছেন, সমাধি অথবা স্তূপ, মিনার অথবা স্তম্ভ তাহাদের নাম স্মরণ করাইতেছে। মৃত প্রস্তর মৃতের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছে। অথবা মহতী কীর্ত্তি মহাভারত বা রামায়ণে জীবন্ত ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে, সকলেই কালের করাল মূর্ত্তি প্রকটিত করিতেছে। কিন্তু তন্মধ্যে জীবন্ত তিনি; শব, মৃত্যুও যাহাকে বিস্মৃত হইতে পারে না। ধর্ম্মক্ষেত্রের কথা বলি না। কারণ কত মন্দির কত মসজিদ গির্জ্জা। ব্রহ্ম ও ভক্তের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, তথায় কাশর ঘণ্টা স্তোত্র বা সঙ্গীত আজীবন প্রবাহিত হইতেছে; রাজনীতিক্ষেত্রে মৃত্যু নিবারণ করা কাহার সাধ্য? কারণ ধন সম্পদই মৃত্যুকে আকর্ষণ করে, সাম্রাজ্য শত্রু শত্রুকে আহ্বান করে। এখানে যদি সম্রাটগণ প্রকৃতিপুঞ্জকে প্রজাতন্ত্র প্রদান করিতেন, তবে এক তাজমহলের পরিবর্ত্তে শত শত তাজমহল তাহাদের কীর্ত্তি গরিমা ঘোষণা করিত। ক্ষুদ্র দৃষ্টি স্বার্থান্ধ বাসনা মহত্বের কত অন্তরায়। মৃত্যু, বাসনা কামনা স্বার্থ পরতার সঙ্গেই প্রবাহিত হয়। শত শত নৃপতির বিলুপ্ত কীর্ত্তি বিলুপ্ত কাহিনী তাহা প্রচার করিতেছে। তাহা মৃতের কাহিনী অতি সুন্দর হইলেও জীবনপ্রদ নহে। মৃত সাজাহানকে কোন কথা বলা বৃথা, কিন্তু প্রথমে যাহা বলিয়াছি, সেই সব দিল্লীর নূতন সৌধ যাহা, তাজমহল, কুতুব মিনার ও অন্যান্য নৃপতিগণের কীর্ত্তির অনুকরণ করিতেছে, কালে তাহাও কি রাজা জর্জ অথবা রাজ প্রতিনিধির মৃত সমাধি হইয়া বিরাজ করিবে না? যাহাতে

তাহা না হয় সে উপায় তাহাদের হাতে বর্ত্তমান আছে এজন্যই এত কথা লিখিলাম। সমর সভায় শান্তি সংস্থাপনের জন্য প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নাম মহাশক্তিরূপে বিরাজিত। দিনিপেকদিগের অদৃষ্ট আকাশে ইউনাইটেড্‌ষ্টেটের সুন্দর পতাকা পর পর ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। এই দিল্লীর নব নির্ম্মিত সৌধ কি ভারতবাসীর চির আকাঙ্ক্ষিত স্বায়ত্ত শাসনের সাহায্য করিবে না? মৃতের মন্দির না হইয়া ইহা ভারতীর শত শত জনপদের প্রতিনিধি-গণকে ইংলণ্ডের সাহায্যে মহাভারতীয় প্রজাতন্ত্র সমিতি গঠন করিয়া উক্ত মহাত্মা-গণের নাম জগতে চিরস্মরণীয় করিতে পারিবে না? তাজমহল কান্দিতেছে, সেকেন্দ্রা কান্দিতেছে, কুতুবমিনার প্রথু রাজের রা॰সভা কান্দিতেছে। কিন্তু একদিন এই নব সৌধ হাসিবে। আয়র্লণ্ড শত চেষ্টা করিয়া পায় নাই; পরে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া আজি জগতে ধন্য হইল। ভারতের এদিন যদি ইহারা না দেন, নবজাগরণ ও ভারতের নবজীবন তাহা নিশ্চয়ই আনিবে, ও সৌধ নিশ্চয়ই সেদিন দেখিয়া হাসিবে। কিন্তু সে হাসি যদি আমাদের রাজা ও রাজপ্রতিনিধি আনয়নে সাহচর্য্য করেন, প্রেমের স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইবে। শীতল মারুত বহিবে, সুন্দর জাতীয় তরণী মনোহর পবনে পাল তুলিয়া শূন্য পথে অগ্রসর হইবে। সকল লোকে বলিবে। ধন্য রাজা, ধন্য রাজ প্রতিনিধি।

নতুবা তাহা তাজমহলের ন্যায় ঘনীভূত কবিতার মত মৃতভাবে বিরাজ করিবে। অথবা বিপ্লব ঝটিকা একদিন কত শোকাবহ ঘটনা আনয়ন করিবে; ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে!

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

কবি গোবিন্দ-সখা।

যখন অঙ্গ অবসন্ন ছিল তোমার বাতে।
শক্তি-হীন ছিল চরণ বল ছিল না হাতে।
গোবিন্দ দাস তখনো যে এসে তোমার ঘরে,
বিষাদ ভরা প্রাণের কথা বলেছে কাতরে।
তুমিই ছিলে তাহার বন্ধু ছিলে বাহুর বল,
বুঝতে তাহার প্রাণের ব্যথা মুছতে
আঁখি জল।
বাতের ব্যথায় জীবন যে যায় শুয়ে শয্যাপরে,
তবু তুমি দিবানিশি ভাবছ কবির তরে।
তোমার মত স্নেহ এত কেউত করে নাই,
তুমিই ছিলে জীবন সখা তুমিই ছিলে ভাই।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে দাস গোবিন্দের তরে,
যোগায়েছ তাহার অন্ন, এমন কেবা করে?
তোমার শিরে থাকবে সদাই বিভুর করুণ
হাত,
করবে তোমার দীর্ঘ জীবন বিধির আশীর্ব্বাদ,
গোবিন্দদাস স্বর্গে গেছে বিশ্বে সে আজ নাই,
তোমায় পেলে কবির বিষাদ একটু
ভুলে যাই।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

* কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের জীবন মরণের বন্ধু ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সভ্য মহাত্মা শ্রীযুত কামিনী কুমার সেন এম্‌, এ, বি, এল, মহাশয়ের প্রতি।

ময়ুরভঞ্জে ত্রিপুরা।

ত্রিপুরার এক রাজকুমারের উড়িষ্যায় এবং ময়ুরভঞ্জে অবস্থান বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু জগন্নাথ মহাপ্রভুর অনুগ্রহে বাঙ্গালীগণ অনেক সময়ে উড়িষ্যায় আগমন করিয়াছেন। ত্রিপুর রাজ কল্যাণ মাণিক্য উড়িষ্যা হইতে বৌদিক ব্রাহ্মণ লইয়া যান, ইহাদের অনেকে এখন ও শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরায় বাস করেন। বঙ্গ রাজ হরিবর্ম্ম দেবের মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত অনন্ত বাসুদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। যশোহরের বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়, দায়ূদ খাঁ কেরানীর সঙ্গে উড়িষ্যা আগমন করেন। আমার বোধ হয়, এই সময়ে অপর দুইজন রাজপুত্রের উড়িষ্যায় শুভাগমন হয় এবং ইহারা উৎকলের বিপ্লবে কোন কোন পক্ষে সাহায্য করিয়া যুদ্ধাদি করেন। এই দুইজন রাজপুত্র রাজা বসন্ত মানিক ও কুতবশাহী ফেরোজ সাহা। রাজা বসন্ত মানিক সম্ভবতঃ ত্রিপুর রাজ বিজয় মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কুতবসাহী ফেরোজ সাহার নাম কুতবসাহী রাজ তালিকায় পাওয়া গেল না। ইহারা গোল-কুণ্ডায় রাজত্ব করিতেন এবং সম্ভবতঃ ইনিও বসন্ত মানিক্যের ন্যায় পলাতক রাজকুমার ও এজন্য উভয়ের বিশেষ প্রণয় হয়। ফেরোজ সাহ উড়িষ্যায় গতাসু হন ও বসন্ত মাণিক তাঁহার স্মরণার্থ একটী স্তম্ভে লিপি উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই এই ঘটনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ময়ুরভঞ্জের অন্তর্গত শরডিহা পরগণায় ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এক খণ্ড প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। প্রস্তর এখন ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদার মিউজিয়মে আছে। শিলা লিপিতে উপরে নাগরী ভাষায় ও নাগরী অক্ষরে ও নিয়ে উড়িয়া অক্ষরে ও উড়িয়া ভাষায় লিপি খোদিত আছে। লিপিটীর অর্থ এই:—সম্বৎ ১৬৪৫ শাকে ১৫০১ সন ৯৯৪. সময় জ্যেষ্ঠ সুদি পূর্ণিমা ১৫ গুরু বাসরে শ্রীকুতব শাহী ফিরোজ সাহা মহা নিক্কতং। শ্রীরাজা শ্রীরাজা বসন্তজী মানিক বন্দে গো (সেলাম) আমি এই প্রস্তর তোরণে রাখিলাম যদি কেহ তোপ দ্বারা বা অন্যরূপে ইহাকে ভাঙ্গেন বা স্থানান্তর করেন তিনি মুসলমান হইলে শূকর বধের পাপী ও হিন্দু হইলে গো ব্রাহ্মণ বধের পাপী হইবেন।

এই লিপির সন ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ। ত্রিপুর রাজ বিজয় মাণিক্য ১৫৩৫ হইতে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন ইহার দুই পুত্র ছিল জ্যেষ্ঠের নাম অজ্ঞাত কনিষ্ঠ অনন্ত মানিক রাজা হইয়াছিলেন। উক্ত আছে যে একজন জ্যোতিষ গণিয়া বলিয়াছিলেন যে কনিষ্ঠ রাজ পুত্র রাজা হইবেন, এজন্য জ্যেষ্ঠকে উড়িষ্যায় নির্ব্বাসিত করা হয়। নাম ও ঘটনার সাদৃশ্য দৃষ্টে বোধ হয় যে নির্ব্বাসিত রাজকুমারই এই বসন্ত মাণিক্য। সম্ভবতঃ ইনি উড়িষ্যার কোন রাজবংশে বিবাহ করিয়া এদেশে ভব লীলা শেষ করেন। কুতব সাহী ফিরোজ সাহা ও রাজ্যলাভ দুরাশা দেখিয়া গজপতি রাম-চন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন ও অবশেষে উড়িষ্যায় সমাধিস্থ হন তাহারই স্মরণ চিহ্ন এই প্রস্তর লিপি। প্রস্তর খণ্ডের কোন ফটো লওয়া যায় নাই তবে পাঠোদ্ধার হইয়াছে। ময়ুরভঞ্জ সম্বন্ধে বাহ্যতঃ সম্পর্ক-শূন্য হেতু এখানে সকলেই এ বিষয়ে উদাসীন। আশা করি ত্রিপুরার কোন ঐতিহাসিক এ বিষয়ে কিছু অবগত থাকিলে আমাকে জানাইবেন।

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বসু।

কলেরায় কালীপূজা।

সেবার হয়নি কোথাও ধান
দুর্ভিক্ষ এলো দেশে।
গরীবের দল গণিল প্রমাদ,
ধনী কাটে কাল হেঁসে।
(শেষে) বিসূচিকা দিল দেখা
নরনারীগণ মরিতে লাগিল,
হাহাকার স্বরে গগন ভরিল,
ধনিগণ হৃদে ভয় দেখা দিল
শুকাল হাসির রেখা।
পণ্ডিতগণ করিল যুক্তি
পূজিতে হইবে মাকে;
জমীদার গৃহে মণ্ডলগণে
পেয়াদা আনিল ডেকে।
(সবে) জমীদার বলে ধীরে—
পুরোহিত মোরে ব'লেছেন আজি,
সবে মিলে যদি শ্যামা মাকে পূজি,
স্বপ্নে নাকি তিনি হয়েছেন রাজী
যাবেন চলিয়া দূরে"।
মণ্ডলগণ ত্বরায় সকলি
জানাল' সবার কাছে
মায়েরে তুষিতে দিল দীনগণ
যায় যে পয়সা আছে।
(এক) শুভ শনিবার রাতে
মহা সমারোহে হ'ল পাঁঠা বলি
ভক্তগণ নিল মা'র পদ ধূলি
প্রসাদও কেহ ত্যজিল না ভুলি;
বাড়ী গেল সবে প্রাতে।
দীনের পূজায় দীন দয়াময়ী
হ'ল না তথাপি তুষ্টা
পূজায় কি যেন হয়েছিল ভুল
তাই হল মাতা রুষ্টা।
(ক্রমে) বেড়ে গেল হাহাকার
যে যেথা মরিল সেথা সে রহিল,
শিবাদি সবার আনন্দ বাড়িল
পুরোহিত শেষে বসুধা ছাড়িল;
কাঁপে সদা জমীদার।
হঠাৎ তাঁহার সৌধে একদা
উঠিল কাঁদার রোল,
সুধাল' দ্বারীরে ভিখারী নবীন
"কিসের গো এত গোল?"

(ধীরে) দ্বারবান কহে "ভাই!
রবিতে রবিতে আটদিন পরে
বড় খোকা বাবু গিয়েছে সরে,
পরিজন সহ হাহাকার স্বরে
কাঁদিছেন বাবু তাই।"
বাবুর নিকট এসেছিল সে
একদা ওষুধ তরে
বলেছিল বাবু "গরীবের ছেলে
বিনা ওষুধেই সারে।
(আজ) নবীন ভাবিছে মনে,
"ভাবিতাম হায় প্রাণের দুলালে
ওষুধ অভাবে নিয়ে গেছে কালে
কেন ম'ল" তবে বাবুর এ ছেলে
হাজার ওষুধ দানে।
মূর্খ আমরা কখন কি যেন
করেছি ভীষণ দোষ
তাই জননীর সন্তান প্রতি
হয়েছে এমন রোষ।"
পরদিন জমীদার—
ত্যজিয়া প্রভাতে পল্লী বাটিকে
প্রবেশ করিয়া শিবিকার বুকে
চলিবার কালে কলিকাতা মুখে
পথে শেষ হ'ল' তাঁর।
যেমন যাদের দেব আরাধনা
তেমনি তাদের ফল
সোণার পল্লী হয়েছে শ্মশান
সুখী শৃগালের দল।
(হায়) এই কি পূজার ফল?
এযে নয় পূজা এযে অনাচার
এতে বাড়ে মার কলঙ্ক অপার
ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানে পূজ সবে তাঁর
শুকাবে নয়ন জল।

ধুপ দীপ পাঁঠা নাহি প্রয়োজন
মাতা চায় শুধু জ্ঞান,
মাতা চাহে শুধু কর্ম্মের মাঝে
স্বার্থ বিহীন ধ্যান॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পাট্টাদার।

জগৎ চেত্য কি চিন্ময়?

যে জগৎরূপ কমলের মূলীভূত মৃণাল মায়া বা অবিদ্যা,—সুখ দুঃখ জ্ঞান যে কমলের কেশর স্বরূপ, যাহা "একরূপ" মনোরূপ সমুদ্রেই প্রস্ফুটিত হয়, সে জগৎ চেত্য কি চিন্ময়? হায়! এ প্রশ্নের মীমাংসা কে করিবে? মানুষ ভ্রম প্রমাদের দাস, মোহান্ধকারের ঘন তিমির তাহার আত্মবিলোকন শক্তির অবরোধক। মানুষের সাধ্য কি এ সমস্যার সমীকরণ করে! তবে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের নির্ণায়ক ঋষিদের ব্যবস্থাকে অভ্রান্ত মনে করতঃ—অনুকূল তর্কের সহিত বিচারের আশ্রয় গ্রহণে যা'র যতটুকু তৃপ্তি হয়, তাহাই যথেষ্ট। অতএব বিচারের আশ্রয় গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। বিচার দ্বারা শাস্ত্রের সার ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়। পরন্তু অবগত হওয়া যায় যে :—

যাহা জানিবার বিষয় হয়,—তাহার নাম জ্ঞেয়; যাহা দেখিবার বিষয় হয়,—তাহার নাম দৃশ্য; যাহা ধারণের বিষয় হয়,—তাহার নাম ধ্যেয়;—তদ্রূপ যাহা চেতনের বিষয় হয়,—তাহার নাম চেত্য বা চেতা। যেমন জ্ঞেয় থাকিলে জ্ঞাতা, দৃশ্য থাকিলে দ্রষ্টা, ধ্যেয় থাকিলে ধ্যাতার বিদ্যমানতা অবশ্যম্ভাবী;—তদ্রূপ চেত্য বা চেতা থাকিলে চেতয়িতার বিদ্যমানতাও শঙ্কারহিত। আবার জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা থাকিলেই জ্ঞান,—দৃশ্য ও দ্রষ্টা থাকিলেই দর্শন,—ধ্যেয় ও ধ্যাতা থাকিলেই ধ্যানের বিদ্যমানতা যেমন অনিবার্য্য;—তদ্রূপ চেত্য ও চেতয়িতা থাকিলে চেতনের অস্তিত্বও অপরিহার্য্য।

আবার অন্য পক্ষে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞান থাকিতে পারে না, দৃশ্য ও দ্রষ্টার অভাবে দর্শন থাকিতে পারে না, ধ্যেয় ও ধ্যাতার অভাবে ধ্যান থাকিতে পারে না,—ইহা যেমন সর্ব্ব-সম্মত,—তদ্রূপ চেত্য ও চেতয়িতা না থাকিলে চেতনের অস্তিত্বও অসম্ভব;—ইহাও একরূপ অভ্রান্ত। তবেই দেখা গেল, যতদিন জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার অস্তিত্ব, ততদিনই জ্ঞানের জ্ঞানত্ব;—যতদিন দৃশ্য দ্রষ্টার অবস্থিতি—ততদিনই দর্শনের দর্শনত্ব; যতদিন ধ্যেয় ও ধ্যাতার বিদ্যমানতা, ততদিনই ধ্যানের ধ্যানত্ব। তদ্রূপ যতদিন চেত্য ও চেতয়িতার অস্তিত্ব,—ততদিনই চেতনের চেতনত্ব।

যেমন "ধনী সুখী"। এখানে উদ্দেশ্য হইতেছে ধনবান্ পুরুষ,—অর্থাৎ ধনী; আর বিধেয় হইতেছে ধন। যে কালে ধন থাকে, সেই কালেই তাহার (ধনবান পুরুষের) নাম ধনী হয়। ধনী বা ধনবান পুরুষও সে সময়ে ধনের সুখত্ব অনুভব করে বা সুখী থাকে। ধন না থাকিলে সে পুরুষ ধনী হয় না। ধনের সুখও অনুভব করে না। পরন্তু তাহার নাম ধনীও হয় না। অভিপ্রায় এই যে, উদ্দেশ্য বস্তু "ধনবান পুরুষ"—বিধেয় বস্তু "ধনের" সহিত সংযুক্ত না হইলে যেমন তাহার নাম ধনী হয় না এবং সে ধনের সুখত্ব অনুভব করে না,—তদ্রূপ চেত্য ও চেতয়িতা না থাকিলে চেতন বস্তুরও নাম "চৈতন্য" হয় না; পরন্তু—"চেতনের" চেতনত্বও অনুভবে আসে না।

অতএব, চেতন হইতেছে উদ্দেশ্য ;—আর চেত্য—চেত্যান্বিতা হইতেছে বিধেয়। এই উদ্দেশ্য বস্তুর যখন বিধেয় বস্তুর সহিত অন্বয় হয়,—অর্থাৎ চেতন বস্তুর যখন চেত্য-চেতন্বিতার সহিত সংযোগ হয়, তখন তাহার নাম "চৈতন্য" হয়। অন্বয়ের পূর্ব্বে উদ্দেশ্য বস্তু চেতনের কোন রূপ নামের সংজ্ঞা থাকে না; যেমন ধন না থাকিলে ধনী নাম হয় না। অন্বয়ের পূর্ব্বাবস্থা নাম সংজ্ঞা বিহীন হইলে,—সেই অবস্থা বা ভাবকে আর "উদ্দেশ্য" "চেতন" ইত্যাদি নামের সংজ্ঞায় জানা যায় না। অর্থাৎ সে বস্তুর সে ভাব তখন উদ্দেশ্য, চেতন, চৈতন্য,—পক্ষান্তরে রাম, হরি, কৃষ্ণ,—অথবা কালী, তারা, মহাবিদ্যা ইত্যাদি কোন কিছু শব্দ বাচ্য হয় না। তবেই দেখা গেল, অন্বয়ের পূর্ব্বে উদ্দেশ্য বস্তু চেতনের যে ভাব, তাহা কোন-রূপ শব্দ বাচ্যে আসে না। তখন সে ভাব অনন্ত-প্রয়োজন বিশিষ্ট, অনুপম ও শাশ্বত।

"এখানেই যত গোল"। ঐ যে অনন্ত-প্রয়োজন-বিশিষ্ট, নাম সংজ্ঞা শূন্য উদ্দেশ্য বস্তু—"চেতন"—বিধেয় বস্তু "চেত্য-চেতান্বিতার" সহিত অন্বয় যুক্ত হয়,—অর্থাৎ "সম্বন্ধ যুক্ত হয়" তাহার মূলীভূত কারণ—"অন্বয়"। অন্বয়ই সেই পরম বস্তুর পরম ভাব ভাঙ্গিয়া শব্দ বাচ্যে নানাবিধ প্রয়োজন বিশিষ্ট করে। তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে সেই "উদ্দেশ্য" পরম বস্তু কখন নাম সংজ্ঞা-শূন্য, কখন নাম সংজ্ঞা যুক্ত ইত্যাদিতে "মিশ্র দার্থবৎ" বিনাশশীল হইয়া পড়েন। এই জন্য ঐ অন্বয়কে মিথ্যাত্ব বলা হয়। কারণ,—পরম বস্তু চেতন, যিনি অক্ষয়, অপরিণামী ও সনাতন,—যিনি পূর্ণ পরব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়া বিরাট বিশ্বরূপে স্বীয় পূর্ণতার পরিচয় প্রদান করেন; তিনি "মিশ্র পদার্থবৎ" বিনাশশীল বস্তু নহেন। তাঁহার আজ এক ভাবে এক নাম, কাল ভিন্ন ভাবে অন্য নাম; এইরূপ আজ একভাবে নাম উপাধি শূন্য, কাল অন্য ভাবে নাম উপাধি যুক্ত,—কখন হইতে পারে না; বাঞ্ছনীয়ও নহে। কিন্তু অন্বয় সেই পরম ভাবকে ভিন্ন ভেদ করতঃ—দুই দুই ভাবে দ্বৈতত্বের উপপত্তি আনিয়া দেয়। কাজেই জীবের ভ্রম "অন্বয়ের বিপর্য্যাস শক্তিতেই" উপস্থিত হয়। ধন, পুত্র, দারাদিতে মদীয়ত্ব বুদ্ধি, আমি, জগৎ ও ঈশ্বরে বিভিন্ন ভ্রান্তি,—সনাতন বেদে অভক্তি ইত্যাদি সকল অনর্থই ক্রম পরম্পরায় দেখা দেয়। এই জন্য ঐ অন্বয়ের আর একটী নাম মায়া বা অবিদ্যা। অভিপ্রায় এই যে,—যে কালে যে সময়ে উল্লিখিত নাম সংজ্ঞা শূন্য পরম উদ্দেশ্য বস্তু "চেতন," বিধেয় বস্তু "চেত্য-চেতন্বিতার" সহিত অন্বিত হইয়া,—নানাবিধ নামের সংজ্ঞায় শব্দবাচ্যে নানা ভাবে প্রকাশিত হয়;—ঠিক সেই কালে সেই সময়ে ঐ নানাত্ব ভাব,—নাম সংজ্ঞাশূন্য, ভাবাভাবের অতীত, পরম স্থানের প্রতিপাদক হইয়া মিথ্যাত্ব মধ্যে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে ঐ মিথ্যার নামই মায়া, অবিদ্যা, ভ্রম, অজ্ঞান ইত্যাদি। সর্ব্ববাদী সম্মত ন্যায়ও ঠিক ঐ কথাই বলেন;—অর্থাৎ যদ্দেশাবচ্ছেদে যৎ-কালাবচ্ছেদে যাহার সত্ব,—তদ্দেশাবচ্ছেদে তৎকালাবচ্ছেদে তাহার অসত্বকে মিথ্যাত্ব বলা হয়। তবেই দেখা গেল, উদ্দেশ্য বস্তু বিধেয় বস্তুর সহিত অন্বিত হইলে, সেই অন্বয়কে মিথ্যাত্ব বলা হয়; সেই মিথ্যাত্বই মায়া, অবিদ্যা, ভ্রম ইত্যাদি।

অতঃপর স্থির চিত্তে প্রণিধানের বিষয়

আসিয়া পড়িল। অন্বয় যদ্যপি মিথ্যা, মায়া, অবিদ্যা বা ভ্রম ইত্যাদি শব্দ বাচ্য হয়; তাহা হইলে অন্বয়ের পূর্ব্বাবস্থায় এ সকল কিছুই থাকে না, বলিতে হয়। সুতরাং সে অবস্থা বা সে ভাব—অনাশ্রয়, অপ্রমেয়, অনাবিল। শ্রুতি সেই ভাবকেই "বাঙ্মনোঽতীত গোচরম্"—"নিষ্কলং"—ইত্যাদি বলিয়াছেন। তবেই জানা গেল, সে ভাব বাক্য মনের অতীত। তাহার স্বরূপ কেহ বাক্য দ্বারা বর্ণন করিতে পারে না, মনেও ধারণা করিতে পারে না; তাহা সনাতন, নিশ্চল, অচ্যুত। বোধ সৌকর্য্যার্থে আমরা এবম্ভূত পরম ভাবকে "উদ্দেশ্য"—"চেতন" ইত্যাদি নামের সংজ্ঞায় ব্যবহার দশায় আনিয়াছি মাত্র।

ভাল কথা। অন্বয় যখন মিথ্যা, মায়া, ভ্রম ইত্যাদি বস্তু স্বরূপ সাব্যস্ত হইতেছে,—তখন এই মিথ্যার সহিত উল্লিখিত পরম উদ্দেশ্য, পরম সত্য, সনাতন ভাবের কোনরূপ সম্বন্ধ বা সমানাধিকরণ্য থাকিতে পারে না। যেহেতু সমান সমান বস্তুর সহিত সমান বস্তুরই সম্বন্ধ বা মিলন অবশ্যম্ভাবী হয়। অসমান বস্তুর সহিত সম্বন্ধ, মিলন বা সমানাধিকরণ্য কস্মিন কালেও সম্ভবপর নহে। যেমন আলোকের সহিত অন্ধকার, আতপের সহিত ছায়ার মিলন বা সমানাধিকরণ্য কোন কালেও সম্ভবযোগ্য নহে। এরূপ হইলে,—অর্থাৎ উদ্দেশ্য পরম বস্তু চেতনের সহিত "অন্বয়ের" কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকিলে বা পরম বস্তু চেতন, "অন্বয়"-সম্বন্ধ রহিত হইলে,—অন্বয় নামান্তর মায়া বা অবিদ্যার অভাবে"—সেই উদ্দেশ্য বস্তুর পরম ভাব শব্দ বাচ্যে "বহুরূপে" নানা প্রয়োজন বিশিষ্ট হইতে পারে না। পরন্তু চৈত্য-চেতয়িতা, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, দৃশ্য-দ্রষ্টা ইত্যাদি ভেদমূলক বাক্য সন্দর্ভ বিভ্রম, "যাহা অন্বয়ের সাহচর্য্যেই উৎপন্ন হয়,"—আর থাকিতে পারে না। কারণ, অন্বয় "নামান্তর মায়া বা অবিদ্যাই"—উদ্দেশ্য পরম বস্তু চেতনের অদ্বয় ভাব ভাঙ্গিয়া দ্বয়স্থ করিয়া তুলে। জীব, তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে দ্বৈত দৃশ্য জাল দর্শনেই মোহিত হইয়া যায়। দুরূহ আত্মতত্ত্ব তখন আর হৃদয়ে স্থান পায় না। এবম্ভূত অন্বয়—অর্থাৎ "মায়ার" সম্বন্ধ যদ্যপি রহিত হয়,—তাহা হইলে চৈত্য-চেতয়িতা, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, দৃশ্য-দ্রষ্টা ইত্যাদি ভাব কদাচ থাকিতে পারে না। পরন্তু পৃথিব্যাদি ভূত পঞ্চও থাকে না, দৃশ্য ভাবও থাকে না, বিরাট দেহও থাকে না;—কেবল "সেই পরম উদ্দেশ্য"—এক অনির্ব্বচনীয় অভিধান চিন্মাত্রই স্বতঃ সম্ভূত হইয়া জগদ্রূপে দেদীপ্যমান থাকেন। এইরূপ উপলব্ধির কার্য্যকারিণী শক্তি সহজেই প্রতিপত্তি লাভ করে। সুতরাং তখন স্বতঃই প্রতিপন্ন হইয়া যায় যে, "জগৎ চৈত্য নহে,—চিন্ময়"।

যদি বল,—উদ্দেশ্য পরম বস্তু চেতন যদ্যপি "অন্বয়" সম্বন্ধ শূন্য হন,—তবে তুমি, আমি, স্থাবর, জঙ্গম, চরাচর ইত্যাদিতে পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি কোথা হইতে কি প্রকারে সম্পন্ন হয়? আমি, তুমি, তিনি ইত্যাদির ভেদোপলব্ধিই বা কোথা হইতে প্রতীতি-গোচর হয়? পার্থিব বস্তুর বিভিন্ন গুণ ক্রিয়া কেনই বা প্রত্যক্ষ-গোচর হয়? সত্য যেমন একটী বস্তু, তদ্রূপ মিথ্যাও একটী বস্তু বা পদার্থ বটে; অতএব মিথ্যা বস্তু বিশেষ অন্বয়ের অবস্থিতিই বা কোথায়? এই সকল সমস্যার সমীকরণ না হইলে,—"উদ্দেশ্য পরম বস্তু চেতনের সহিত অন্বয়ের

কোনরূপ সম্বন্ধ নাই,"—এই বাক্যের গৌরব-প্রসক্তি অব্যাহত থাকে না।

— ভাল কথা। কিন্তু উল্লিখিত সমস্যার ভ্রমশূন্য সমীকরণ সুদূরপরাহত। কারণ, প্রতি প্রশ্নের উত্তরে যদ্যপি বলি "হাঁ,"—তাহা হইলে একটী "না"-এর বিদ্যমানতা অবশ্যম্ভাবী হয়। আবার যদ্যপি "না"—বলি,—তাহাতেও "হাঁ"এর বিদ্যমানতা অনিবার্য্য হয়;—যেহেতু 'হাঁ' ও 'না' অখণ্ডাকার বস্তু বিশেষ। যেমন ভাব—অভাব, সত্য—মিথ্যা, ভাল—মন্দ, সু—কু ইত্যাদি এক—অখণ্ডাকার বস্তু স্বরূপ। তবেই দেখা গেল, হাঁ—না, ঠিক—বেঠিক, প্রকৃত—অপ্রকৃত, অভ্রান্ত—ভ্রান্ত,—এই সকলের অতীত স্থানে না যাইলে, কোন সমস্যার ভ্রমশূন্য সমীকরণ "যাহাকে প্র-মা জ্ঞান বলা যায়"—অসম্ভব। কিন্তু হাঁ—না, প্রকৃত—অপ্রকৃত, সত্য—মিথ্যা, ইহাদের অতীত যে স্থান,—সেখানে মন, বাক্য ও কর্ম্মের কোন অধিকার থাকে না। কাজেই সেই পরম স্থানে যাইলে, আর প্রশ্ন বা সমস্যার সমীকরণ করিবার অবকাশও থাকে না। এই জন্যই বলিতেছি, উল্লিখিত সমস্যার ভ্রমশূন্য সমীকরণ সুদূরপরাহত। জগৎ পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, আজ পর্য্যন্ত জগতের অন্তর্ভূক্ত কোন কেহই যে ঐ সকল প্রশ্নের সমীকরণে প্রমাত্ব লাভ করিয়াছেন,"—এরূপ কথা স্বীকার করিতে হইলে বাস্তবিকই ইতস্ততঃ করিতে হয়। এই জন্যই প্রথমে বলিয়াছি যে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের নির্ণায়ক মহর্ষিদের ব্যবস্থাকে অভ্রান্ত মনে করতঃ অনুকূল তর্কের সহিত বিচারের আশ্রয় গ্রহণে যার যতটুকু তৃপ্তি হয়, তাহাই যথেষ্ট। অতএব বেদাদি শাস্ত্রের সার ভাব দ্বারা যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহা এইরূপ, যথা—

ঐ অন্বয়—"নামান্তর মায়া, অবিদ্যা, ভ্রম ইত্যাদি"—সামান্য বা উপেক্ষনীয় নহে। উহার বিশ্ব-বিমোহন শক্তির এমনই চমৎকারিত্ব যে, অসুন্দরকে সুন্দর করে, অশুচিকে শুচি করে, অসত্যকে সত্য করে। এই জন্য উঁহার একটী নাম "মায়া"। পরম বস্তুর সহিত "পূর্ণ" সদ্ভাবের শক্তি না থাকায়, উঁহার একটী নাম "অবিদ্যা"। ভ্রমশূন্য "প্রমা জ্ঞান" নহে বলিয়া উঁহার একটী নাম "ভ্রম"। এইরূপ বহুরূপে উনি বহুরূপী। উনি আজ কালকার নহেন। যে অনাদি অনন্ত কাল হইতে উল্লিখিত পরম উদ্দেশ্য পরম বস্তু সিদ্ধ হইয়াছে, সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই অলক্ষিত ভাবে প্রকাশিত হইয়া ব্যবহার দশায় আসিয়াছেন। সেই দিন হইতে "উদ্দেশ্য" চেতন বস্তুর চৈতন্য বা চেতনত্বের সহিত,চেত্য—চেতয়িতা, জ্ঞেয়—জ্ঞাতা, দৃশ্য—দ্রষ্টা ইত্যাদি ভেদ প্রখ্যাপক বাক্য বিভ্রম দ্বারা, বিরাট বিশ্বরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। আমি, তুমি ইত্যাদির ভেদাভেদ, তুচ্ছ বিষয় সম্পত্তিতে মদীয়ত্ব জ্ঞান, সেই দিন হইতে অনাদি কাল প্রায় এক ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। সেই দিন হইতে ঐ অন্বয়—"নামান্তর মায়া,"—জলে তরঙ্গ, পুষ্পে সৌরভ, অগ্নিতে দাহিকাশক্তি ইত্যাদির ন্যায়,—"পূর্ণ চৈতন্য—পূর্ণ ব্রহ্ম" উদ্দেশ্য বস্তুতে নিত্য অবস্থিত। অতএব অন্বয়—অর্থাৎ "মায়া" সৃষ্ট বস্তু নহে। উহার উৎপত্তি স্বতঃ সম্ভূত ও অনিবার্য্য। যেমন অগ্নির প্রকাশে দাহিকা শক্তি, পুষ্পের ফুটন্তাবস্থায় সৌরভের প্রকাশ স্বতঃ সম্ভূত

ও অনিবারণীয়। এই অনিবার্য্য প্রকাশ-ধর্ম্মী অন্বয়, নিজে অনিত্য ও নশ্বর ;—তথাপি সত্য ও সারবান্ রূপে প্রতিভাত হয়। উহার শক্তি সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত। কেবল মাত্র প্রমা জ্ঞানেই—"আতপ সংস্পর্শে ছায়ার ন্যায়"—উহার সারত্ব লোপ পায়।

জগৎ ঐ অন্বয়ের বিপর্য্যাস শক্তি বিশেষ। অন্বয়ের অভাবে জগৎ থাকে না, আর জগৎ থাকিলে অন্বয়ের অবস্থিতিও লোপ হয় না। অর্থাৎ "অন্বয় ও জগৎ" অখণ্ডাকার বস্তু বিশেষ ; একটীর অভাবে অপরটীর বিদ্যমানতা অসম্ভব। অভিপ্রায় এই যে,—অন্বয়ের অবস্থিতিও অনাদি অনন্ত কাল আছে,—আর জগতের অস্তিত্বও অনাদি অনন্ত কাল আছে। তাহাকে মায়াই বল, আর অবিদ্যাই বল,—অথবা ভ্রমই বল, আর অজ্ঞানই বল,—কিম্বা মিথ্যাই বল, আর অনিত্যই বল ; একবারে উড়াইবার নহে। যেহেতু ভাব রূপে প্রতীয়মান হয়। সৎস্বরূপও বলা যায় না ;—যেহেতু জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়। অসৎ পদার্থও হইতে পারে না ; যেহেতু উপলব্ধিজনিত জ্ঞান নিবারিত হইবার নহে। সুতরাং সৎ ও অসৎ, ভাব ও অভাব পদার্থ হইতে অত্যন্ত যে বস্তু,—সেই অনুপলভ্যমান বস্তুর প্রতিবিম্ব, ভাব বা নিয়ামকত্বই,—অন্বয়, মায়া, অবিদ্যা ইত্যাদি উপাধির বিষয়ীভূত হয়। উপাধিশূন্য পদার্থই শান্ত, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন ও অদ্বিতীয়। তাঁহার মহিমায় এই নাম রূপ জগতের সত্তা বোধ হয় বা জগতোন্মেষক বিকাশ সমুত্থিত হয়। অতএব যাহার উপাধি আছে বা যে বস্তু কোন না কোন নামে বা গুণে জড়িত আছে, সে বস্তু সেই বিকাশময় অবস্থার উন্মেষ মাত্র। সেই বিকাশময় অবস্থাই সূক্ষ্ম, মধ্য, স্থূল বা সত্ত্ব, রজঃ, তম,—এই ত্রিবিধ কল্পনায়—জগৎ আখ্যায় আখ্যায়িত হয় ; ইহাকেই মায়া, অবিদ্যা, ভ্রম, অন্বয় ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

শ্রুতি বলেন, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"—অর্থাৎ পূর্ণ পর ব্রহ্ম পরমেশ্বর (ইন্দ্র) মায়া দ্বারা—অর্থাৎ মায়া কল্পিত বিক্ষেপ-শক্তি দ্বারা বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া "পুরুরূপ"—অর্থাৎ বহু আকারে প্রকাশিত হয়েন। অতএব পূর্ব্বাপর আলোচনা এবং শ্রুতি তাৎপর্য্যের সারভাব দ্বারা জানা যাইতেছে যে, জগৎ নামক বস্তুটী, অন্বয়—নামান্তর মায়ারই বিপর্য্যাস শক্তিবিশেষ। এই অন্বয় রূপী মায়াই—সংসার রূপ বিশাল সমুদ্রের বিশালতা বর্দ্ধিত করি। অনাদি অনন্তকাল স্থাবর, জঙ্গম, চরাচর, জীব, জন্তু, প্রাণী মণ্ডলীরূপ প্রবাহ ছুটাইতেছে। তুমি, আমি ইত্যাদির ভেদোপলব্ধি,—বস্তুর বিভিন্ন গুণ ক্রিয়া,—সত্য পদার্থে মিথ্যাত্ব জ্ঞান,—এ সকল মায়ারই প্রহেলিকা মাত্র। মায়ার শক্তি চমৎকারিত্বেই জীবের আত্মজ্ঞান প্রতিহত,—অনন্ত সত্যবস্তু লুক্কায়িত,—আর অহমিকার প্রভাব অব্যাহত। এই মায়ার অপর পারেই,—অর্থাৎ মায়ারূপ সংসার-সমুদ্রের পর পারেই উপাধিশূন্য পরম উদ্দেশ্য পরম বস্তু "পূর্ণ চৈতন্য বা পূর্ণ ব্রহ্মের" পরম পদ।

ঐ পরম পদের আশ্রয়ে দাঁড়াইলে বা একমাত্র আশ্রয়ণীয় বোধে তাঁহার স্বরূপ চিন্তায় মনোনিবেশ করিলে,—চেত্য—চেতয়িতা, জ্ঞেয়—জ্ঞাতা, দৃশ্য—দ্রষ্টা ইত্যাদির সকল খেলাই অস্ত হইয়া যায়। পরন্তু

তখন সহজেই বোধগম্য হইয়া যায় যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ,—একমাত্র অচিন্ত্যরূপী, অপ্রবুদ্ধ, সচ্চিদানন্দময় পরম উদ্দেশ্য পরম বস্তুর প্রাতিভাসিক মনোবিলাস মাত্র। মনোবিলাস ক্ষয় পাইলেই, "ব্রহ্মৈব সর্ব্বং"—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—"ইত্যেকমেবং পরংব্রহ্ম বিভাতি"। সুতরাং তখন আর বুঝাইতে হয় না যে, "জগৎ চেত্য নহে—চিন্ময়"।

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।

প্রাচীন ভারতে জাতি বিভাগের উৎপত্তি ও তাহার প্রসার। (শেষ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অতএব দ্বাদশ মন্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা এইরূপ:—

"ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণজাতিঃ অস্য পূর্ব্বোক্তস্য বিরাট পুরুষস্য বিরাট নাম্নঃ আদি মানবস্য মুখং ইব আসীৎ ইতি শেষঃ। যথা দেহেষু মুখমেব উত্তমাঙ্গতয়া শ্রেষ্ঠতমং তথা বর্ণেষু ব্রাহ্মণ এব শ্রেষ্ঠতম আসীৎ তেন মুখেন সহ তস্য উপমা প্রদত্তা। অস্য বিরাট পুরুষস্য বাহু বাহুদ্বয়ং কিম্ভূতাং ? বাহুদ্বয়ং রাজন্য কৃতঃ। যথা বাহুবলেন সর্ব্বং সুরক্ষিতং ভবতি তথা রাজন্যোঃ দেশস্য রক্ষকা আসন তেন উৎপ্রেক্ষাচ্ছলেন নিগদিতং বাহুরেব রাজন্য ক্ষত্রিয়ঃ কৃতঃ জাতঃ। অস্য বিরাট পুরুষস্য যদ্ যৌ উরূ উরূদ্বয়ং তৎ তৌ এব বৈশ্য বণিক কৃষকস্ত্র। যথা লোকঃ উরূ নির্ভরেণ দণ্ডায়তে গমনাগমনাদিকঞ্চ করোতেব্য তথা বৈশ্যজাতিরপি কৃষিবাণিজ্য গোরক্ষাদিনা সমাজস্য জীবিকা নির্ব্বাহং সম্পাদয়তি তেন উরূভ্যাং সহ বৈশ্য জাতি স্তলনী কৃতা। যথা অঙ্গেষু পদদ্বয়ং এব নিকৃষ্টং জঘন্যং তথা বর্ণেষ্বপি বিদ্যাবত্তাদিরাহিত্যাৎ শূদ্রোজাতি নিকৃষ্টা এব তেন হেতুনা বিরাট পুরুষস্য পদ্ভ্যাংসহ শূদ্রোজাতিরূপমিতা ন পুন বিরাট পুরুষস্য পদ্ভ্যাং শূদ্রাঃ সমুদ্ভূতা এব কদ্যাপি মুখ নাসিকাদিভ্যঃ কাচিৎ বর্ণঃ কাচিৎ জাতি বা ন উৎপদ্যতে এব নৈতৎ সম্ভবত্যেব চ যুক্তি বিরুদ্ধত্বাৎ।

'অতএব পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত' ইত্যত্র পদ্ভ্যাং পাদৌ (বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ—ব্যত্যয়ো বহুল মিতি পাণিনিঃ)।

শূদ্রঃ শূদ্রজাতি অজায়ত অভূৎ। নিকৃষ্টাঙ্গ পাদদ্বয়বৎ শূদ্রজাতিরপি সমাজে অপকর্ষং গতা ইতি ভাব। সর্ব্বে মানবা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদয়ঃ আদিমানবাৎ বিরাট পুরুষাৎ সমুৎপন্নাঃ সর্ব্বে তস্য এব অন্তরবংশাঃ তেন মুখাদিভিঃ সহ সর্ব্বজাতিনামুপমা প্রদত্ত ইতি তাৎপর্য্যাৎ।"

উপরিদ্ধৃত ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। ইহা হইতেই আপনারা বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে, মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি ১১শ মন্ত্রের উত্তর দানকালে রূপকচ্ছলে (allegorically) ১২শ মন্ত্র উত্তর দিয়াছেন।

বর্ণ বা জাতি সর্ব্বব্যাপী মহান ঈশ্বরের মুখাদিপ্রবভ ইহা যুক্তি ও বিবেকের ঘোর পরিপন্থী। পরম ন্যায়বান ভূমা পরমেশ্বর আমাদের সাধারণ পিতা ও পালয়িতা। তাঁহার

রাজ্যে পক্ষপাতিত্ব নাই ও কৃষ্ণ ও শুক্লভেদে মুখাপেক্ষা নাই। তিনি তাঁহার সন্ততি মনুষ্যগণকে কেন চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করিবেন? "আকৃতি গ্রহণাজ্জাতি" যাহাদের আকার একরূপ তাহারা একজাতীয় পদার্থ। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে কি দৈহিক যন্ত্রাদির ও শোণিতের বা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কোন পার্থক্য আছে?

অবশ্য এ জগতে পণ্ডিত ও মূর্খ, ধনী ও দরিদ্র এবং রাজা ও প্রজা এই প্রকৃতিবিরুদ্ধ দ্বন্দ্ব পদার্থগুলি বিরাজমান রহিয়াছে। যে দিন সকল মানুষ সমান বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেই দিন হয় ত আসিবে আসিবে করিয়া আর আসিবে না। ইলবার্ট বিলের ন্যায় অর্দ্ধপথে রাধাচক্রে ঠেকিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। তবে পণ্ডিত ও মূর্খ, ধনী ও দরিদ্র, রাজা ও প্রজা এই পদার্থগুলি জন্মগত নহে, পরন্তু গুণ ও কর্ম্মগত। তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, "জাতি মাত্রেণ কিং কশ্চিৎ পূজ্যতেহন্ত্যতেহপি বা ব্যবহারং পরিজ্ঞায় পূজ্যতেহন্ত্যতে থবা। যাহা হউক, মহোচ্চ সাধনের জন্যই প্রাচীন ভারতের চাতুর্ব্বর্ণ প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এই কল্যাণকর প্রথার সদুদ্দেশ্য সমূলে বিনষ্ট হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, ইহাতে আমরা যে লাভবান হইতে পারি নাই, পরন্তু ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছি তাহা মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিশদাক্ষরে বিবৃত করিয়াছেন—

Caste reserved some preveleges for priests and some preveleges to warriors, in ancient times but never divided and dis-united the Aryan people * * * They felt that they were one nation and one race, received the same religious instructions, possessed the same literature and traditions, ate and drank together intermarried and held social communion in all respects and were proud to call themselves the Aryan race against the conquered aboriginies. Caste in modern times has cut up the Aryan people into scores of communities has opened the gulf of race distinctions amongst the different communities, has interdicted marriages and social communion amongst them, has starved the sons of the ancient Vaisyas,—the entire body of the people,—of religious knowledge and literature, and has degraded them to the rank of Sudras."

—*History of Ancient India*

page 169 and 170.

মহাত্মা ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উক্তি যথার্থ কি না তাহা দেশের প্রকৃত হিতৈষী ও সমাজতত্ত্বজ্ঞগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। আমরা সংক্ষেপে প্রাচীন ভারতের গুণ ও কর্ম্মানুসারে যে জাতি বিভাগ প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিলাম।

শ্রীললিতমোহন রায়।

উদ্ভিদের চেতনাশক্তি।

সৃষ্টপদার্থ শৃঙ্খলে, উদ্ভিদ্, চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত; সুতরাং উদ্ভিদের যে কিছু চেতনা আছে তাহা সহজেই বুঝা যায়; তবে ঐ চেতনার পরিমাণ এত অল্প যে তাহা আমাদের চিন্তার অগোচর না হইলেও স্থূল বুদ্ধির অগোচর বটে। ডাক্তার, সার, জগদীশচন্দ্র বসু F. R. S. মহোদয়ের, এই বিষয়ে, আবিষ্কৃত তত্ত্বের মৌলিকত্ব পৃথিবীর সুসভ্য দেশের বৈজ্ঞানিকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীন কালে, জীবহিংসা বর্জ্জনাভিপ্রায়ে, তজ্জন্য অনেক মুনি তপস্বী বৃক্ষের স্খলিত পত্র ও ভূতলে পতিত নীবার ধান্যের অন্ন ভক্ষণ করিতেন। যদিও উদ্ভিদের চেতনা থাকা তাঁহারা জানিতেন, তথাপি তাহা সাধারণ লোকের বাহ্যেন্দ্রিয়ের অতীত বিষয় বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু ডাক্তার সার্ জে, সী, বসু মহোদয়ের বহু অধ্যবসায় ও চিন্তা দ্বারা যে সকল যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাদের সাহায্যে ঐ বিষয়টী লোকের বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইয়াছে।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও স্পন্দন এত অল্প যে তাহা সহজে বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয় না। সার্ বসু, পূর্ব্বে যে একটী যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, তদ্দ্বারা উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও স্পন্দন ১০ সহস্র গুণ বৃদ্ধি ও আপনাপনি অঙ্কিত হইয়া লিপিবদ্ধ হইত। কিন্তু তৎপর কতকগুলি 'লিভার' (lever = ঢেঁকিকল) পরম্পরার সুকৌশল-সম্পন্ন সংস্থান দ্বারা ঐ যন্ত্রের শক্তি তিনি এই পরিমাণ বৃদ্ধি করেন যে, তদ্দ্বারা ঐ স্পন্দন অঙ্কনের দ্রুততা স্পন্দনের ১০ কোটী গুণ বৃদ্ধি পায়। এই যন্ত্রের নাম, তিনি "ম্যাগনেটিক ক্রেস্কোগ্রাফ্" Magnetic Crescograph = শরীরবৃদ্ধি মাপলিপিকারক চৌম্বকিক যন্ত্র) রাখিয়াছেন। ইহার সাহায্যে, বিখ্যাত "ডার্বী"-ঘোড়দৌড় বাজি-বিজয়ী দ্রুততম অশ্বের গতির তুলনায়, শামুকের মন্দ গতিও, মেঘের বিজলীবৎ বোধ হয়। একটী শামুকের মন্দগতি যদি ১০ কোটী গুণ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে এক ঘণ্টা কাল মধ্যে শামুক ৪ বার পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আসিতে পারে। তিনি ঐ যন্ত্রের শক্তির মাত্রা কমাইয়া, উদ্ভিদের বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, কি অনুভূতির উপর, নানা প্রকার উত্তেজক দ্রব্যের ক্রিয়া আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ইহাও সত্য বটে, যে অতি অল্প সংখ্যক স্থলে ঐ যন্ত্রের সাহায্য না লইয়াও, সাধারণ প্রাকৃতিক উত্তেজনার ক্রিয়াজ্ঞাপক স্পন্দন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ফরিদপুর জেলার, গোয়ালন্দ মহকুমার রাজবাড়ী ষ্টেশানের ৫ মাইল দক্ষিণ বাঘিয়া এরেণ্ডা নামক গ্রামে একটী খর্জ্জুরবৃক্ষ প্রদোষকালে মস্তক অবনত করত উষাকালে মস্তক উত্থিত করিত; বৃক্ষটী যেন কোনও শাপভ্রষ্ট সূর্য্যোপাসক সাধক, পাপক্ষয়জন্য অবনীতলে বৃক্ষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে নানা স্থান হইতে লোকসমাগম হইতে লাগিল; তাহাদের অনেকে ঐ গাছের পূজা দিতে ও মানসিক দ্রব্য উপহার দিতে লাগিল! ডাক্তার বসুর নিকট এই সংবাদ পৌঁছায়, অনেক চেষ্টার পর তিনি

ঐ গাছের মালিক সেবাইতকে বাধ্য করিয়া, তাঁহার যন্ত্রটী, একটী সুদীর্ঘ সূত্র দ্বারা, ঐ বৃক্ষের কাণ্ডের সঙ্গে সংযোজিত করিয়া দেন। বৃক্ষটী বহুদিন পূর্ব্বে ঝড়ে হেলিয়া পড়ে এবং তদবস্থায়ই থাকে। ডাক্তার বসু দেখিতে পান, বৃক্ষটী এক গজ পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া ঐরূপ উঠা নামা করে; এবং ঐ গতির বল মাত্রা এই পরিমাণ ছিল যে, তদ্দ্বারা একটী মনুষ্যকে মৃত্তিকা (=ভূপৃষ্ঠ) হইতে উত্তোলিত করিতে পারা যায়। তিনি আরও দেখেন যে, বৃক্ষটী ঐরূপ উপর নীচ করায় যে একটী বৃত্তাংশের পরিধি রেখা অঙ্কিত হয়, তাহার সঙ্গে দৈনিক তাপাঙ্কের কল্পিত বক্র রেখার (curve of the daily temperature) প্রায় মিল হয়।

ডাক্তার বসুর আবিষ্কারের মূলতত্ব এই যে, সমস্ত উদ্ভিদেরই চেতনাজনিত অনুভূতি-শক্তি আছে এবং তাহা তাঁহার উদ্ভাবিত জটিল যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন আমাদের জ্ঞানগোচর হইতে পারে না। তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, উদ্ভিদেরাও নিদ্রা যায়; একই উত্তেজক দ্রব্য প্রয়োগে, মধ্যাহ্নকাল অপেক্ষা, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে, তাহাদের স্পন্দন অল্প দৃষ্ট হয়; শীতকালে তাহারা বাড়ে না, মূষিকের ন্যায় নিস্পন্দ অবস্থায় থাকে। উগ্র উত্তেজক দ্রব্যের ক্রিয়ায়, স্নায়বিক অবসাদ জন্মাইয়া, ইহাদের জীবনীশক্তি খর্ব্ব করিতে, কখন বা উত্তেজিত করিতেও দেখা যায়। প্রৌঢ় ব্যক্তি প্রেমের রসায়নবৎ পরিবর্ত্তক গুণে যেরূপ উৎফুল্ল হয়, বার্দ্ধক্যোন্মুখ ক্ষয়ের অবস্থায়, উত্তেজক দ্রব্য প্রয়োগে, উদ্ভিদেরও তদ্রূপ পুনর্যৌবন প্রাপ্তিবৎ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ইহাতে অনেকের মনেই চ্যবনপ্রাসের কথা উদয় হইতে পারে। এইরূপ, যে সকল বিষ কোনও উদ্ভিদের পক্ষে প্রাণনাশক, তাহা পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগে, তাহার জীবনীশক্তির উত্তেজনা করে এবং তদ্দ্বারা উদ্ভিদ, কীটাদি শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্য শরীরে সুরাসারের ক্রিয়াও প্রায় তদ্রূপ লক্ষিত হয়। উদ্ভিদের স্বাস্থ্য বা শারীরিক অবস্থানুসারে, একই বিষের সমান মাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া দেখা যায়। ডাক্তার বসু, দুই প্রস্থ নূতন চারা উদ্ভিদ লইয়া পরীক্ষা করেন; কৃত্রিম উপায়ে, এক প্রস্থের সজীবতা স্বাভাবিক অবস্থার উপর বৃদ্ধি, ও অপর প্রস্থের সজীবতা স্বাভাবিক অবস্থার নীচে হ্রাস করিয়া, তিনি উভয় প্রস্থে, একমাত্রা পাতলা বিষ প্রয়োগ করেন; তাহাতে তিনি দেখিতে পান যে, দুর্ব্বল প্রস্থ শীঘ্রই মরিয়া গেল, কিন্তু সতেজ প্রস্থ বৃদ্ধি পাইল।

এইরূপ, দেখা যায়, একজনের খাদ্য, অপর ব্যক্তির পক্ষে বিষ-স্বরূপ। তিনি, সুরাসার বাষ্পে আস্তে আস্তে, লজ্জাবতী লতার মত্ততা জন্মাইয়া দেখেন যে, তাহার আচরণ, মদ্যপায়ী মাতাল মনুষ্যের আচরণ অপেক্ষা কোনও অংশে বিভিন্ন নয়। যদিও ইহা মাতালের ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া মাটিতে গড়াগড়ি যায় না, তথাপি তাঁহার স্পন্দন-জ্ঞাপক যন্ত্রের সাহায্যে মত্ততার অবস্থা অঙ্কন দ্বারা লিপিবদ্ধ হওয়ায়, ঐ মত্ততা প্রকাশ পায়। ঐ মত্ততার অবস্থায় কখন স্ফূর্ত্তি এবং কখন অমুত্তাপসূচক অবসাদ ভাব ক্রমান্বয়ে পর পর লক্ষিত হয়; টাটকা বিশুদ্ধ বায়ুর ঝাপ্টা প্রদানে, ইহা পুনর্ব্বার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যাবস্থা ধারণ করে।

ডাক্তার বসুর উক্ত "ম্যাগ্‌নেটিক্ ক্রেস্কোগ্রাফ্" যন্ত্রের সাহায্যে, উদ্ভিদ বৃদ্ধি

এক ইঞ্চের ১০ কোটী ভাগের ৪ ভাগ পর্য্যন্ত, এক সেকেণ্ড কালের একশত ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও ন্যূন সময়ের মধ্যে ধরিতে পারা যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি স্থির করিয়াছেন যে, বেদনাদায়ক উত্তেজনা জন্মানে; বৃদ্ধি স্থগিত করে, বা বৃদ্ধির বিলম্ব সংঘটন করে; কঠিন আঘাতে, উদ্ভিদের বৃদ্ধির মাত্রা অর্দ্ধেকে পরিণত হয়; এবং ঐ আঘাতের ঝোঁক সংবরণ করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইতে তাহার একঘণ্টা সময় লাগে। একটা আল্‌পিন্ কি সূচের খোঁচায় উদ্ভিদের বৃদ্ধির পরিমাণ এক তৃতীয় অংশে পরিণত করে এবং ঐ ক্ষতযুক্ত উদ্ভিদ্ অনেক সময় যাবৎ অবসন্ন থাকে, কারণ, আমাদের ন্যায় উদ্ভিদেরও স্নায়বিক অনুভূতির যন্ত্র আছে। আসন্ন-মৃত্যু-প্রাণীগণ যেরূপ যন্ত্রণায় চট্‌ফট্ করে ও তাহাদের শরীরে খেঁচুনী উপস্থিত হয়, ডাক্তার বসুর পরীক্ষায়, উদ্ভিদেরও মৃত্যু সময়ে সেইরূপ অবস্থা দৃষ্ট হয়। একটী উদ্ভিদের চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুর তাপাঙ্ক বৃদ্ধি করিলে, ঐ উত্তাপ বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়াদ্বারা, ডাক্তার বসুর যন্ত্রে অঙ্কিত বক্র রেখাটীর উচ্চতাও কিছু সময় জন্য বৃদ্ধি পায় এবং তৎপর ১৪০ ফাঃ তাপাঙ্ক না পাওয়া পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ঐ উচ্চতা হ্রাস হইয়া নামিয়া পড়ে এবং তৎপর তাহা হঠাৎ ঊর্দ্ধদিকে উঠে; তখন উদ্ভিদ্‌টী প্রকৃতপক্ষে প্রাণত্যাগ করে এবং তখন কোনও রূপ উত্তেজনা প্রয়োগেও তাহার স্পন্দন পাওয়া যায় না। ডাক্তার বসু, একটী "গ্লাস্ কেস্" মধ্যে অতি যত্নের সহিত একটী লজ্জাবতী লতাকে রাখেন, যে বাহিরের কোনও আঘাত তাহার গাত্রে না লাগে; তাহাতে ঐ উদ্ভিদ্‌টী হৃষ্ট পুষ্ট, বর্দ্ধিষ্ণু ও সুশ্রী হয় কিন্তু তাহাতে কোনও উত্তেজনারই ক্রিয়া লক্ষিত হয় না এবং তাহার স্পন্দনও পাওয়া যায়না; যত্নের সহিত সুরক্ষিত হওয়ায়, ইহা অবশাঙ্গ হইয়াছিল, যেন মেদ বৃদ্ধি হেতু স্থূলকায় মনুষ্যের ন্যায় অকর্ম্মণ্য। ডাক্তার বসু, ইহাকে পুনঃ পুনঃ আঘাত প্রদান করিয়া, অবশেষে ইহাকে পূর্ব্ববৎ চটপটিয়া করেন।

ডাক্তার বসু, তাঁহার কলিকাতায় বিজ্ঞান মন্দিরের (Science Institute) কয়েকটী প্রাচীন বৃক্ষকে, প্রথমতঃ সংজ্ঞাহারক দ্রব্য (anœsthetics) প্রয়োগে বেদনাবোধ শক্তিহীন করিয়া, সমূলে উৎপাটন করত স্থানান্তরে রোপণ করেন; তাহাতে ঐ বৃক্ষগুলি নূতন স্থানে লাগিয়া যায়। উদ্ভিদকে একস্থান হইতে উঠাইয়া স্থানান্তরে রোপণ করিতে প্রধান প্রতিবন্ধক এই যে, স্থানান্তরকরণে তাহা যে স্নায়বিক আঘাত প্রাপ্ত হয়, অনেক সময়ে তাহার চোট্ সংবরণ করিতে না পারায় মরিয়া যায়, কারণ প্রাণীগণের ন্যায় উদ্ভিদেরও স্নায়বিক বেদনা আছে।

ডাক্তার বসুর আবিষ্কার দ্বারা কৃষিকার্য্যেরও যথেষ্ট উপকার হইবে। যেমন কোনও খাদ্য শস্যের ফসলের উপর কোন্ সার কিরূপ কার্য্য করে তাহা পরীক্ষার্থ ফসল সংগ্রহ সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া, ঐ যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময় মধ্যেই জানা যাইবে। ডাক্তার বসু এই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে সকল দ্রব্য অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উদ্ভিদের পক্ষে বিষ স্বরূপ হয়, তাহারাই আবার অল্প মাত্রায় প্রয়োগে বলকারক দ্রব্যের ন্যায় কার্য্য করে। যখন, দ্রব্যগুণে কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভিদের নিদ্রাকর্ষণ করা যায়, তখন উদ্ভিদ

কোনও অস্বাভাবিক প্রতিকূল অবস্থা সংঘটন হওয়া বুঝিতে পারে এবং শরৎ কালের পরিবর্ত্তে গ্রীষ্ম কালেই ইহার পত্র সকল ঝরিয়া পড়িতে থাকে। ঐ নিদ্রাকর্ষক দ্রব্য প্রয়োগে উদ্ভিদ সংজ্ঞাহীন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে এবং তাহা অভ্যাসে পরিণত না হইলে, ঐরূপ অবস্থা ঘটে, কারণ, ঐরূপ নিদ্রালুতার ভাব অল্পকাল স্থায়ী হওয়ায়, উদ্ভিদ্ শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহার দ্বারা, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীগণের মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

যে সকল প্রাণী দীর্ঘকাল অচেতন অবস্থায় জীবিত থাকিতে পারে, তাহাদিগকে বিষাক্ত দ্রব্য মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলেও তাহারা মরে না। সেই রূপ দ্রব্যগুণে সংজ্ঞাহীন করা বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটন করিয়া স্থানান্তরে রোপণ করিলেও তাহাদের কোনও ক্ষতি হয় না। বরফে জমাট একটী "লাল মাছ"কে (Gold fish) জীবিত অবস্থায় যেরূপ পৃথিবী পর্য্যটন করাইয়া আনা যায়, সেই রূপ মৃৎপিণ্ডে শিকড়াবৃত উদ্ভিদকেও মাঠ হইতে বাগানে লইয়া যাইয়া রোপণ করা যাইতে পারে। উদ্ভিদের তন্তুজাল সকল (tissues) প্রাণীগণের হৃৎপিণ্ডের ন্যায় কার্য্য করে। উত্তেজক দ্রব্য প্রয়োগে আসন্নমৃত্যু উদ্ভিদকে পুনঃ সঞ্জীবিত করা, ও তন্দ্রায় তন্দ্রালু করা যায়।

ডাক্তার বসু বলেন, "অনুভূতিশক্তির মাত্রা নির্ণয় করিতে বাহ্যিক আঘাতের ন্যায়, ইচ্ছাশক্তির আভ্যন্তরীণ উত্তেজনার (stimulus) ক্রিয়াও প্রধান একটী ধর্ত্তব্য বিষয় এবং তজ্জন্য, স্নায়ুর (nerve) আভ্যন্তরীন্ আণবিক্ সংস্থিতিকে আয়ত্তাধীন করিলে, যে অনুভূতি উৎপন্ন হয়, তাহার প্রকৃতি অনেক পরিমাণ পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। বাহ্য প্রকৃতি অত্যধিক মাত্রায় অনুভূতির নিয়ন্ত্রী নয় এবং মনুষ্যও এখন আর ভাগ্যের হস্তে খেলার পুতুল নয়। পূর্ব্বে যে সকল অস্পষ্ট বার্ত্তা (message) অনমুভূত ভাবে মনুষ্যের নিকট দিয়া চলিয়া যাইত, সেই সকল এখন ধৃত করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে; কিম্বা, মনুষ্য বাহ্য জগৎ হইতে নিজকে অন্তর্জগতে, অর্থাৎ তাহার নিজের ভিতরে লইয়া যাইতে পারে; তাহা হইলে, বহির্জগতের কোলাহল ও দ্বন্দ্ব পূর্ণ ভাব সকল তাহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে না।"

ডাক্তার বসুর এই সকল পরীক্ষায়, আমাদিগকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের অকৃত চিহ্নিত সীমান্ত রাজ্যে উপনীত করে। ইহার দ্বারা এই গুহ্য রহস্যও প্রকাশ পাইতেছে যে, সমস্ত প্রাণই এক, এবং সেই একই বিশ্বপ্রাণের প্রবাহোর্ম্মি নানা আকার ধারণ করিয়া প্রতিনিয়ত ধাবমান হইতেছে।

প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণও তাহাই বলেন;—

"সর্ব্বমিদং খলু ব্রহ্ম" এবং ব্রহ্ম চৈতন্যময়। "লর্ড কেল্‌ভিন্" (Lord Kelvin) বিজ্ঞান শাস্ত্র মন্থন করিয়া স্থির করিলেন "Matter is the vortex of energy." (শক্তির আবর্ত্তনচক্রের বিকাশই জড় পদার্থ)। আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের "energy" প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকদের "শক্তি"। অনেক দার্শনিকগণ শক্তিকে "প্রকৃতি" এবং ব্রহ্মকে "পুরুষ" বলেন। আবার, এই নির্ব্বিকার পুরুষের সৃষ্টির ইচ্ছাকেই—বিকৃতিকেই—পুরুষার্থ প্রবর্ত্তিনী "প্রকৃতি" আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং

দেখা যায়, এক চৈতন্যময় পুরুষই একমাত্র সত্তা ও প্রাণ এবং অদ্বৈত জড়বাদের কোনও ভিত্তি নাই।

এখন "ক্রেস্কোগ্রাফে"র বিষয় সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধটী শেষ করা যাইবে।

মোম মার্জিত একটী সূতা দ্বারা একটী পত্র কি পল্লব বাঁধিয়া সেই সূত্রের অপর প্রান্ত একটী লম্বা চুম্বক সূচের এক প্রান্তে সংযুক্ত থাকে। ঐ সূচটী এরূপ ভাবে ধৃত থাকে যে, ঐ সূত্রটী না থাকিলে সূচের ঐ প্রান্তটী পড়িয়া যাইত। ঐ সূচের অপর প্রান্তে খাড়া ভাবে দুইটী চুম্বক আছে; ঐ চুম্বক সূচী কিঞ্চিৎ স্পন্দিত হওয়ামাত্রই চুম্বক দুইটী ঘুরিতে থাকে। চুম্বক দুইটীর পশ্চাৎ ভাগে এক খণ্ড ক্ষুদ্র আয়না আছে; ঐ আয়নায় আলোকরশ্মি পতিত হইলে, সেই রশ্মি, 'ম্যাজিক্ ল্যাণ্টার্ণে'র (Magic Lantern = ছায়াবাজি) "লেন্স" (lens) (কুব্জপৃষ্ঠ কাচখণ্ড) এবং একটী লেন্সের ভিতর দিয়া একটা পর্দ্দার উপর প্রতিফলিত হয়।

যখন উদ্ভিদ্ বৃদ্ধি পায়, তখন ঐ সূচটী পড়িয়া যায়। উদ্ভিদ্ বৃদ্ধির ঐ গতি এত অল্প যে, অত্যধিক শক্তিসম্পন্ন অণুবীক্ষণ দ্বারা তাহা অনুভব করা যাইতে না পারিলেও তদ্দ্বারা ঐ ক্ষুদ্র চুম্বক এপাশ ওপাশ দুলিতে থাকে এবং তাহাতে চুম্বকের পশ্চাৎ ভাগস্থ আয়নাও আলোড়িত হইতে থাকে; তখন সেই পর্দ্দার দিকে তাকাইলে দেখা যায়, একবিন্দু আলোক পর্দ্দার উপর একবার এদিক আরবার ওদিক দুলিতেছে এবং ঐ গতিশীল আলোকবিন্দুই উদ্ভিদ্ বৃদ্ধি গতি-জ্ঞাপক। *

শ্রীগুরুগোবিন্দ পাট্টাদার।

* মন্তব্য। ডাক্তার, স্যর্ জে. সী. বসু, F. R. S. সম্প্রতি বিলাতে যে সকল বক্তৃতা দেন তাহার সমালোচনা তথাকার কোনও কোনও পত্রিকায় বাহির হয়; সেই সমালোচনা এদেশেও ঐ সকল পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হয় এবং তাহা অবলম্বনে বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। সুতরাং "তিন নকলে আসল খাস্তা" হওয়া অসম্ভব নয়; তৎপর, অনুবাদ দ্বারা জটিল বিষয়ের সরলতা সম্পাদনও সহজ ব্যাপার নয়। —লেখক।

উদ্বোধন।

(১)

এ কি রে জড়তা মহাপাপ প্রায়
আসিয়া ঘিরেছে এই বাঙলায়,
জাগে না উঠে না কেহ রে ভাই!
সকলেই হেরি ঘুমে অচেতন,
শুয়ে শুয়ে শুধু হেরিছে স্বপন,
এতই অকর্ম্মা, বলিতে নাই!

(২)

ডেকে ডেকে ঘুম ভাঙ্গেনা তাদের
ঘুমায়ে অসাড় হইয়াছে ঢের,
অনন্ত শয্যায় তারা কি রবে?
বাণিজ্যের আলো দীপ্ত দিবাকর,
ওই দেখ জ্বলে বঙ্গের ভিতর,
ওই দেখ ঘুরে বণিক সবে;

(৩)

ওই দেখ তারা গায় স্বার্থ-গান,
তালে তালে নাচি ধরিতেছে তান,
ওই দেখ তারা দিতেছে প্রাণ,
স্বার্থের লাগিয়া নাহি করে ভয়,
ব্যাঘ্র সর্প মুখে অগ্রগামী হয়,
স্বার্থেতে জড়িত তাদের মান;

(৪)

স্বার্থ-উপদেশ দেয় সর্ব্বক্ষণ,
কর্ণে ছাড়ি দেয় স্বার্থ-মন্ত্র-ধন,
চক্ষু ফুটাইয়া দেখায় সবে ;
তবুত বঙ্গের হ'লনা হ'লনা,
জ্ঞানের উদয় স্বার্থের চেতনা,
তবেরে আবার কখন হবে ?

(৫)

তারা কারো পানে নাহি চায় আর,
স্বার্থেতে ছেয়েছে বঙ্গের আগার,
স্বার্থে আত্ম-বলি দিতেছে সবে ;
স্বার্থের মন্দির প্রকাণ্ড ব্যাপার,
শূন্য ভেদি চূড়া উঠেছে তাহার,
স্বার্থের বিজয় সদাই ভবে ;

(৬)

স্বার্থ স্বার্থ করি বিদেশীর দল,
জাহাজ ভাসায়ে, এসেছে সকল,
ঘুরিছে সবাই পাগল হয়ে ;
কোথা সোণা রূপা কোথা ধান চাল,
তন্ন তন্ন করি সকাল বিকাল,
সংগ্রহ করিছে সন্ধান লয়ে ;

(৭)

নাহিক তাদের শ্রমের বিরাম,
গ্রামে গ্রামে ধায় ঘুরে অবিরাম,
খুদ কুঁড়া কিছু ছাড়েনা তারা ;
খুঁটিয়া খুঁটিয়া আনিছে সকল,
গ্রামের বাসিন্দা হইয়া বিকল,
ঘুমায়ে হয়েছে আপন-হারা ;

(৮)

কল কারখানা করিয়া সৃজন,
আমাদের তুলা করিয়া গ্রহণ,
পাকাইয়া সূতা গড়িছে তায় ;
তাহাতে কাপড় করিছে বয়ন,
বাঙ্গালী করিছে লজ্জা নিবারণ,
হাঁ করিয়া বঙ্গ চাহিছে হায় !

(৯)

আমাদের পাট কলে কলে যায়,
লাখ লাখ থলে হইতেছে তায়,
বাণিজ্য জিনিস বোঝাই করে।
এদেশের বহু দ্রব্য আছে যত,
জাহাজে জাহাজে যায় অবিরত,
শূন্য করি হায় বাঙালী ঘরে।

(১০)

আমাদের দ্রব্য লয়ে গিয়ে হায়,
আমাদের দিয়ে মূল্য লয় তায়,
আমরা এমনি অসাড় হায় !
আমরা মানুষ হব কি কখন,
আমাদের ঘুম ভাঙেনা যখন,
জীবন মোদের মৃত্যুর প্রায় !

(১১)

মোদের হাত পা দিয়াছেন বিধি,
তবে কেন ভুলি স্বদেশের নিধি,
কেন না করিব যতন তাই ?
আপনার হাতে কেন না গড়িব
দেশের জিনিস দেশেতে রাখিব,
উঠ উঠ তাই সকল ভাই।

(১২)

ব্রহ্মচর্য্য তাই কররে আশ্রয়,
হ'ক পূর্ব্ব কথা স্মৃতিতে উদয়,
কি ছিলাম মোরা হইলাম কি ?
পরের প্রত্যাশী হয়েছি এখন,
হারায়েছি সেই স্বাধীনতা ধন,
কি বলিব আর মোদেরে ছি ছি !

(১৩)

ব্রহ্মচর্য্য ভাই কররে আশ্রয়
শিক্ষায় কঠিন হ'ক রে হৃদয়
চরিত্র গঠন কর হে সকলে,
হও রে সরল মনে হ'ক বল,
আলস্য ত্যজিয়া দাঁড়াও সকল,
পরিচয় দাও আর্য্যবংশ বলে।

(১৪)

নীরব থেক না থেকনাক আর,
চারি দিকে স্রোত বহে অনিবার,
উন্নতির ভেরী বাজাও জোরে ;
বাঙালী জাতের দাও পরিচয়,
কারো চেয়ে ভবে কভু কম নয়,
তবে কেন সব আছ হে মরে ?

(১৫)

উঠ উঠ ভাই বঙ্গবাসিগণ,
বঙ্গে হ'ক আজ মহা জাগরণ,
হাসুক সে বঙ্গ প্রাণের হাসি ;
চৌদিকে ছুটুক উন্নতির ঢেউ,
মলিন মুখেতে থেক নাক কেউ,
জ্বলুক আলোক আঁধার নাশি !

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

মহাপুরুষই মহাপুরুষকে চেনেন।

"The great only know the great. In spite of differences in their ways and advances, they all unite in a centre common in the sphere of their life." মহৎ মহৎকে চেনেন। তাঁহাদের সাধন ও অনুসরণীয় পথে ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁহারা জীবনের এক সাধারণ কেন্দ্র ভূমিতে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হয়েন। দেশ, কাল ও পাত্র অতিক্রম করিয়া উচ্চ সাধক ও মহাজনদিগের এই শোণিত-গত সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। কোথায় জন্ম গ্রহণ করিলেন মহর্ষি ঈশা, আর কত দিন পরে মার্কিন ভূমি হইতে এমার্সন (Emerson) বলিয়া গেলেন "Jesus Christ belonged to the true race of prophets". মহর্ষি ঈশা যে চক্ষে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজন মুষাকে (Moses) দেখিয়া বলিয়াছিলেন "I feel respect for Moses and the prophets" এমার্সনের ভিতরেও সেই দৃষ্টির আভাস পড়িয়াছিল। সাধু চ্যানিং এর (Channing) ধর্ম্ম মন্দিরের জনৈক শ্রোতা ও উপাসক এমার্সনকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "That young man will make another Channing". সত্যই সেই শ্রোতার ভবিষ্যদ্বাণী সাধু এমার্সনের জীবনে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। ধর্ম্মাত্মা এমার্সন তাঁহার জীবনের সাধনের পথে ভাবী মহাজন পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে "I look for the new Teacher, that shall follow those shining laws, that he shall see them come full cycle ; shall see there rounding complete grace ; shall see the world to be the mirror of the soul ; shall see the identity of the law of gravitation with purity of heart ; and shall show that the Ought, that Duty, is one thing with science, with Beauty and with Joy" পঞ্চ শতাব্দী পরেও জন্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীঈশা বুদ্ধকে চিনিয়াছিলেন এবং সেই নির্ব্বাণের ভূমিতে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "not my but thy will be done" তাই বলিতেছি যে দেশ, কাল, পাত্র ভেদ করিয়া সাধক ও মহাজনগণ এক জন আর এক জনের ভিতর ফুটিয়া উঠিতেছেন। বর্ত্তমানে ব্রাহ্ম সমাজেও এই পরিপূর্ত্তি ও পরিস্ফুরণ প্রত্যেক উদার-চেতা ব্রাহ্মকে স্বীকার করিতে হইবে। মহাত্মা রাজা রামমোহনের পর মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পর ব্রহ্মানন্দ

কেশবচন্দ্র। যাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজে ক্রম-বিকাশের তত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে এই পরিস্ফুরণ তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। যেমন Old Testament হইতে New Testament আসিয়া পড়িয়াছিল, অথচ একের সহিত অপরের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, সেইরূপ মহাত্মা রাজা রামমোহন হইতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মও সেই সম্বন্ধ সূত্রের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। মত-রাজ্যের ভিতর ক্রম-বিকাশ ও ক্রম-পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও "তিনে-এক ও একে তিন" এইরূপ সম্বন্ধই চলিয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজের বেদী হইতে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, পূর্ব্ববর্ত্তী দুই মহাজন সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, জানি না সেরূপ ভাবে তাঁহাদের সে সম্বন্ধ কোথাও বিবৃত হইয়াছে কি না। এই শোণিত-গত ও বংশানুক্রমিক সম্বন্ধের উপরেই কেশবচন্দ্র রামমোহনকে পিতামহ ও দেবেন্দ্রনাথকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি ঈশা যে সম্বন্ধ মুষার ভিতর দেখিয়া বলিলেন যে "I feel respect for Moses and prophets" ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও মহাত্মা রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও তাহাই দেখিলেন। বিবাদ আমাদের নিকট, তাঁহাদের ভিতর ছিল না। আমরা এক জনকে স্বীকার করিতে গিয়া অন্যকে অস্বীকার করি। আমরা ভুলিয়া যাই যে, "একে তিন তিনে এক"। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকেও সেই ভাবে দেখিয়াছিলেন। পিতা যেমন পুত্রের নামকরণ করিয়া থাকেন, পিতা দেবেন্দ্রনাথও কেশবচন্দ্রকে "ব্রহ্মানন্দ" নাম দিয়াছিলেন। মহর্ষি বলিয়াছিলেন যে, "কেশব সম্মুখে না থাকিলে আমার উপাসনা খুলে না"। কি মধুর সম্বন্ধ! কেশবচন্দ্রের পবিত্র চরিত্র অনুভব করিয়া মহর্ষি এক সময়ে তাঁহার পত্র বিশেষের মধ্যে লিখিয়াছিলেন যে "আমি তোমার মত পবিত্র লোক বঙ্গদেশে দেখি নাই।" কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতাস্থ রামমোহন লাইব্রেরীতে মহর্ষিদেবের তৈল-চিত্র উন্মোচনের দিনে আমাদের ভক্তি-ভাজন মাননীয় উদার-চেতা প্রাচীন ব্রাহ্ম সার্ কে, জি, গুপ্ত মহাশয় মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দের মধুর সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া যে প্রাণস্পর্শী কথা বলিয়াছেন, তাহা কাহার নয় হৃদয়কে স্পর্শ করিবে? গুপ্ত মহাশয় এক স্মৃতি সভার বক্তৃতার এক স্থানে বলিয়াছিলেন "But he (maharshi) was soon to be joined by a young coadjutor whose burning zeal, intence enthusiasm and deep fervour brought a fresh succession of strength to the Brahmo Samaj. This young man was no other than Keshab Chandra Sen whom the Maharshi soon after gave the title of Brahmanonda" * * * under the Maharshi's wise and sympathetic guidance and the Bramhanond's bold leadership, the movement spread in all directions."

হায়! আমাদের সে স্মৃতি এখনও হৃদয়ে জাগিতেছে যে, মহর্ষি দেব তাঁহার প্রিয় ব্রহ্মানন্দের স্বর্গারোহণের পর, একদিন রাত্রি শেষে নিস্তব্ধ উষায় সকলের অজ্ঞাতসারে কমল কুটীরের সমাধি-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রিয় কেশবের সমাধির পার্শ্বে বসিয়াছিলেন! তাই বলিতেছি, বিবাদ আমাদের কাছে, তাঁহাদের ভিতর ছিল না। "The jewellers know the jewels" জহুরীই জহর চিনিয়া থাকে। বিশ্বাস, প্রেম ও ভক্তির পথে বিবাদ নাই। বিবাদ মানবীয়—মিলন স্বর্গীয়।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

মায়ে-পোয়ে।

(সমালোচনা)

যার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নাই, তার সঙ্গে যে কোন সম্পর্ক পাতানো চলে। শাদার উপরে সব রঙই ফলানো যাইতে পারে। তাই সে চির রহস্যময়ের সঙ্গে মানুষ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর •নানা সম্পর্ক স্থাপন করে।

উপনিষদ্ যাহাকে "বামনী" "ভামনী" ও "সংযদ্‌বাম" কহিয়াছেন তাহার সঙ্গে রস যখন বেশি জমায়েৎ হইয়া উঠে মানুষ তখনই তাঁহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ অনুভব করে। এই অনুভূতিটাকে বেশি করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য তাহাকে একটা সম্পর্কে পরিণত করে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সম্বন্ধটাকে মাতা পুত্রের ভাবের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহাই তাঁহার "মায়ে-পোয়ে।"

লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"মা লিখাইয়াছেন, আমি লিখিয়াছি।" এই খানেই তো কবিত্বের চরম এবং সমালোচনার শেষ। তাঁহার লেখনী সার্থক হউক।

ব্রাহ্ম সমাজের ভিতর এমন কেহ থাকিতে পারেন, যাঁহার কাছে এই "মায়ে-পোয়ে" একটা সাকার উপাসনার চরম—অর্থাৎ প্রায় প্রতিমা পূজার কাছাকাছি বলিয়া মনে হইতে পারে। এই প্রকার ব্যক্তির জন্য বলা যাইতে পারে যে তিনি যেন এই পুস্তকখানির "সন্ধ্যায়" পরিচ্ছেদটী মনোযোগ দিয়া পাঠ করেন। যেখানে লেখক কহিয়াছেন—"মায়ের খোঁজে এসে যে এমন শোভা দেখতে পাব, তা কে জানতো? এত শোভা তো দেখ্‌ছি, কিন্তু মায়ের অরূপ রূপের যে শোভা দেখেছি তার কাছে এত শোভাও কিছুই নয়।" বৈদিক ঋষিগণ প্রথমতঃ সুন্দর জগতের যাহা কিছু মনোরম দেখিতে লাগিলেন, তাঁহাকেই ভাবিতে আরম্ভ করিলেন "এই সেই!" দেখিতে দেখিতে অবশেষে উপলব্ধি করিলেন যে "নেদং যদিদমুপাসতে" এই জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সেই চির সুন্দরকে চিনিতে হইবে; এই জাগতিক ব্যক্তিগণের সহিত যত রকম সম্বন্ধ আছে, তাহার মধ্য দিয়াই বুঝিতে হইবে আনন্দময়ের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ। নতুবা সেই অচিন্ত্য অপার অগম্যকে কি করিয়া বুঝিব?

এই "মায়ে-পোয়ে" ভাবের ধারার ভিতরে দেখিতে পাই "জ্বালা" আছে, "অভিমান" আছে, "আত্ম সমর্পন" আছে। অবশেষে সকল "আনন্দে" পর্য্যবসিত। সাধকের জীবন কত বিচিত্র ভাবের মধ্য দিয়াই না অগ্রসর হয়। ভাষা তাহাকে আর কতটুকু প্রকাশ করিতে পারে?

যাহার জীবনে অরূপের রূপ-জ্যোতির সন্ধান মিলিল না—তার কিছু দেখাই হইল না। চির সুন্দরকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিবে বলিয়াই জগৎ সুন্দর। যে ইহাকেই চরম ভাবিল, সে বড়ই ঠকিল। যে বালক খেলানা পাইয়া তাহাতেই মজিল, তাহার আর মায়ের কোলে যাওয়া হইল কৈ?

স্তর পরম্পরাক্রমে উক্ত ভাবগুলিকে সরল ভাষায় ফুটাইয়া তোলাই এই পুস্তিকার বিশেষত্ব। এই মর্ম্মোত্থিত ভাবগুলি যেন সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত, সাধনার সাৎচর্য্যে শুভ্রোজ্জ্বল, এবং অনুভূতির আবেগে কম্পিত—একখানি ক্ষুদ্র গদ্যকাব্য। শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ব্রণ-বিজ্ঞান—শেষ।

ব্রণ বিসর্পিত হইলে বা সফেন পূঁজ-রক্ত বাহির হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য। বাতকুণ্ডলী, অষ্ঠীলা, দন্তবেষ, উপকুশ, কণ্ঠ, মান্নু, উরুক্ষত, ব্রণগ্রন্থি ও মূত্রাশয়, পাকাশয়, আমাশয় ও ফুস্‌ফুস্‌-জাত ব্রণ যাপ্য, অর্থাৎ সহজে প্রাণ নাশক হয় না, কিন্তু চিকিৎসায় আরাম হয় না। যে ব্রণ কঠিন গোশৃঙ্গবৎ উন্নত, দূষিত রুধির বা পাতলা পিচ্ছল আইশ ধোয়া জলের মত স্রাব-যুক্ত স্নায়ুজাল-সমন্বিত (অর্ব্বুদ) সেই ব্রণ অসাধ্য। ক্ষীণমাংস ব্যক্তির অধিক পূঁজ ও রক্তবাহী ব্রণ হইলে বা ব্রণের চারিদিকে শোথ ও মাংসের বুদ্‌বুদ্‌ দেখিলে বা অরুচি, অপাক, শ্বাস, কাশ, জ্বর, প্রভৃতি উপদ্রব ঘটিলে ব্রণ অসাধ্য। মস্তকে বা কণ্ঠে শব্দবাহী ব্রণ হইলে ব্রণ অসাধ্য। মস্তকের হাড় ভাঙ্গিয়া মগজ দুষ্ট হইলে এবং সঙ্গে কাশ ও শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা ঘটিলে ব্রণ অসাধ্য। পাকাশয় হইতে তুষধোয়া জল এবং আমাশয় হইতে কলাইর জল ও রক্তাশয় হইতে ক্ষার জলবৎ স্রাব হইলে ব্রণ অসাধ্য।

পাকা পক্ক—সচরাচর প্রদাহের পচামান অবস্থা আরম্ভ হইলে তিন দিন মধ্যেই পূঁজ উৎপন্ন হয়। প্রদাহের মধ্যের গলন কার্য্য শেষ হইলেই ব্রণ সুপক্ক হইয়াছে বলিয়া জানিবে। এই সময়ে প্রদাহের লক্ষণাবলী কমিয়া যাইবে। অঙ্গুলী দ্বারা চাপ দিলে মধ্যে পূঁজের ঢেউ অনুভব হইবে। এই অবস্থায়ই অস্ত্র করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। নচেৎ পূঁজ ব্রণ প্রাচীরের শুদ্ধ মাংস ধ্বংস করিয়া পূঁজও গহ্বরের আকার বৃদ্ধি করিতে থাকিবে, তাহা হইলে অস্ত্রের পর ক্ষত অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত হইয়া থাকে, অধিকন্তু ব্রণের উপরিভাগের চামড়া পাতলা হইয়া যায় এবং শেষে এই পাতলা চামড়া নীচের মাংসের সহিত সংযুক্ত হইতে চাহে না।

দ্বিতীয়তঃ—পূঁজের স্বাভাবিক গতি নিম্ন দিকে। কাজেই নিম্নগতি হইয়া কোন এক স্থানে আবদ্ধ হইয়া সেখানেও একটী গর্ত্ত (কেভীটী) উৎপাদন করে এবং উপরের মুখ দ্বারা সামান্য পূঁজ বাহির হইয়া অবশিষ্ট পূঁজ উক্ত গর্ত্তেই আবদ্ধ থাকে। তখন সেখানেও অস্ত্র করিয়া পূঁজ নিঃসরণের পথ সরল করিয়া দিতে হয়। আর যদি যথাকালে এই পূঁজ নিঃসরণের বন্দোবস্ত না হয়, তবে সেখান হইতে অন্যত্র গতি হইয়া নালী বৃদ্ধি করিতে থাকে। অথবা পূঁজ জমা থাকায় পূঁজের উত্তেজনায় রোগীর জ্বর ও অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয় এবং কালে এই জ্বরই ক্ষয়কারী জ্বররূপে পরিণত হইয়া রোগী ক্রমে দুর্ব্বল হইতে থাকে, এবং উপসর্গাদি বৃদ্ধি পাইয়া রোগী মৃত্যুমুখেও পতিত হয়।

তৃতীয়তঃ—প্রদাহের নিকটবর্ত্তী যদি কোন স্বাভাবিক গহ্বর বা মূত্রাশয় (কিড্‌নি) ফুস্‌ফুস্‌ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে, তবে তাহা আক্রান্ত হইবার একান্তই সম্ভাবনা ; হইলে, ব্যারাম কষ্টসাধ্য হয়, অনেক স্থলে অসাধ্যও ও হইয়া পড়ে। অস্থি সন্ধি আক্রান্ত হইলে অস্থি বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে এবং এই অস্থি প্রায়ই আর স্বাভাবিক হয় না। চতুর্থতঃ—যদি কোন রক্তবাহী শিরা বা শিরা-

মর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, তবে পূঁজে ঐ শিরা ধ্বংস করিয়া দেওয়ায়, অস্ত্রের পর হঠাৎ এমত রক্তস্রাব হইতে থাকে যে, রোগী ২।১ দণ্ড মধ্যেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। অতএব যথা নির্দ্দিষ্ট কালেই ব্রণ বিদারণ পূর্ব্বক পূঁজ বাহির করিয়া দেওয়া চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। রোগী, বালক অসহিষ্ণু ও ভীরু হইলে, ভেদক ঔষধ দ্বারা ব্রণ-প্রাচীর ভেদ করিয়া পূঁজ বাহির করিয়া সোলা বা পলিতা দ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া চিকিৎসা করিবে। অনেক অজ্ঞ বৈদ্য এই প্রকার রোগীকে ঔষধ দ্বারা ব্রণ কাটাইয়া দিবে বলিয়া আশ্বস্ত করিয়া নানা প্রকার চাতুরী দ্বারা অযথা ঔষধ ব্যবহার করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট ও অর্থ শোষণ করে। ইহারা প্রকৃতই কুবৈদ্য। ভেদক ঔষধ ব্যতীত এমত ঔষধ নাই, যাহাতে ব্রণ ফাটিতে পারে। তবে বিলম্বে স্বতঃই পূঁজ বৃদ্ধি হইয়া ব্রণের উপরের চামড়া পাতলা হইয়া যায় এবং পূঁজের চাপে আপনা হইতেই ব্রণ ফাটিয়া যায়। অপর পক্ষে অনেক বৈদ্য প্রদাহের পচ্যমান অবস্থাই পাকা ভ্রমে অথবা রক্তজ ব্রণের রক্তের তরঙ্গকেই পূঁজের ঢেউ মনে করিয়া অস্ত্রোপচার (অপারেশন্) শেষ করিয়া থাকেন। ইহা পক্ক ব্রণকে ত্যাগ করা অপেক্ষাও বিপজ্জনক। পক্ক ব্রণ ত্যাগ করিলে অবশ্য পূর্ব্বোক্ত দোষ ঘটিয়া রোগী মারাও যাইতে পারে, কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কিন্তু কাঁচা ব্রণ কাটিলে প্রায় সর্ব্বত্রই অল্পাধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। প্রদাহের আক্রমণ অবস্থায় তাহার উপরে অস্ত্রের উত্তেজনা হওয়ায় প্রদাহ আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অনর্থক কতগুলি রক্ত বাহির হইয়া যাওয়াতে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ব্রণ যদি বাতজ অথবা পিত্তজ বা সান্নিপাতিক হয়, অথবা রোগী যদি বাত পিত্ত প্রধান প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়, তবে ব্রণ সাংঘাতিকভাবে বিসর্পিত হইয়া পড়ে। রোগীর মধুমেহ, শর্করা মেহ বা নিরক্তাবস্থা থাকিলে অস্ত্রোপচারই রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়। অপক্ক ব্রণ অস্ত্র করিলে ব্রণ বিসর্পিত হউক বা না হউক প্রদাহের যে বিস্তৃতি ঘটিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই, এবং সচরাচর এই স্থলেই প্রায় নালী দেখা যায়।

অস্ত্র চিকিৎসা। অস্ত্র ক্রিয়া আট প্রকার। (শুশ্রুতদেব) যে রোগে যে ক্রিয়া আচরণীয়, তাহা সেই সেই রোগ বর্ণনকালে বিস্তারিত বর্ণিত হইবে। ব্রণ চিকিৎসায় ভেদক ও বিস্রাব্য ক্রিয়াই আচরণীয়। অস্ত্র করিবার পূর্ব্বে ন্যাকড়া, গরম জল, শীতল জল, কষায় দ্রব্যের জল, তুলা ঔষধ, যন্ত্রতন্ত্র, সলাকা সংগ্রহ করিয়া রোগী পশ্চিম মুখে ও চিকিৎসক পূর্ব্ব মুখে অবস্থান করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক অস্থি ধমনি ও মর্ম্ম প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথা নিয়মে অস্ত্র করিবে।

ভেদক ক্রিয়া—ব্রণে যদি পূঁজ উৎপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, বিশেষতঃ ফুসফুস্, উদর, গহ্বর বিদ্রধি, উরুস্তম্ভ প্রভৃতি বড় জাতীয় ব্রণ বা যে ব্রণের চারিদিকের প্রাচীর অনুভব হয় না সেই সব স্থলে বোমা যন্ত্র দ্বারা ব্রণ ভেদ করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। বোমা ঠিক সরলভাবে ধরিয়া তাহার ফাটা দিক নিজের দিকে রাখিয়া,ব্রণের যে স্থান পাতলা বলিয়া অনুমান হইবে সেই স্থলে বোমা বসাইয়া দিবে। বোমা ব্রণ গহ্বর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে একটুকু জোরে সম্মুখের দিকে চাপা দিলেই ব্রণ-বস্তু বোমার

ফাঁক দিয়া বাহির হইবে। মধ্য হইতে রক্ত বা মাংস ধোয়া জলবৎপদার্থ বা চালিতার বিজল সদৃশ পূঁজ বাহির হইলে কখনও ব্রণে অস্ত্র করিবে না। সে দিবস পরিত্যাগ করিয়া ২।৪ দিবস ব্রণ পাকান পুলটীশ, প্রলেপ দিয়া পুনরায় অস্ত্র করিবে। আর শুদ্ধ অথবা দূষিত পূঁজ দোষের প্রকোপ অনুসারে যে বর্ণেরই বাহির হউক না কেন অস্ত্র করিবে।

বিস্রাব্য ক্রিয়া।—ক্ষিপ্র-হস্ততাই অস্ত্র চিকিৎসকের প্রধান গুণ। অতএব অতি ক্ষিপ্রতার সহিত চিকিৎসক ব্রণ প্রাচীর বিদীর্ণ করিবে। এই উদ্দেশ্যে "হোগলপাতি" যন্ত্রের ফলক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা জোরের সহিত ধারণ করিয়া মাংসপেশীর লম্বালম্বি ভাবে, ব্রণ গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। এবং উক্ত অস্ত্র দক্ষিণে কিম্বা বামে চাপ দিয়া ধরিলে অস্ত্রের পার্শ্ব দিয়া পূঁজ বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রণ প্রাচীর কাটা সমীচীন নহে। উক্ত প্রকারে পূঁজ বাহির হইলে ভিষক আপন অভিজ্ঞতা অনুসারে ব্রণ প্রাচীর কাটিয়া দিবে। এই সময়ে ব্রণের পার্শ্বস্থ অথবা নিম্ন প্রাচীর আহত না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্রণ প্রাচীর আহত হইলে নূতন প্রবাহ আরম্ভ হইবে, অথবা অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইয়া রোগী ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। আধুনিক চিকিৎসকগণের এদিকে দৃষ্টি নাই বলিয়া অনেক কুফল ঘটিয়া থাকে।

প্রবিষ্ট হোগলপাতি দ্বারা ব্রণ প্রাচীর উপরে ও নিম্ন দিকে কর্ত্তিত হইলে, তর্জ্জনী অথবা কনিষ্ঠা অঙ্গুলি ব্রণ গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। অঙ্গুলি না গেলে শলাকা প্রবেশ করাইয়া দেখিতে হইবে, কোন্ দিকে গহ্বরের পরিমাণ বেশী আছে, (এই সময়েও ব্রণ প্রাচীরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে) এবং যেদিকে গহ্বর বেশী আছে সেই দিকে এমতভাবে কাটিয়া দিতে হইবে যেন অস্ত্র মুখ ঢালু হয়, তবেই ব্রণের মধ্যস্থ পূঁজ রক্ত স্বাভাবিক নিয়মে বাহির হইয়া যাইতে পারিবে। ব্রণের উপরিভাগের যে যায়গা পাতলা হইয়া যায় বা টোব ধরিয়া উঠে, সেই স্থলেই গহ্বরে ঢালু দিক ইহাই সাধারণ নিয়ম, এবং সেই স্থলেই প্রবল অস্ত্র প্রবেশ করাইতে হয়; কিন্তু গভীর ব্রণে সচরাচরই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। বায়ুর শক্তিতে হয়তো ব্রণ গহ্বরের উপর দিক টোব ধরিয়া উঠিয়াছে, অথবা একাধিক স্থল এই প্রকারে টোব এবং তাহার মধ্যে পুরু-মাংসপেশীর প্রাচীর বিদ্যমান আছে; কিন্তু যে স্থলে অস্ত্র হইলে ঢালু হইতে পারে, যে স্থল ভয়ানক পুরু অস্ত্র করিলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইবে, অথবা শিরা বা মর্ম্মাদি আহত হইবার একান্তই সম্ভব এই প্রকার স্থলে; যে যে স্থলে টোব ধরিয়াছে সেই সেই স্থলে, অস্ত্র করিয়া শলাকা দিয়া দেখিতে হইবে, কোন দিকে ব্রণের গহ্বর বিদ্যমান আছে; এবং যদি এই অস্ত্রে ঢালু না হইয়া থাকে, তবে শলাকার মাথায় হোগলপাতি বা এরসেম লেনচেট দ্বারা বা বোমা যন্ত্র দ্বারা নিম্ন প্রাচীর গাত্রে সরু ছিদ্র করিয়া দিয়া পলিতা বা রবারের নল দ্বারা পূঁজ বাহির করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। ইহা ভিষকের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। স্ফোটকের একাধিক স্থলে অস্ত্র করা আবশ্যক হইলে প্রত্যেক অস্ত্রই মাংসপেশীর লম্বালম্বি ভাবেই করিতে হইবে। আড়াআড়ি ভাবে কখনও কোন স্থলে অস্ত্র করা কর্ত্তব্য নহে, করিলে মাংসপেশী

কাটিয়া যাইতে পারে, অথবা শিরা বা স্নায়ু কাটিয়া অতিরিক্ত রক্তস্রাব বা ক্ষতে তীব্র যন্ত্রণা হইতে পারে। অধিকন্তু ক্ষত সকালে পূরিয়া উঠে না, একটী উন্নত মাংস পিণ্ড জন্মিয়া থাকে। অস্ত্রক্রিয়া সম্পন্ন হইলে অতি লঘু হস্তে চাপ দিয়া পূঁজ বাহির করিয়া দিবে। পূঁজ বাহির করিতে জোরে চাপ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। রোগী দুর্ব্বল, বা অধিক দিনের ব্রণ বা বিদ্রধি, উরুস্তম্ভ আদি অধিক পূঁজ বিশিষ্ট ব্রণের পূঁজ প্রথম দিনে সম্পূর্ণ নিঃসৃত করা কর্ত্তব্য নহে। করিলে রোগীর শরীরের রক্তের গতি সেই দিকে হইয়া রক্তাশয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে। সেইরূপ পুরাতন বড় ব্রণে পূঁজ এক কালীন সকল বাহির করিয়া দিলে রোগী ক্ষয়কাশে পরে আক্রান্ত হইবার একান্তই সম্ভব, এবং এই অবস্থায় এই প্রকারে জ্বর হইলে রোগী প্রায়ই রক্ষা পায় না। যথা রীতি পূঁজ বাহির করিয়া একখণ্ড পাতলা ন্যাকরা আবশ্যক মতে দৈর্ঘ্যপ্রস্থে করিয়া ক্ষতের মুখে সলাদ্বারা ছিপির মতন করিয়া রাখিবে। ন্যাকরা যাহাতে ব্রণ গহ্বর মধ্যে বেশী না যায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গহ্বরের মধ্যে অতিরিক্ত ন্যাকরা দিলে পূঁজের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া যায় ও অনেক স্থলে নূতন করিয়া প্রদাহ আরম্ভ হয়। বিশেষতঃ অস্ত্রের পর দিবসই, প্রকৃতির শক্তিতে ব্রণ গহ্বরে চারিদিকের সুস্থ মাংস দ্বারা ব্রণ গহ্বর অনেক পূর্ণ হইয়া যায়। ন্যাকরা মধ্যে দিলে, এই মাংস আর বৃদ্ধি হইতে পারে না, বরং ধ্বংস হইয়া যায়।

রক্তস্রাব—অস্ত্রের মুখে পাতলা ন্যাকরাই ব্যবহার কর্ত্তব্য, কেন না পাতলা ন্যাকরায় রক্তাদি যে প্রকার বন্ধ হয় মোটা বা মাড়াদি সংযুক্ত ন্যাকরায় তত সহজে বন্ধ হয় না। আর যদি হঠাৎ অসাবধানতা বশতঃ কোন ধমনী বা শিরাছিন্ন হইয়া যায় তবে প্রথম ন্যাকরাদ্বারা জোরে চাপ দিয়াই বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু না হ লে জারিত লৌহ, হিরাকষ, ফটকিরী চূর্ণ ইত্যাদি সঙ্কোচক ঔষধ ন্যাকরায় মাখিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবে; এবং উক্ত ঔষধের জলদ্বারা সর্ব্বদা ভিজাইয়া রাখিবে। ছাগল্যাদির পাতা, বিষল্যা, করুণীর পাতা, দুর্ব্বার যাইজ ইত্যাদি যে সব গ্রাম্য রক্ত-রোধক ঔষধ প্রচলিত আছে তাহাতেও এইসব স্থলে ভাল কাজ হইয়া থাকে। চীৎকার দিলেও বেশ ফল হয়। ন্যাকরার চাপ দিয়া জলপটী পুরু করিয়া বাঁধিয়া রক্ত বন্ধ করিতে পারিলে, ভাল হয়, রক্তরোধক সকল ঔষধই উত্তেজক, রোগীর বায়ু চড়া করিয়া দেয়। কিন্তু একটুকু মোটা জাতীয় শিরা অথবা ধমনী যদি ছিন্ন হইয়া যায়, তবে এইসব ঔষধে প্রায়ই রক্ত বন্ধ হয় না। সেই স্থলে শিরা ছিন্ন হইলে ক্ষতের নিম্ন দিকে এবং ধমনী ছিন্ন হইলে ক্ষতের উপরের দিকে জোরে একটী বন্ধন দিয়া দিতে হইবে। সূক্ষ্ম ধারে পিচকারীর মত ছিটিয়া রক্ত বাহির হইলে শিরা এবং দোমাইয়া বোকনা বোকনা রক্ত বাহির হইলে ধমনী ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া জানিবে। এইপ্রকার বন্ধন দিলেও যদি কোন কাজ না করে তবে ধমনী বা শিরার মুখ পাইলে তাহা বাঁধিয়া দিবে, আর যদি সঙ্কুচিত হইয়া মাংস পেশীর মধ্যে বসিয়া যায় তবে যে স্থল দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে তথায় গ্রেণ দুই কাওয়াইনের তুলা লাগাইয়া দিলে নিশ্চয়ই সকল প্রকার রক্তস্রাব বন্ধ হইবে। যদি সে স্থলে

ও না হয় তবে উত্তপ্ত লৌহ সলাকা দ্বারাই দগ্ধ করিয়া দিবে।

ব্যাণ্ডেজ—অস্ত্রের পর জলপটীই বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। এনটীসেপটীকের বন্ধন প্রণালী সর্ব্বত্র কার্য্যকারী হইতে পারে না। সুস্থ ও সবল ও নির্দ্দোষ শরীর না হইলে বা রোগী রক্তদুষ্টি গরমী, মধুমেহ, কুষ্টআদি বিষে দূষিত হইলে এই প্রণালীতে কোনই কাজ হইতে পারে না। বিশেষতঃ এই ব্যয় সাধ্য চিকিৎসা ভারতের প্রকৃতির ও দরিদ্র পল্লীর সম্পূর্ণই অনুপযোগী। সেই কারণেই আয়ুর্ব্বেদে পূর্ব্ব বর্ণিত চিকিৎসা প্রণালী সমর্থন করিয়া গিয়াছে এবং তাহাই আমাদের দেশে প্রচলিত আছে।

তবে এনটীসেপটীক চিকিৎসা প্রণালী ও আয়ুর্ব্বেদের প্রথম সময়ে প্রচলিত ছিল বলিয়া দেখা যায়। যাহা হউক অস্ত্রের পর পূঁজরক্ত বন্ধ হইয়া গেলে, ক্ষতোপরি পুরু গদি দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া রাখিতে হইবে। এবং ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহা জল দ্বারা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পর দিবস ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া কাঁচা মলমের পটী দিতে হইবে। যদি অস্ত্র কালীন প্রাচীরাদি আহত হইয়া থাকে তবে দোষের প্রকোপ বশতঃ প্রদাহ না কমিয়া চারিদিকের লাল ভাব বিদ্যমান থাকে এবং ব্রণ গহ্বর সঙ্কুচিত হইয়া না যায়, আবশ্যক বোধে দুই তিন দিনও জলপটী রাখা যাইতে পারে, বা তোকমা, তিল, বেতাগাদি ব্রণ সঙ্কোচক পুলটীশ আদি ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে সচরাচর প্রায় সর্ব্বদাই এই স্থলে কাঁচা মলমের পটীতেই বিশেষ ফল দর্শে। পুলটীশ আদি দিতে হইলে ক্ষত মুখের ন্যাকরা বাহির করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু কাঁচা মলমের পটী দিলে অস্ত্র মুখের ন্যাকরা ফেলিয়া দিতে হইবে এবং মলমের পটীমাত্র কাটামুখ ও প্রদাহিত স্থানের উপর বসাইয়া দিতে হইবে. মধ্যে পুরিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এনটিসেপটীক ভাবের চিকিৎসায় সকল স্থলেই মলম বা ঔষধের পটীর উপর পান বা কলার পাতা ব্যবহার করিতে হইবে। এই প্রকারে প্রদাহ কমিয়া ব্রণ গর্ত্ত সঙ্কুচিত হইতে থাকিলে, কাটা মুখের ন্যাকরা ফেলিয়া দিয়া কষায় জল দ্বারা (নিম, বট) ধৌত করিয়া প্রত্যহ দুই বেলা ঔষধ দিতে হইবে। ধোয়ার সময় ফিট্‌কারী তুঁত ইত্যাদ দ্বারা ক্ষতের মধ্যে জোরে জল দেওয়া কর্ত্তব্য নহে ন্যাকরায় করিয়া জল দিবে এবং অতি সন্তর্পণে ভিজা ন্যাকরা দিয়া ক্ষতের মধ্যের রক্ত পূঁজ মুছিয়া ফেলিবে। উৎপন্ন মাংস-অঙ্কুর যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্রণে সামান্য পূঁজ আদি থাকিলে এক বেলা ব্যাণ্ডেজ পরিবর্ত্তন করিলে ও চলিতে পারে। অপর পক্ষে পূঁজের মাত্রা বেশী হইলে দুই তিন বারও ব্যাণ্ডেজ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। অস্ত্রের পর দুই তিন দিবস কাঁচা মলমের পটী, পরে ক্ষতে পচা থাকিলে কাইট মলম, ঘায়ের তৈল, এবং সুস্থ হইয়া উঠিলে গোপ ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে। এ বিষয় বিস্তারিত ক্ষত রোগ বর্ণনকালে লিখিত হইবে। এই প্রকার চিকিৎসায় ব্রণ পুরিয়া না উঠিলে নালী ঘায়ের চিকিৎসা অনুসারে চিকিৎসা করিতে হইবে।

ব্রণ রোগীর কর্ত্তব্য—দিবা নিদ্রা, গম্যা স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ, দীর্ঘ সময় উপবেশন বা শয়ন, মাদক দ্রব্য সেবন বা অনিষ্ট চিন্তা, রাত্রি জাগরণ, যান বাহনে গমন নিষিদ্ধ।

পথ্য—রোগী দুর্ব্বল হইলে উত্তেজক ঔষধ, দুগ্ধ, মাংস মৎস ডাইল ভাত ইত্যাদি বলকারক খাদ্য পথ্য। রোগ পুরাতন হইলে পুষ্টিকর ও বলকারক খাদ্য ও তৈলাক্ত খাদ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। গমের ছাতু পিষ্টক, গরম জল বিশেষ উপকারক। উত্তেজনা জন্য জ্বর বিদ্যমান থাকিলেও স্নান আহার স্বাভাবিক অবস্থার মতই করিতে হইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র দাস।

চাঁদসীর চিকিৎসা।

বন্ধন প্রণালী।

বন্ধন অস্ত্র-চিকিৎসার বিশেষ অঙ্গ। উপযুক্ত ব্যাণ্ডেজ না হইলে ক্ষত আরাম হইবে না অথবা হইলেও দীর্ঘ সময় লাগিবে। স্থান-বিশেষে বন্ধনের প্রকার ভেদ আছে। এ বিষয় বিস্তারিত সুশ্রুত ও অপরাপর শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই এইস্থলে সে বিষয় বর্ণন করা হইল না। বন্ধন দুইপ্রকার। শুষ্ক ও আর্দ্র।

শুষ্কবন্ধন—আগন্তুক ক্ষতে, বা কোন হীন অঙ্গ পূরণ মানসে একস্থানের চামড়া বা মাংস অপর স্থলে সংযোগ করিতে হইলে বা ক্ষতের পূঁজ ক্লেদ দূর হইয়া শুষ্ক আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় শুষ্ক বন্ধন আবশ্যক। অন্যত্র এই-প্রকার বন্ধনে বিপরীত ফল দর্শে। শুষ্ক বন্ধনে যদি ক্ষতে পূঁজ ক্লেদ উৎপন্ন হইতে পারে, তবে বিপরীত ফল হয়। বন্ধনের মধ্যে পূঁজ জমিয়া শুদ্ধ মাংস অঙ্কুর ধ্বংস করিয়া খোনাইয়া যায়। সুস্থ ও সবল ব্যক্তির পক্ষে এই বন্ধন সম্ভব হয় নচেৎ যাহাদের শারিরীক কোষ সকল ব্যাধির বিষে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, সেই সব স্থলে আর্দ্র ব্যাণ্ডেজই উপকারী। শুষ্ক বন্ধনে একমাত্র "গোল" ঔষধই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোল ঘসিয়া ক্ষত উপর ন্যাকরায় মাখিয়া অথবা শুধু প্রলেপ দিয়া পরিষ্কার ধোনা তুলা দ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে। দিবসে মাত্র একবার এই প্রকার ব্যাণ্ডেজ করিতে হইবে। শুষ্ক ব্যাণ্ডেজ যত কম পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় ততই মঙ্গল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ক্ষত রোগের চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ উপায়। বিশেষতঃ শুষ্ক ব্যাণ্ডেজ অপরিষ্কার থাকিলে বিপরীত ফল দর্শে। ব্যাণ্ডেজের পূর্ব্বে পচন নিবারক ঔষধ দ্বারা অথবা কষায় জল দ্বারা ক্ষত ও ক্ষতের চারি-দিকে, যতদুর ব্যাণ্ডেজের মধ্যে বদ্ধ থাকিবে, তত দুর উত্তম করিয়া ধুইয়া পুছিয়া, পরিষ্কার করিয়া বন্ধন করিতে হইবে। ক্ষতের এই প্রকার বিশুদ্ধতা সর্ব্বত্র রক্ষা সম্ভবপর নহে; কাজেই আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ এইপ্রকার বন্ধন একপ্রকার পরিত্যাগই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিয়া যদি শুষ্ক বন্ধন করা যায়, তবে একমাত্র বন্ধন দ্বারাই অনেক ক্ষত আরাম হইতে পারে। শুষ্ক বন্ধনে বন্ধন পরিবর্ত্তন করিলেই ন্যাকরা তুলা ইত্যাদি বন্ধনের তাবৎ উপকরণ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হইবে। পূর্ব্বদিনের তুলা অথবা ব্যাণ্ডেজ আদি ব্যবহার করিলে শুষ্ক

বন্ধনের মর্য্যাদা রক্ষা হইতে পারে না। কাজেই ফল ও আশা প্রদ হইবে না। বর্ষা অপেক্ষা শীত ঋতুতেই এই বন্ধন কার্য্যকারী হয়।

আর্দ্র বন্ধন—এই বন্ধনও শুষ্ক বন্ধনেরই অনুরূপ ভাবে প্রভেদ এই যে, ঔষধের ন্যাক্‌ড়ার উপর একখণ্ড কলাপাতা অথবা পানদ্বারা ক্ষত আবৃত করিয়া দিতে হয় এবং তুলার পরিবর্ত্তে ন্যাকড়ার গদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শীত গ্রীষ্ম সকল সময়ে সকল অবস্থায়ই ইহা সমান কার্য্যকরী; অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত যথোপযুক্ত বন্ধন হইলে উভয় বন্ধনের ফলই একপ্রকার হইয়া থাকে। অধিকন্তু বন্ধন প্রণালী মতন না হইয়া যদৃচ্ছা বন্ধন, করিলেও ফল যে প্রকারই হউক কিন্তু কোন অপকারের আশঙ্কা থাকে না। শুষ্ক বন্ধন অভিজ্ঞ লোক ব্যতীত অসম্ভব। কিন্তু আর্দ্র বন্ধন রোগী বা রোগীর আত্মীয়স্বজন যে কেহই করিলেও ক্ষতি নাই। ড্রেসিং ফি অথবা কটন বেণ্ডেজের মূল্য হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। উদরান্ন সংস্থানে অসমর্থ বাঙ্গালীর ইহা বড় কম সুবিধার বিষয় নহে।

জলপটী—তুলা অথবা ন্যাকড়ার গদি জলে ভিজাইয়া ক্ষতোপরি দিয়া বন্ধন করিয়া রাখা এবং সেই পটী পুনঃ পুনঃ জল দিয়া ভিজাইয়া রাখার নাম জলপটী। অস্ত্র ক্রিয়ার পর একদিন ইহা অবশ্যই ব্যবহার্য্য। জলপটী ক্ষত চিকিৎসার একটী ভাল উপায়। একমাত্র জলপটী দ্বারাই সকল ক্ষত চিকিৎসা হইতে পারে। এই প্রকার করিতে হইলে পরিষ্কার ধোনা তুলার গদি জলে ভিজাইয়া ক্ষত উপর লাগাইয়া বেণ্ডেজ করিয়া রাখিতে হয়। এবং বেণ্ডেজ না ভিজাইয়া বেণ্ডেজটী খুলিয়া, তুলার গদিকে দিবসে ৩।৪ বার বা ততোধিক বার ভিজাইয়া দিতে হয়। বেণ্ডেজ সুদ্ধ ভিজাইলে অনেক সময় একটি দুর্গন্ধ হয়, তাহাতে ক্ষতে বিপরীত ফল ফলে। ক্ষতের অবস্থা অনুসারে কাঁচা মলম, গোলা ইত্যাদি ঔষধ দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জলপটী ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল দর্শে। তবে সর্ব্বদা বেণ্ডেজ খোলা এবং তুলার গদি ভিজাইয়া দেওয়া অসুবিধাজনক বলিয়া এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান সর্ব্বত্র করা সম্ভব নহে বলিয়া সচরাচর অনুষ্ঠিত হয় না। অনেক স্থলে, ঔষধ প্রলেপ আদি হার মানিয়া যায়, সেস্থলে জলপটী বিশেষ উপকারক।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়—বেণ্ডেজ মধ্যম হওয়া আবশ্যক, শক্ত হইলে রক্তের উপযুক্ত সরবরাহ হইতে পারে না, কাজেই ক্ষত পুরিয়া উঠিতে বিলম্ব হয়। অথবা সজোর বেণ্ডেজের জন্য রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া গেলে ক্ষত পচন আরম্ভ হইতে পারে। বিশেষতঃ নিরক্ত রোগীর বা রোগের সান্নিপাতিক আক্রমণে রক্ত চলাচল বন্ধ হইলে ক্ষত প্রায়ই পচনে পরিণত হয়। অপর পক্ষে বন্ধন শিথিল হইলে, রসাধিক্য বশতঃ ক্ষতে জলীয় মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক বন্ধনেই তুলা অথবা ন্যাকড়ার গদি দিতে হইবে।

তবে যে স্থলে বাতের প্রকোপ অথবা শোতাধিক্য আছে, সেইস্থলেই মাত্র তুলার গদি ব্যবহার্য্য—নচেৎ সর্ব্বত্রই ন্যাকড়ার গদি কার্য্যকারী। বিশেষতঃ নিম্ন তি পুঁজ অথবা খোলানো চামড়া বা মাংস থাকিলে ন্যাকড়ার গদি অবশ্যই ব্যবহার করিতে হইবে।

ক্ষত ধৌত করিবার মানসে পিচকারি ব্যবহার করিবে না, একান্ত যদি করিতে হয়, তবে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, পিচকারীর জলের বেগে ক্ষতে উত্তেজনা না হয়, অথবা মাংস অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া রক্ত বাহির না হয়।

ঔষধ প্রয়োগকালেও সলাকার খোচা লাগিয়া ক্ষতে কোন প্রকার উত্তেজনা না হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মোটের উপর বেণ্ডেজকালে রোগী কোনপ্রকার যন্ত্রণা না পায় তাহাই করিতে হইবে। শুষ্ক বন্ধনের ঔষধের হ্যাকড়া পূর্ব্বে জল দ্বারা উত্তমরূপ ভিজাইয়া তুলিতে হইবে। নচেৎ উক্ত ন্যাকড়া তুলিবার কালে ক্ষত হইতে রক্ত স্রাব হইবে। এইপ্রকার রক্তস্রাব প্রকৃতই দোষনীয়। ঔষধ দোভাজ ন্যাকড়ায় মাখিয়া মাত্র ক্ষতের উপর দিয়া রাখিতে হইবে। কখনও মধ্যে পূরিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তবে পূঁজ রস সম্যক নিঃসৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে ক্ষত বা নালী যদি কিছু দীর্ঘ সময়ে রক্ষা করা দরকার হয় তবেই ঔষধের ন্যাকড়া নালী বা ক্ষতে শক্ত করিয়া পূরিয়া দেওয়া যাইতে পারে। নচেৎ ঐ ভাবে ঔষধ দিলে বিপরীত ফল দর্শিবে। পূঁজের পরিমাণের অনুপাত অনুসারে বেণ্ডেজ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। পূঁজের পরিমাণ যদি বেশী হয় তবে ২।৩ বার ব্যাণ্ডেজ পরিবর্ত্তন করিবে। নচেৎ আরোগ্যোন্মুখ শুষ্ক ক্ষতে একবারই ব্যাণ্ডেজ করিবে। শুষ্ক ব্যাণ্ডেজ ২।৩ দিন ও রাখিতে পারা যায়। (বারান্তরে সমাপ্য)

শ্রীকেশবচন্দ্র দাস।

ভ্রমর।

আমি এসেছি আমারে ঢাকিতে,
তব সোহাগ পরাণ মাখিতে।
আজিকে তোমার ফুটিয়াছে ফুল,
সৌরভে মোর পরাণ আকুল,
তাই আসিয়াছি ফুটাইতে হুল,
তোমার কমল কলিতে;
এতদিন বড় সয়েছি যাতনা,
সকাল সন্ধ্যা কত আনাগোনা,
কিছুতে তোমার ঘুমটি ভাঙেনা,
পারনি নয়ন মেলিতে।
কত যে কয়েছি আদরের কথা,
কত যে ছন্দে গাহিয়াছি গাথা,
নেড়ে নেড়ে দিছি তব নব পাতা,
কিছুতে পারিনি ফোটাতে;

আপন গরবে ছিলে গরবিনী,
এমন তো আর কোথাও দেখিনি,
কত মধু আছে না জানি—না জানি
তোমার কাঁটার বোঁটাতে।
আমি গো পিয়াসী দাও দাও মোরে,
ঢেকে লও তব পাঁপড়ীর আড়ে,
তোমার পরাগ সোহাগের ভরে
মেখে দাও মম তনুতে;
যা কিছু আমার—তুমি লও সব,
চুপ হোক্ মোর গুণ গুণ রব,
করে দাও মোরে নিথর নীরব
তোমার রেণুর অণুতে।

—দরবেশ।

পূর্ব্বতন প্যাটেল বিলের শিক্ষা।

প্রবন্ধারম্ভেই বক্তব্য, আমরা প্যাটেল বিলের সপক্ষেও ছিলাম না, বিপক্ষেও নহি। আমরা আন্তরিকতার পক্ষে। প্যাটেলবিলের ভাব যদি কতকগুলা সুবিধাবাদীর আপাত-মনোরম বিষয় হয়,মৌখিক বক্তার আন্দোলনে পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে এই বিল পাশ হইলেও মাকালফল মাত্র হইয়া থাকিত, তাহাতে আমাদের অনুমাত্র ও সন্দেহ নাই।

আমরা সভা সমিতিতে যোগ দিয়া যতটা বুঝিয়া ছিলাম, তাহাতে ইহাই বোধ হয় যে, কোন দলই তেমন প্রাণ হইতে, ব্যথার সহিত এই প্যাটেল বিলকে সমর্থন বা বর্জ্জন করেন নাই, কেবল দলাদলি ও গালাগালি করিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালীর যাহা চিরন্তন স্বভাব, তাহারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

হিন্দুরা বলিলেন—হিন্দুধর্ম্ম গেল গেল! ব্রাহ্মরা ভাবিলেন, এইবার একাকার করিবার একটা মহা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এইবার ভারত উদ্ধারের প্রকৃত দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল! আরে মূর্খ, হিন্দুধর্ম্ম কি যায়! গরু খাইয়া যখন হিন্দুধর্ম্ম যাইতেছে না শুয়ার মেয়ে বিবাহ করিয়া যখন হিন্দুধর্ম্ম যায় নাই, তখন প্যাটেল বিলে হিন্দুধর্ম্ম যাইবে? হিন্দুধর্ম্ম যাইবে না, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ আর একরূপান্তর ধারণ করিবে! চীনেরা টিকি ফেলিয়াছে বলিয়া কি চীনধর্ম্ম ও চীনসমাজ ধরাতল হইতে মুছিয়া গিয়াছে? তেমনি এই ভারতবর্ষ পৈতা ফেলিয়া দিলেও ব্রাহ্মণ মুছিয়া যাইবে না। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ তখন আর এক নবকলেবর ধারণ করিবে। এখন একমাত্র পৈতাই ত তোমার ব্রাহ্মণত্বের পরিচয়, একমাত্র জাতিভেদই ত তোমার হিন্দুত্বের পরিচয়? এমন পৈতা, এমন জাতিভেদ না থাকিলেই কি নয়, যাহার কোন অর্থ নাই! কোথায় সে কৌলিন্যের গুণ, অথচ তুমি কুলীন, দুশ্চরিত্রতায় তুমি জর্জ্জরিভূত, অথচ মোহান্তের আসনে সমাসীন! ভণ্ডামি অথচ গোঁড়ামি কি শোভা পায়? হে হিন্দু, হে ব্রাহ্মণ, এমন অপকর্ষ লাভ আর কোন জাতি করে নাই যেমন তুমি করিয়াছ, তোমার মত মর্কট ত জগতে আর দেখিতে পাই না। এতটা অভাবনীয় পতন আর কোন জাতির ও ঘটে নাই! কেন? তুমি অত্যাচারের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছ। হোক না কেন ব্রাহ্মণ, আর হউক না কেন ইংরাজ, এই ভারতবর্ষে যিনিই ধর্ম্মের নামে, শাসনের নামে অত্যাচারী হইবেন তিনিই অধঃপতিত হইবেন। এই কর্ম্মভূমিতে ভোগ কখনও সহ্য হয় না—অত্যাচার সহ্য হয় না—সাধক ভিন্ন এই ভূমিতে ভণ্ডের স্থান নাই। যাঁহারা ত্যাগী, যাঁহারা সংযমী যাঁহারা আপনাকে ভুলিয়া অপরকে ভালবাসিতে জীবন ঢালিয়া দিয়াছেন, কেবল তাঁহাদেরই জন্য এই ভূমি বিধাতৃ বিহিত হইয়া রহিয়াছে! যে ব্রাহ্মণ এই ভূমির সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, সেই ব্রাহ্মণ যখন কুটিল হইল,ঘৃণা করিতে শিখিল, অমনি বিধাতার অভিসম্পাৎ তখনই বর্ষিত হইল; যখনই ব্রাহ্মণ চুরি করিয়া পার পাইয়া

যাইতে লাগিল তাঁহার সাত খুন মাপ হইতে লাগিল, আর শূদ্র শত শত অত্যাচার সহ্য করিয়া ভগবানের দিকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিল, তখনই ভূভারহারী ভগবান আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার ন্যায়ের আসন কাঁপিয়া উঠিল। তাহার ফলে, আজ ব্রাহ্মণ কি না দুর্দ্দশার নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছে! ভারতবর্ষকে এমন ভাবে পরাধীন বোধ করি ইংরাজও করিতে পারেন নাই, এমন ভাবে মাথায় পা বুঝি ইংরাজও তুলিয়া দিতে পারে নাই। তুমি অনাচারী, অত্যাচারী বাসনাসক্ত, অথচ পৈতার বলে আমার মাথায় পা তুলিয়া দিবার সময় গুরু-ঠাকুর! ভারতবাসীর চক্ষু ক্রমশঃই ফুটিতেছে, বিংশ শতাব্দির অই সর্ব্বতটপ্লাবী-স্বাধীনতা গঙ্গা আসিয়া আমাদিগকে কি এক স্নেহশীতল ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন। আজ কি তোমার এ অন্যায় আব্দার কেহ সহ্য করিতে পারিবে, আর কি পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিতে পারিবে? তাই চারিদিক হইতে তোমার অসার বাঁধন খুলিবার পালা চলিয়াছে। তোমার আত্ম-সংশোধনের জন্য ভগবান তোমাকে যথেষ্ট সময় দিয়া-ছিলেন, কিন্তু ভাই, তুমি ত কিছুই করিতে পারিলে না; তুমি ভারতবর্ষের আপনার লোক হইয়াও, ভারতবাসীকে পর করিয়া রাখিয়াছ, তোমারই স্বদেশজাত পতিত ভাই গুলিকে তুমি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছ। তোমার এমনি জাতিভেদ যে শূদ্রের ছায়া মাড়াইলে তোমাকে এই বিংশ শতাব্দীর দিনেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অথচ তুমি বিজেতার জুতার তলায় আপনার মস্তক অবনত করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নও! এই ভণ্ডামি আর বড় অধিক দিন এই নিরীহ ভারতের ভার বৃদ্ধি করিতে পারিবেনা। পরাধীনতাকে নাশ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তোমার দর্প দম্ভকে কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দিতে হইবে। স্বায়ত্বশাসন যদি আরম্ভ হয়, তবে তোমাকে শাসন করিয়াই হইবে। তোমার অভিমানকে যেদিন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কালের কবলে ফেলিয়া দিতে এদেশ সক্ষম হইবে, সেদিন হইতেই এ জাতির নবজীবনের সূচনা। এই নবভাব তোমাকেই সর্ব্বাগ্রে সায়েস্তা, করিতে আসিতেছে—তোমার গুরুগিরি তোমার পৌরহিত্যে বাধা দিতে আসিতেছে। ভারতের শ্রাদ্ধ শান্তি আর তোমাকে তেমন করিয়া করিতে দিবে না। তোমার মন্ত্র তন্ত্রের আবশ্যকতা আর থাকিবে না। এই মহার্ঘের দিনে তোমার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃই ভারবহ হইয়া পড়ি-তেছে; তুমি ধুইয়া মুছিয়া গেলেই যেন আমরা শান্তি পাই।

আবার নবভাবে, নব তেজে ব্রাহ্মণ জাগিয়া উঠুক। ব্রাহ্মণ কি কেবল তুমি? ব্রাহ্মণ যে এই ব্রহ্মাবর্ত্তের প্রতি পরমাণু—প্রতিপদরেণু! প্রতি সৃষ্টির কণায় কণায় আমি যে ব্রাহ্মণত্বের মহাবিকাশ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না! এই দেশের মানুষকে ছোট করিতে হইলে, যে আপ-নারই মাথা হেঁট হয়! অগ্রজন্মা কেবল তুমি নও, এই ভারতবর্ষের কীটানুকীট পর্য্যন্ত অগ্রজন্মা। এই দুর্লভ ভূমিতে যেই জন্মায় সেই সার্থক হইয়া যায়। এই মহা বৃন্দাবনের বানর হইতেও যে সুখ! কত তপস্যা করিলে তবে এই মাটিতে সামান্য কীট হইয়া জন্মাইবার অধিকার পায়—এদেশে জন্মাইবার ও কি একটা গৌরব নাই? মনুষ্য জন্ম ত দূরের কথা, এই কর্ম্মভূমির আঁস্তাকুড়ের

অতি একান্তে জন্মিয়াও যে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার! এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারিলাম কই, ভাবিতে শিখিলাম কই?

"ভেদের ভিতরে মাগো রেখনা ভারতে আর
একসূত্রে বাঁধ এই জাতির হৃদয় হার
চতুর্ব্বর্ণ এক হয়ে, যাক্ যুগ স্রোতে বয়ে
শুধু শ্যামবর্ণ তোর জাগে যেন অনিবার
যে দিকে ফিরাই আঁখি শ্যামরূপ যেন দেখি
অভেদপ্রতিমা শ্যামা, করে দে মা একাকার॥"

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন আমি সমগ্র ভারত প্রদক্ষিণ করিতে ছিলাম, তখন এই ভাবের বহু গান আমার প্রাণ হইতে উত্থিত হইয়া ছিল। ভিতরে বাহিরে অত্যাচার আমরা যত ভোগ করিয়াছি, ভিতরে বাহিরে কপটতা আমরা যত সহ্য করিয়াছি, এমন বোধ হয় কোন জাতিই করে নাই! সমগ্র দেশটার যেখানেই গিয়াছি, আতিথ্য পাইয়াছি বটে, কিন্তু কেবলি ভেদ, কেবলি ব্যবধান দেখিয়া, ভবিষ্যতের আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়া, নিরুপায় হইয়া দেশমাতৃকার শরণাপন্ন হইয়াছি! ডাকার মত ডাকিতে পারিলে দেশ-জননী সাড়া দিয়া থাকেন। মা নীরবে থাকিতে পারিলেন কই? প্যাটেলবিলকে আমি জাতীয়তার সাড়া বলিয়া মনে করি।

"আজ মহাজাতিরূপে দেখা দেও জননি গো
বিরাট সহস্র শীর্ষ পুরুষ হইয়ে জাগো
এস মা জনমভূমি, জননী জননী তুমি
উজল উঠগো পুনঃ ভারত ভবিষ্য ভাগ॥"

মা এই দীন সন্তানের কাতরোক্তিতে যে কর্ণপাত করিয়াছেন, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

এই নব্যভারতেই আমি "ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ" ও "মানবোৎকর্ষ বিজ্ঞান" নামক প্রবন্ধদ্বয়ে প্যাটেল বিলের অনেক সমস্যা বহুপূর্ব্বেই সমাধান করিয়া রাখিয়াছিলাম। সে সব কথার পুনরুল্লেখ না করিয়া কেবল একটি কথা আমি বলিতে চাই যে, এই জাতীয়তার সাড়ায় আমরা যে সাড়া দিতেছি তাহা কি আন্তরিক? বাস্তবিকই কি আমরা মায়ের ডাক—বিরাট জাতীয়তার আহ্বান উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি—ইহাতে আন্তরিক শ্রদ্ধা আমাদিগের কতটুকু? না কেবলি মৌখিকতা লইয়া আজ আমরা উপস্থিত, ইহাই বিবেচ্য! যাঁহারা প্যাটেল-বিলের স্বপক্ষে ঢক্কানিনাদ করিয়াছেন, বাস্তবিকই কি তাঁহারা আন্তরিকতার সহিত সমর্থন করিয়াছেন না সাময়িক উত্তেজনার বশে কেবল বক্তৃতার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না। তবে সুখের বিষয়, এ কেবল বাঙ্গালীর ব্যাপার নয়, সমগ্র ভারত-বাসীর ব্যাপার। তাহা না হইলে কেবল বাঙ্গালীর নিকট সেই সুফলের আশা করা বৃথা।

প্যাটেলবিলের গুরুতর দিকটা আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি কি? এই বিল কেবল কতক গুলা সুবিধাবাদীর আত্মতৃপ্তিতে পর্য্যবসিত হইলে ইহার দ্বারা ভারতবাসীর অকল্যাণ ও নৈতিক অবনতি ঘটিত। কিন্তু তাহা না হইয়া ইহা যদি ত্যাগ স্বীকার ও জাতীয়তা গঠনের প্রকৃষ্ট উপায় স্বরূপ হয়, তবেই মঙ্গল ও ভবিষ্যতের পক্ষে আশাপ্রদ।

যাঁহারা প্যাটলবিলের জন্য লালায়িত হইয়া পড়িয়াছেন তাহারা কার্য্যতঃ কিন্তু প্যাটেলবিল হইতে সরিয়া পড়িয়া থাকেন। উদারভাবাপন্ন হইয়াও নিজের বেলায় জাতি-ভেদের পাণ্ডা হইয়া বসিয়া আছেন, ব্রাহ্ম হইয়াও কন্যার বিবাহকালে ব্রাহ্মণপাত্র খুঁজিতেছেন। বিন্দুমাত্র স্বার্থত্যাগ করিতে

ইতস্ততঃ করিতেছেন। বলিয়াছি ত প্যাটেল-বিলের সুবিধাবাদ আনিয়া ফেলিলে,ভারতের বিরাট জাতীয়তা পণ্ড হইয়া যাইবে। এই বিলের ভাবকে সার্থক করিতে হইলে যথার্থ ত্যাগীর প্রয়োজন। যে দিক দিয়াই যাও, যে অনুষ্ঠানই গ্রহণ কর,ত্যাগ ভিন্ন কল্যাণ নাই। সর্ব্ব কার্য্যের মূলে এই ত্যাগ।'

এই ত্যাগ—এই পরকে, অবনতকে তুলিয়া ধরিবার জন্য উন্নতের আত্মদান পূর্ব্ব ভারতে,পূর্ণ মাত্রায় ছিল বলিয়াই, ভারত শীর্ষ স্থানে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিল! পরাশর কেন সত্যবতীর গর্ভে বেদব্যাসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, জামদগ্ন্য কেন রেণুকার গর্ভে পরশুরামকে জন্ম দিয়াছিলেন, ভীষ্ম কেন রাজ্য ছাড়িয়া আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, কেন বশিষ্ঠ অক্ষমালাকে বরণ করিয়াছিলেন? ইহার মূলে ছিল কেবল শুভ উদ্দেশ্য। পুরাকালে মন্দকে তুলিয়া ধরিবার জন্য ভালকে আত্মত্যাগ করিতে হইত। আজ যদি আমরা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া নীচ জাতির ভিতর অর্থের লোভে, রূপের মোহে বিবাহ করিতে যাই, তবে এই জাতীয়তার অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই পণ্ড হইবে। আর যদি ধর্ম্ম ভাবিয়া, কর্ত্তব্য ভাবিয়া—ভগবানের বিরাট উদ্দেশ্যকে স্মরণ করিয়া সর্ব্বোপরি মহা জাতীয়তকে স্মরণ করিয়া, জাতি ভেদের মূলে কুঠার আঘাত করিতে অসবর্ণ বিবাহ করি,তাহার ফল নিশ্চয়ই শুভ হইবে।

আমি এই প্রবন্ধে কোনরূপ শাস্ত্রের দোহাই দিতে চাহি না। আমাদিগের হিন্দু শাস্ত্র এক মহাসাগর বিশেষ! এমন তট নাই, এমন বিষয় নাই যাহা এই সাগর প্লাবিত করে নাই, আশ্রয় দেয় নাই, সমর্থন করে নাই, স্পর্শ করে নাই। কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিলে সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দলকেই হার মানিতে হইবে। তাহা ছাড়িয়া বরং আমি দেশকালপাত্র লইয়া এই আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের আবশ্যকতা আছে কিনা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে আমাদিগের বর্ত্তমান লক্ষ্য কি? ভবিষ্যতের ভারতবর্ষকে আমরা কিরূপ উপাদানে গঠিত করিতে চাই? এতকাল কিসের জন্য তোমরা সাধনা করিয়া আসিতেছ? যদি বাস্তবিকই তোমাদের বিন্দুমাত্রও আন্তরিকতা থাকিত,তাহা হইলে আজ এই বৃথা কলহে ও কোলাহলে সময় ক্ষেপন করিতে পারিতে না। তোমাদিগের ব্যবহারে চিন্তাশীল মাত্রেই নীরব এবং নিরাশ হইয়া পড়িতেছেন। আরও গুঁতা, আর জুতা না হইলে ত তোমাদিগের জাতীয় মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবে না? আরও নিষ্পেষণ আরও নির্য্যাতন ব্যতীত তোমাদের গোঁড়ামি ও ততোধিক গুণ্ডামি ত যাইবার নহে! একদিকে বিধাতার চাপ, অন্যদিকে বিজাতির চাপ যদি তোমাদিগের কোন কালে চৈতন্য সঞ্চার করিতে পারে। বাহির হইতে তাড়া না পাড়লে, ভিতর হইতে তোমরা সাড়া দিবার জাতি নহ, কারণ,পরাধীনতা যে তোমাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে!

সমগ্র ভারতবাসীকে একতার হারে গ্রথিত করিতে হইবে সমগ্র ভারতবাসীকে ব্রাহ্মণ করিতে হইবে—সমগ্র ভারতবাসিকে একটা সুমহান্ গৌরবে এবং গর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আজ আভিজাত্য কেবল তোমার একচেটিয়া অধিকার নহে। আজ আভিজাত্য সকলকার, সকলকেই আজ ব্রাহ্মণত্বে বরিত করিতে হইবে! আজ আর কেহ অস্পৃশ্য, কেহ ছোট নহে! আজ সকলেই আমরা বিরাট

জাতীয়তা স্বরূপিনী মহীয়সী, গরীয়সী জননা-জন্মভূমির সন্তান! এই গৌরবে বুক না ফুলাইলে কি কোন দিনও আমরা উঠিতে পারিব ? হে নিদ্রিত, হে অসাড়, উঠ জাগ আবার অগ্রসর হও, আবার জগতকে দেখাও তুমি মর নাই, শুধু ঘুমাইয়াছিলে—নব সৃষ্টির জন্য তপস্যায় নিমগ্ন ছিলে। জগৎ আজ তোমারই মহা উদ্বোধনের অপেক্ষা করিতেছে। হে ভস্মাচ্ছাদিত বৈশ্বানর, এই মহা-দুর্দ্দিনেও তোমার এক একটি স্ফুলিঙ্গ যে দিকে গিয়া পড়িয়াছে, সেই দিকেই জগৎ আলোকিত হইয়াছে; বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি তাহার প্রমাণ।

প্রতিভার অন্বেষণ এবং পতিতের উত্তোলন, আজ এই কর্ম্মদ্বয়কে আমাদিগের প্রত্যেকের মহা কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই মহা দায়িত্ব ভারগ্রহণের জন্য আজ আমরা সকলেই কি প্রস্তুত ? যিনি এই দুইটা বিষয় বাদ দিয়া দেশহিতৈষী সাজিতে যান, তিনি ভণ্ড। প্রতিভাকে চাপা দিয়া এবং পতিতকে পশ্চাতে ফেলিয়া, যিনি জাতীয়তার স্বপ্ন দেখেন, তিনি দেশকে বঞ্চিত করিতেছেন মাত্র! ভারতবাসির প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য যদি এই দুইটা বিষয় না হয়, তবে ভবিষ্য ভারতের উত্থান সুদূর পরাহত। আজ বড়কে ছোট হইয়া ছোটকে বড় করিতে হইবে—এই আত্মত্যাগ দেখাইতে না পারিলে ভারতবাসির কল্যাণ নাই।

এই জন্যই বুঝি পুরা-ভারতের, দশম প্রজাপতি যযাতি, শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর অপেক্ষা কম ভাল বাসিতেন না—এবং এই জন্যই যুধা যদু অপেক্ষা পুরু যযাতির অধিকতর স্নেহের পাত্র হইয়াছিল। ছোটকে বড় করিবার জন্য, বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্য দিবার জন্য ভীষ্মের ব্রিশ্বর্গী সাজিবার কি আগ্রহ—কি আত্মদান। এক সময়ে ত্যাগই ভারতবাসীর ভূষণ ছিল, অপমানই ব্রাহ্মণের ভূষণ ছিল—আর এখন অভিমান ও অহ-ঙ্কারই এজাতির ভূষণ হইয়াছে। কই অস-বর্ণবিবাহের ফল বলিয়া পুরু, বিচিত্রবীর্য্য প্রভৃতি ত পতিত হন নাই? বেদব্যাস, পরশুরাম প্রভৃতি গুণহান এবং মানুষের বিচারেও ত ক্ষীণ হন নাই।

দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ জন্মিয়াছিল—কোন বংশানুক্রমের বলে? প্রহ্লাদ যখন গর্ভাবস্থায় ছিল, তখন নারদ হরি-কথা শুনাইতেন। তাহাতে প্রতিবেশ প্রভাবেরই জয় ঘোষিত হইতেছে, বংশানুক্রমের নহে। ভাল বাপ মায়ের মন্দ ছেলে হয় কেন? খারাপ বাপ-মার ভাল ছেলেই বা জন্মায় কেন? এই সমস্যার কোন দিনও সমাধান করিতে পারি নাই—এই প্রশ্নটা আমাকে চিরদিনই ব্যথিত করিয়া আসিয়াছে। মনুষ্য জন্মের একটা উদ্দেশ্য আছে। মনুষ্য জন্ম ত গরু ঘোড়ার উৎপাদনের ব্যাপার নহে, এই জন্মে দৈহিক-প্রভাব অপেক্ষা মানসিক প্রভাব অগ্রে। মন লইয়াই মানুষ, মানুষ মনে জন্মায়! মনেই পুনর্জ্জন্ম লাভ করে। মানুষ এক জীবনেই বহুবার জন্মায় একই জীবনে যত-গুলি সংসর্গ আমরা লাভ করি, ততবার জন্মাই। আজ যাহা আছি, কাল তাহা নাই। আমরা একই জীবনে মরি ও অনেক বার, জন্মাইও অনেকবার। এইরূপ জনম মরণের ঘাত প্রতিঘাতে অতি বৃদ্ধ মানব শিশু জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া পরিবর্দ্ধিত। এই গভীর কথা যদি আমরা তলাইয়া ভাবিতাম, তাহা হইলে এমন মহাদেশে জন্মাইবার

সৌভাগ্য পাইয়াও আমরা এইরূপ উত্থান শক্তিহীন ও পরমুখাপেক্ষী কূপমণ্ডূক হইয়া থাকিব কেন?

আমাদিগের যদি সত্য সত্যই দেশের জন্ত প্রাণ কাঁদিত, তাহা হইলে প্যাটেল-বিল লইয়া বিজাতির দ্বারে "পাশ করগো" বলিয়া হত্যা দিতে হইত কেন? আমরা নিজেরাই কবে ইহার বিরাট উপকার উপলব্ধি করিয়া বিরাট জাতীয়তার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতাম। প্যাটেলবিল পাশ হইলেই যে উদ্দেশ্য সফল হইত, ভারত উদ্ধার হইত, এ বিশ্বাস আমার নাই। আজ অর্দ্ধ শতাব্দির উপর হইতে চলিল বিধবা বিবাহ বিল পাশ হইয়াছে, অথচ বেশ্যার দল হু হু করিয়া বাড়িতেছে কেন? বিধবা বিবাহ কেবল নামমাত্র আছে, কাজে কিছুই হইতেছে না। তেমনি এই প্যাটেল বিলে যদি পতিতকে উত্তোলন করিবার চেষ্টা না থাকে, ত্যাগ স্বীকার না থাকে এই প্রকার বিল পাশ হইলেও ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরে অবস্থান করিবে। আজ ধর্ম্মবীর বিবেকানন্দ, মহাকবি হেমচন্দ্র যদি জীবিত থাকিতেন, তাঁহারা প্যাটেলবিলকে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিতেন। তোমাদিগের বাঙ্গালীত্ব ও হিন্দুত্ব বিবেকানন্দ ও হেমচন্দ্রকে লইয়া যতটা, ততটা ভাটপাড়ার মাঠাকরুণ শিরোমণি-দিগকে লইয়া নহে। আমরা বিবেকানন্দ হেম চন্দ্রকে যেভাবে মস্তকে রাখি ততটা শিরোমণি মহাশয় সকলে নহে। কেন এমন হয়? কেন শিরোমণিগণ আর হিন্দু বাঙ্গালীর মস্তকে স্থান পান না? তাহার প্রথম কারণ, হিন্দুর চক্ষু ক্রমশঃই প্রসারিত হইতেছে আর গুরুগিরি করিয়া দমবাজীতে শিষ্যকে রাজী করিতে পারিবে না। আর প্রতারণা করিয়া প্রকৃত হিন্দুর মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিতে পারিবে না। তুমি বিধান মানিয়া চল না, অথচ বিধান দিতে ওস্তাদ! তুমি বেশ্যার কর্ণে মন্ত্র দিয়া সমাজে আসন পাও, যবণীর চুম্বন গ্রহণ করিয়াও তোমার জাতি যায় না, পংক্তি ভোজনে স্থান পাও, তাহাতে সমাজ, ধর্ম্ম তোমার টলে না, আর যত পাপ, যত স্পর্শ দোষ নিরীহ শূদ্রের বেলায়। আজীবনকাল বেশ্যালয়ে অতিবাহিত করিয়া যখন তোমার জাতি যায় না, ধর্ম্ম ঠিক থাকে, তখন অসবর্ণ বিবাহে জাতি যাইবে, ধর্ম্মই বা যাইবে কেন? তোমার জাতি আছে কি যে, জাতি যাইবে? আবার নূতন করিয়া জাতির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সে প্রতিষ্ঠার বনীয়াদ—মহা সমন্বয়ের উপর—অভেদ ভারতের বিরাট সংহতি শক্তির উপর। আবার বাছাই করিতে হইবে। এখন কে ব্রাহ্মণ, কে শূদ্র, চেহারা দেখিলে ধরা যায় কি? ব্যবহারেও ধরা যায় না। এখন বর্ণসঙ্কর সকলেই। জন্মাতে ভাবের ঘরে চুরি চলে, পৈতা পরিলেই এখনও এদেশে পদধূলি গ্রহণ করে, কিন্তু কর্ম্মে যে ধরা পড়িয়া যাও—কর্ম্মে যে পদে পদে তুমি পতিত হইতেছ, কর্ম্মে যে ব্রাহ্মণ বলিয়া তোমাকে চেনা যায় না। কর্ম্মে তুমি বর্ণসঙ্কর। আমরা গুণ এবং কর্ম্মের পক্ষপাতী, ভারতবর্ষকে আবার নূতন করিয়া গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ করিতে হইবে। তাহাতে শূদ্রের ভিতরে যাহারা উন্নত তাহাদিগকে তুলিয়া ধরিতে হইবে, ব্রাহ্মণের ভিতরে যাহারা অবনত হইয়া পার পাইয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে নামাইয়া দিতে হইবে। শূদ্র যদি বাস্তবিকই উন্নত চরিত্রের হয়, তাহার কন্তা বা পুত্রকে ব্রাহ্ম-

গের, ব্রাহ্মণ করিয়া লইতে দোষ কি? ইহাতে অনুলোম প্রতিলোম নাই। শিক্ষা এবং সচ্চরিত্র অনুলোম প্রতিলোমকে এক করিয়া-দেয়।

আমরা ব্রাহ্মণ শূদ্র বুঝিনা, আমরা চাই ভিতরের গুণ, ভিতরের বিকাশ, আমরা চাই আত্মার সৌন্দর্য্য—অন্তরের পবিত্রতা। যিনি প্রকৃত গুণে গুণবান্ তিনিই আমাদিগের পূজ্য। কাহাকে নিন্দা করি, কাহাকেই বা বন্দনা করি—নারায়ণ যে সর্ব্বত্র। ইচ্ছা করিলে তি'নি চণ্ডাল বংশেও জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন। কেমন করিয়া জোলার বংশে মহাভাবুকের সৃষ্টি হয়, পরমহংসদেব কতই বা পণ্ডিতের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন—বিদ্যা বুদ্ধি তাঁহার কি ছিল, কতই বা জাতিভেদ মানিতেন, কিন্তু অমনটি আর কোথাও দেখি। সাধনার বলে যিনি ব্রাহ্মণ তিনিই ব্রাহ্মণ। তাহা না হইয়া কেবল মুখস-পরা, খোলস-ধরা ব্রাহ্মণ হইয়া আর চক্ষুষ্মাণ ভারতবাসীকে ভুলাইতে পারিবে না। সম্পর্ক গুণে গুণে, সম্পর্ক সমানে সমানে। ব্রাহ্মণ শূদ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য ত সকলের শরীরেই রহিয়াছে। ঘৃণা করিবে কাহাকে —আপনার হস্তপদকে কি ঘৃণা করিতে পারি। আমিই যে সর্ব্বগুণাধার! সকলকে লইয়াই যে আমার জীবন-যাত্রা। সত্ত্ব-তম রজ গুণের কোনটাই যে আমার উপেক্ষার সামগ্রী নহে। তম ও রজ যে সত্ত্বেরই আশ্রয়। সেই আশ্রয়-রক্ষার আমরা কি কোন চিন্তা করিতেছি? হায়, যে আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া আজ মাথা বাঁচাইয়া রাখিয়াছি সেই আশ্রয়েই আমরা পদাঘাত করিয়া আনন্দ অনুভব করি। যদি নিজে উন্নত হইতে চাও আপনাকে উন্নত কর ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের ত্যাগ স্বীকারের উপরেই জাতীয় উত্থান। বুদ্ধিদাতা এবং ধনদাতার স্বার্থপরতাই জগতের দুঃখের হেতু। কেন ইউরোপ আজ ছিন্নমস্তা, কেন ভারতবাসী আজ হীন হইতেও হীন? তাহার কারণ, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য—Minister এবং Capitalist দিগের হৃদয়হীন স্বার্থপরতা। আজ জগতের সর্ব্বত্রই শ্রম এবং আশ্রয় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। কারণ তাহারাও ত মানুষ—জীবন্ত মানুষ-জড় পিণ্ড নহে। তাহারা আজ বুদ্ধি ও ধনকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য ভীম ভৈরব রবে অগ্রসর। এমন কি চিরপরাধীন ভারতবর্ষ ও আজ সেই মন্ত্রে অগ্রসর। অতি আঘাত প্রাপ্ত হইলে জড়েরও চেতনা হয়—নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ ও জাগিয়া উঠে।

আজ সেই দিন, সেই কাল। যখন—
কালের বিধানে গেছে ব্যবধান
কেবা কার প্রভু কেইবা দাস,
বিশ্বের কাজে সবে এক সাজে
মিলিয়াছে তাই ভাইয়ের পাশ;
আজ, ধনীর শীর্ষ উন্নত ভূমে
অভিজাত যত পদতল চুমে
বাঞ্চত যারা ছিল চির-ঘুমে
জাগিছে লইয়া নূতন আশ।
ঘরে ঘরে আজ কর্ম্মীর জয়
বিলাসীর দিন আর কভু নয়
পতিত যাহারা উঠিছে তাহারা
প্রভুর দর্প করিতে নাশ
আজ জাগিছে কর্ম্মী, সমান ধর্ম্মী
নহে কেহ প্রভু না হবে দাস।
শ্বেত ও কৃষ্ণ নাহি রবে ভেদ
শূদ্র ব্রাহ্মণ ঘুচে যাবে খেদ
সমান বর্ণ সমান ধর্ম্ম
সমান কর্ম্ম সমান বাস।

আজ—

প্রবল যাহারা লভিছে তাহারা
জনগণ পদে মরণ ত্রাস।

এই সঙ্গীত শুধু আমার মতন অকিঞ্চনজনের কণ্ঠ হইতেই উত্থিত নহে—ইহাই নবযুগের নব জগতের নব অভিপ্রেরণা!

জাগ শ্রমী, জাগ শিল্পী, জাগ এই মহা জীবন সঙ্গীতে অনুপ্রাণিত হইয়া জাগ—তোমাদিগের নীরব ক্রন্দনে বিধাতার আসন টলিয়াছে—দর্পদম্ভের অভিনয়ের শেষাঙ্কে আমরা আজ উপনীত। দেখ দর্শক দেখ, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখ, আজ তোমাদিগেরই জন্ম জীবন কি নবভাবে জাগ্রত! কি নব আশায় উন্মাদিত, আজ দর্পীদম্ভী মানুষ বুঝিয়াছে—Man is a name of honour for a king. যাহা স্বপ্ন, তাহা বিধাতার নির্ম্মম কশাঘাতে, জীবন-মরণের মহা অগ্নি পরীক্ষায় সত্যে পরিণত হইতে ছুটিয়াছে। প্রকৃতির প্রতিশোধ বড় ভয়ঙ্কর। বিধাতার রুদ্রচক্ষু ব্যতীত, এই মহা সমন্বয়ের আর উপায় ছিল না—স্বার্থপর মানুষ কি অল্পে ছাড়ে, দেখিয়া সংশোধিত হয়, চাপে না পড়িলে? হিন্দু যে যায়। এই বিরাট জাতিটা যে কত রকমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে, হিন্দুতে হিন্দুতে কত বিরোধ—কত দ্বেষ-হিংসা—তাহা ভাবিলে বাস্তবিকই আশা ভরসা ছাড়িয়া দিতে হয়। সমগ্র ভারত প্রদক্ষিণ করিয়া কোথায়ও ত একতা খুঁজিয়া পাইলাম না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি প্যাটেলবিলের গূঢ় মর্ম্ম হেমচন্দ্রের সেই মহা স্বপ্নকে সফল করিবার প্রধান উপায় স্বরূপ হউক।

একবার সবে জাতিভেদ ভুলে
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শূদ্র মিলে
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা ধ্বজা।

কবির এই স্বপ্ন ভারতবাসী অসবর্ণ বিবাহে সার্থক করিয়া দিক্। কোনদিন শুধু আইন পাস হইলে, সে স্বপ্ন কতটুকু সার্থক হইবে বলিতে পারি না—এই বিবাহে সমগ্র ভারতবাসির যদি একাগ্র প্রাণ ও সহানুভূতি না থাকে। প্রতিভার অন্বেষণ ও পতিতের উত্তোলনের জন্য, সর্ব্বোপরি জাতীয়তা স্বরূপিণী জননী জন্মভূমির মহা একতা সাধনের জন্য হিন্দুতে হিন্দুতে, হিন্দু ও মুসলমানে আজ অগ্রসর হও, এবং এক অখণ্ড পরিবারে গঠিত হও। প্যাটেলবিলের মর্ম্ম চিরন্তন হউক, সার্থক হউক!

শ্রীঅকিঞ্চন দাস।

বন্ধুর অকাল মৃত্যুতে

(১)

পিতৃশোকের অন্তর্দ্দাহে জীবন আমার যাচ্ছে
জ্বলে,
তাহার উপর নতুন করে একি গভীর জ্বালা!
প্রোজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আবার ঘৃত ঢালা!
হা ভগবান্, হৃদয় দিয়ে বড্ড ভালোবেসেছিলাম,
ভালোবাসার এই কি প্রতিফল!
ভালোবেসে নির্জ্জনে হায়, এমনি করে ফেলবো
চোখের জল!
নাইকো সময় নাই অসময় তাহার সাথে সকল
সময়
নানান্ রকম গল্পগুজব দেশবিদেশের কথা!
ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, কত জাতির অধঃপতন
হিন্দুসমাজ, গান্ধীর কথা, বিরাট্ জাতীয়তা!
মাতৃভাষা, নবীন প্রাচীন সকল রকম কাব্য-
গাথা,
কাহার সাথে দিনরজনী করবো আলোচনা
আর কি তাকে দেখ্‌তে পাবো, কোথায় গেছে
কোন্ সুদূরে,
এই জীবনে কণ্ঠ তাহার, আর কি যাবে শোনা!

(২)

হোক্ না চির-পল্লীবাসী, দেশবিদেশের
রাখ্‌তো খবর,
অনেক কথাই তাহার ছিল জানা।
তাহার মত কাব্য পাঠক এই জীবনে কম
দেখেছি,
বাস্তবিকই কবির মত ছিল হৃদয়খানা!
পূর্ব্ববঙ্গের নিঃস্ব কাঙাল বীর্য্যবন্ত দাসকবিকে
প্রাণের চেয়ে বাস্‌তো বেশী ভালো।
তাঁর কবিতাই প্রথম তাহার জাল্‌লো প্রাণে
আলো!

তারপরে সে ক্রমে ক্রমে ঠাকুর দত্ত রায়
বড়ালের
হৃদয় দিয়ে পড়্‌লো লেখাগুলি,
আকুল হয়ে আহার নিদ্রা ভুলি!
আলয় থেকে ক্রোশান্তরে, নিত্যি এসে আমার
গৃহে,
আমার সাথে পড়াশুনা নাগাদ দুপুর রাতি!
এমন পাঠক এমন শ্রোতা এই জীবনে আর
পাবোনা,
উদ্বেলিত শোকোচ্ছ্বাসে যায় যে ফেটে ছাতি!
তাহার সাথে দশটি বছর আগে আমার
হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলা প্রথম পরিচয়।
আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে আমার মত ক্ষুদ্র
কবির,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখা এবং কথার ভিতর দিয়ে,
কখন্ হলো হৃদয়-বিনিময়!
আঁধার রাত্রি, ঝড় ঝঞ্ঝা, মুহুর্মুহু বজ্রনিপাত,
বাদ্‌লা দিনের উদ্‌লা বাতাস, সর্পভীতি, শীত
এসবগুলি তুচ্ছ করে রাতদুপরে পড়ার পরে,
ক্রোশান্তরে আপন গৃহে যেতো সুনিশ্চিত।
পীড়াপীড়ি করলে কভু যাহা দিতাম খেতো
সুখে,
কিন্তু তবু রইতো না মোর গৃহে;
কারণ জিজ্ঞাস্ করলে পরে বল্‌তো ঈষৎ
মুচ্‌কি হেসে,
"কি জানি কেউ শুধায় পাছে—'কোথায়
ছিলে, কিসে?"
আমার চেয়ে অনেক বড়, দেখতে তবু আমার
মত,
মনে হতো বয়েস যেন ত্রিশ;
কালির মত বর্ণ কালো, তাঁর ভিতরে এত
আলো!—

মূর্ত্তিমন্ত সাহস চোখে ভাস্‌ছে অহর্নিশ !

(৪)

গরীব ছিল, গরীব দুঃখীর বুঝ্‌তো প্রাণের সকল ব্যথা,
হৃদয় দিয়ে তাদের দুঃখ করতো অনুভব !
স্বাস্থ্য ধর্ম্ম শিক্ষা নীতি মোটামুটি করতো প্রচার,
পল্লীবাসী ছেলেমেয়ে তাহার ছিল সব !
সারাজীবন চতুষ্পার্শ্বের গ্রাম্য লোকের ব্যাগার খেটে,
জীবন করলো নাশ !
বিদ্যা এবং বুদ্ধি ছিল, কাঙাল বলে হয়নি কদর,
অর্থাভাবে মোক্তারীটা করলো না সে পাশ
টাকা কিম্বা শ্বশুর কিম্বা ভগ্নিপতির জোরে,
অনেক প্রভু দশের চক্ষে নিচ্ছি ধূলি স্নান !
তোষামুদি জানতো না সে মোটেই,
এসব দিকে বিন্দুমাত্র ছিলনা তার ধ্যান !
লক্ষ্য ছিল পরোপকার, সংসারটাকে তুচ্ছ ভাবা,
সাধু-জীবন, কেবলমাত্র জ্ঞান !

(৫)

আমার মত অনাদৃতের তাহার কাছে কতই আদর,
কতই যেন গণ্যমান্য দশের পূজ্য আমি !
মস্ত বড় একটা যেন কেউ !
হা ভগবান্, বুঝতো না সে অদ্যাবধি আমার প্রাণে
দেশের ছাড়া বিশ্বপ্রেমের খেলুলো না তো ঢেউ !
অল্প সুখে অল্প দুখে হৃদয় আমার হাসে কাঁদে
অল্প নিয়েই মেতে আছে প্রাণ ;
সীমাবদ্ধ স্বদেশ সমাজ স্বজাতিদের দুঃখ ব্যথা
আমার হিয়ায় পাচ্ছে বড় স্থান !
ক্ষুদ্রকে সে বিরাট্ ভেবে দিবসরাতি করতো পূজা,
আজকে তাহা বুঝি চোখের জলে !
রক্তমাংসের আত্মীয়তা, তাহার সাথে নাই তো আমার,
তবু তাহার শোকে আমার পাষাণ হিয়া গলে !

(৬)

কাল্‌কে আবার আসবে বলে, রাত্রে সেদিন বলে গেলে,
দিনের পরে দিন যেতেছে আসছো না যে, ভাই !
তোমার প্রিয় 'চন্দন' 'এবা' 'আলেখ্য'ও 'অভ্র-আবীর'
তোমায় ছাড়া পড়তে নাহি চাই।
হা বন্ধু, ফিরে এস, ফিরে এস বন্ধু আমার,
কাহার সাথে সকল রকম করবো আলোচনা
এই জগতে ছুটছে সবাই টাকা পয়সার পিছে পিছে,
চাচ্ছে কেবল তামা চাঁদি সোনা।
সকাল বিকাল সন্ধ্যা নিশায়,
মিথ্যাকে তাই সত্য বানায়,
সারা জীবন পেটের চিন্তা করে ;
সুযোগ পেলেই পরের টাকায় বাবু-গিরি করছে পরস্পরে !
বীর্য্যবন্তের পায়ের চাপে দুর্ব্বলের হাড় হচ্ছে গুড়া,
কেউ তো তাদের দরদ্ নাহি বোঝে।
'বাবুরা' সব বিরাট্ বিশাল নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলার,
টাকাকড়ি লুটবার জন্যে কাছার কাপড় খোঁজে !
মূর্খ এসব বোবা মানুষ তোমার বড়ই প্রিয় ছিল,
তাদের দুঃখ ঘুচাও এসে, ভাই !

তোমার অভাব অহরহঃ তারাই তো, ভাই,
বেশী বোঝে,
কাঁদ্‌ছে তারা সদা সর্ব্বদাই!
তাদের কাজে ব্যাপার দিতে আবার তুমি
ফিরে এস,
ফিরে এস আবার "শালীহরে"!
তোমার পায়ের স্পর্শ পেতে পল্লীর মেঠো
পথ সমুদায়,
কাঁদ্‌ছে মাঠের পরে!
রাতের আকাশ,উদ্‌লা বাতাস,বাড়ীর পূবের
ফসল-ফলা মাঠ,
সত্যি, বন্ধু, নিত্যি তোমায় ডাকে!
ফিরে এস, বন্ধু আমার,ফিরে এস ফিরে এস,
আবার ফিরে এসে তুমি, তুষ্ট করো তোমার
পল্লীমাকে!
এই জীবনে ভুল্‌বো না আর,ভুল্‌বো না আর
তোমায় আমি,
কাঁদবে হৃদয় দুঃখে এবং সুখে;
তোমার অভাব বজ্র হয়ে রইলো আমার বুকে!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

চট্টল গৌরব যাত্রামোহন।

১। শ্রাদ্ধবাসরে বিবৃত জীবনালেখ্য।

১৯১৯ সালের ২রা নভেম্বর আমাদের পক্ষে কি বিষম দুর্দ্দিন! সে দিন আমাদের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা আপনার, সর্ব্বাপেক্ষা আরামের, আশ্রয়ের স্থল, আমাদের পিতৃদেবকে হারাইয়াছি। ১৯০৬ সালে, যখন মা আমাদের অপোগণ্ড ফেলিয়া চলিয়া যান, তখন এত দারুণ দুঃখ অনুভব করিবার মত হৃদয় আমাদের ছিল না। তথাপি, এক অনবদ্য তীব্র যন্ত্রনায় প্রাণের তন্ত্রী যখন অগ্নিময় হইয়া উঠিত, তখন আমার বাবার স্বর্গের স্নেহকরুণোজ্জ্বল সজল নয়নের দৃষ্টি আমাদের জীবনের সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলাইয়া দিত; একদিনের জন্যও মাতৃবিয়োগ দুঃখ ভোগ করিবার, ভাবিবার, বুঝিবার সময় সুযোগ বাবা আমাদিগকে দিতেন না। বাবা আমাদের মা ও বাবা দুইই ছিলেন, এতদিনে আমরা মা ও বাবা দুইই হারাইলাম। এতদিনে আমরা ভাই-বোন যথার্থ অসহায় হইয়া পড়িলাম, আমাদের স্বর্গের সুখের সাজানো কুসুম-কল-কানন কালের ঝড়ে ভাঙ্গিয়া গেল, আমরা দুঃখের সাগরে ভাসিতে চলিলাম। আমাদের দুঃখ রাখিবার বুঝিবার জায়গা এজগতে এখন আর রহিল না।

আমার বাবা শুধু আমরা ভাইবোন কয়েকজনের পিতা ছিলেন তাহা নয়, আমার বাবার আকাশ জোড়া হৃদয়ের মাঝে, আমাদের সঙ্গে, আমার মাতৃভূমির ভ্রাতা ভগ্নিনী সকলেরই স্থান ছিল। সকলের সুখে দুঃখে তিনি সহযুক্ত ছিলেন। দেশের দুঃখে দৈন্যে

রোগে শোকে আমার বাবার হৃদয়ে কান্না উঠিত; দেশের দুঃখ-দৈন্য দূর করিবার জন্য আমার বাবা স্বতঃই, সকলের অগ্রবর্ত্তী হইতেন। অসহায়, অসম্পন্ন, নিরন্ন, বিপন্ন, ভ্রাতা ভগিনীগণ আমার বাবার কাছে স্থান পাইতেন। তাই বলিতেছি, আজ আমার মাতৃভূমি বাস্তবিক আমার সঙ্গে পিতৃহীন হইয়াছে। আমি সকলের গলা জড়াইয়া সকলের সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র কণ্ঠ মিলাইয়া সকলের সঙ্গে আজ কাঁদিব, আমার কান্না আমার বাবার স্বর্গের চরণ চুম্বন করিবে, সেখানেই আমার সান্ত্বনা।

১৮৫০ খৃঃ অব্দের ৩০শে জুলাই সন ১২৫৭ সালে ১৬ই শ্রাবণ পটিয়ার বরমা গ্রামে আমার পিতার জন্ম হয়। আমার পিতামহ ব্রাহ্মিরাম সেনও পিতামহী মেনকা সুন্দরী। তাঁহাদের চারি পুত্র ও দুই কন্যা, আমার পিতা যাত্রা-মোহন সেন তাঁহাদের পঞ্চম সন্তান।

আমার পিতামহ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, তাই বাল্যকাল হইতে বাবাকে দুঃখের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইতে হইয়াছিল। কত বাধা বিঘ্ন বুকে ঠেলিয়া, তাঁহাকে এই দুঃখময় সংসারে দাঁড়াইতে হইয়াছিল, তাহা আমার ক্ষীণ ভাষায় বর্ণনার অতীত। সংসারের দারিদ্র্য পীড়িত জীবন স্বর্গের মহিমময়ী প্রতিভা প্রভাবে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরূঢ় হয়, আমার বাবার জীবন তাহার একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল।

বাবার আটমাস বয়সের কালে, তাঁহার দক্ষিণ হস্তের খাদা বিষম জলিয়া যায়, তাহার উপর জনৈক ভদ্র মহিলা অসাবধানতা প্রযুক্ত পায়ে মাড়াইয়া তাঁহাকে অসহনীয় কষ্টে পাতিত করেন; তাহাতে হাতের সমস্ত আঙ্গুল জড়াইয়া নষ্ট হইয়া যায়।

শিশুদিগকে পঞ্চম বৎসরের কালে বিদ্যারম্ভের জন্য হাতে খড়ি দিবার প্রথা এদেশে প্রচলিত আছে; আমার বাবার হাত নষ্ট হইয়া গিয়াছে, লেখাপড়া হইবে না এই ভাবিয়া আমার পিতামহ তখন তাঁহাকে হাতে খড়ি দেন নাই।

আমার পিতামহ দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। সংসারের ধনে তিনি নির্ধন ছিলেন, ধর্ম্মধনে তিনি ধনী ছিলেন। দেবদ্বিজে তাঁহার ভক্তি ছিল, পরলোকে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধাদি-কার্য্য তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন।

একদিন আমার পিতামহের বাড়ীতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে স্থানীয় পাঠশালার গুরুঠাকুর চৈতন্যচরণ সেন মহাশয় নিমন্ত্রণে আসিয়া আমার পিতামহের সঙ্গে বাবার লেখাপড়ার বিষয় আলাপ করেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া আমার পিতামহ বাবার হাত নাই, লেখা-পড়া হইবে না ইত্যাদি তাঁহার মনোগত ভাব গুরুঠাকুরের নিকট ব্যক্ত করেন। গুরুঠাকুর মহাশয় খোঁড়া ছিলেন, বাবার হাত পোড়া ছিল, তাই যেন গুরুঠাকুর মহা-শয় সমবেদনার সঙ্গে বাবাকে ডাকিয়া লিখিতে পারিবেন কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য একটীবাঁশের ছিপ দিয়া মাটিতে লিখিতে দিলেন এবং তাহাতে যাহা দেখিলেন তাহাতে লিখিতে পারিবেন বলিয়াই তাঁহার প্রত্যয় হইল; নরম হাতের ক্ষিপ্রতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। লেখাপড়া হইবে বলিয়া বাবাকে হাতে খড়ি দিতে আমার পিতা-মহকে অনুরোধ করিলেন। সেই থেকে গুরুঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে আমার

পিতামহ ৬ বৎসরের কালে হাতে খড়ি দিয়া বাবাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। দেড় বৎসরে তাঁহার পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ হইয়া গেল। অতঃপর নিকটবর্ত্তী সাতবাড়িয়া গ্রামে আমার জ্যেষ্ঠতাত নবচন্দ্র সেন মহাশয়ের টোলে অধ্যয়ন করিয়া তাহা ও সাঙ্গ করিলেন। কিন্তু এ সামান্য নিস্তেজ গ্রাম্য টোলের পড়ায় প্রতিভাসম্পন্ন বালক হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় আবেগ মিটিল না; বরং তাঁহার শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা অতীব বলবতী হইয়া উঠিল। তাঁহার মাতুল মহেশচন্দ্র দত্ত, বালক হৃদয়ের অভিপ্রায় অনুভব করিয়া, তাঁহাকে পাশ্চাত্য শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভূর্ষি গ্রামে, আপন বাড়ীতে লইয়া গেলেন; মহেশবাবু অপুত্রক ছিলেন; বাবা মাতুল গৃহে পুত্ররূপে গৃহীত হইয়া মাতুল মাতুলানীর স্নেহ ও সেবায় প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন; কিন্তু লেখাপড়ার সুবিধা না হওয়াতে সে সুখের মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলেন। তৎপর আবার তাঁহার বড় মামা কৈলাশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার বাড়ী লইয়া পঠীয়াএন্ট্রান্স স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

সেইস্থানে ৮ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া এণ্ট্রান্সক্লাসে প্রমোশন পাইলে কৈলাসবাবু তাঁহাকে তাঁহার সহরের বাসায় আনিয়া চট্টগ্রাম এলবার্ট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। তথায় তাঁহার স্কুলের খরচ আমার বড় জ্যেঠামহাশয় নীলকমল সেন মহাশয়ই নির্ব্বাহ করিতেন। ভগবৎ কৃপায় ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতীত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১০ টাকার গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হন, এই বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া ১৮৭০ খৃঃ অব্দে চট্টগ্রাম কলেজ হইতে এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অতঃপর অর্থাভাবহেতু আর বি, এ, পড়া হইবে না সাব্যস্ত হইলে বাবা চাকরীর যোগাড়ে প্রবৃত্ত হন, তখন চট্টগ্রামসহরে ম্যালেরিয়ার খুব প্রাদুর্ভাব ছিল, সহরে থাকিয়া এদিক সেদিক ঘুরিতে ফিরিতে ক্লান্ত শরীর তাহার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িল; চাকুরী হইল না।

তিনি বি, এ, পড়িবেন না চাকুরী করিবেন, ম্যালেরিয়ায় খুব ভুগিতেছেন শুনিয়া কলেজের তৎকালীন প্রফেসার বৈকুণ্ঠনাথ রায়, আমার বড় জ্যেঠামহাশয়কে ধার করিয়া হইলেও বাবাকে পড়াইবার জন্য খুব উৎসাহিত করিলেন। বৈকুণ্ঠবাবু বাবাকে খুব ভাল বাসিতেন, তাহারই উৎসাহে বড় জ্যেঠামহাশয় ধার করিয়া বি. এ, পড়িবার জন্য বাবাকে কলিকাতা পাঠাইয়া দিলেন।

কলিকাতায় যাইয়া তিনি সুস্থ হইলেন এবং ১৮৭১ খৃঃ তত্রত্য কেথিড্রেলকলেজে ভর্ত্তি হইলেন। বি, এর চতুর্থ শ্রেণীতে থাকিতে ত্রিদোষরোগে আক্রান্ত হন,ডাক্তার খাস্তগির মহাশয়ের চিকিৎসানৈপুণ্যে সেবার তিনি রোগ মুক্ত হন।

তৎকালে সর্বজন শ্রীতারাচরণ সেন ও বারিষ্টার শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার খুব সদ্ভাব জন্মিয়াছিল, তারাচরণ বাবু ও পূর্ণবাবু সেবার বাবার খুব সেবা করিয়াছিলেন রোগ মুক্ত হইলেন বটে কিন্তু এক বিষম বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে তখনই কলিকাতা ছাড়িতে হইল। সেই বিপদ আমার বড় জ্যেঠার মৃত্যু, এই আকস্মিক মৃত্যু বিপদে আমার বাবা একেবারে ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন, বি, এ পরীক্ষায় নিরাশ হইলেন।

এই সময় তাঁহাদের কলেজের সহৃদয় প্রিন্সিপল বাবার এই বিপদের বিষয় জানিতে

পারিয়া খুব সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং শীঘ্র ফিরিয়া গিয়া পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতে আশ্বস্ত করেন। তাঁহারই আশ্বাসে অনুকম্পায় আবার 'কলিকাতা গিয়া টেষ্ট পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলেন কিন্তু আবার জরাক্রান্ত হইলেন। পরীক্ষা নিকট পড়িতে অক্ষম, এই অবস্থায় তাঁহার সতীর্থ তারাচরণ বাবু তাঁহার শিয়রে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেন তিনি তাহা শুনিয়া শিখিতেন। এইরূপে কিন্তু শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল।

তাহার দৌর্ব্বল্য দর্শনে ডাক্তার শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরীক্ষা দিতে বারণ করেন। কিন্তু তাঁহার বন্ধু হরকুমার বাবু তাঁহাকে পরীক্ষা দিতেই উৎসাহিত করিতে থাকেন। ফলে পরীক্ষা দেওয়াই হইল, ভগবদ্‌কৃপায় বাবা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

অনন্তর চট্টগ্রাম আসিয়া কমিশনার অফিসে ৩০ টাকার বেতনে কেরাণীর কাজে নিযুক্ত হন, এই চাকরীতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না কেবল পার্সনেল এসিষ্টেণ্ট ভূতপূর্ব্ব প্রফেসর হরিচৈতন্ত ঘোষ মহাশয়ের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশাবাণীতেই এই ডিপার্টমেণ্টে সামান্ত কেরাণীগিরি পদে নিযুক্ত হইয়াছি-লেন। ১০ মাস কাজ করিয়া নানা কারণে ইহা বিরক্তিজনক হওয়াতে ছুটী দরখাস্ত দিয়া বি,এল পড়িবেন স্থির করিয়া ব্যারিষ্টার পূর্ণবাবুর সঙ্গে, ডাক্তার খাস্তগির মহাশয় হইতে কিছু টাকা ধার করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যান।

তাঁহার কলিকাতা যাইবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার ও তাঁহারই কয়েকজন উৎ-সাহী বন্ধুর উৎসাহে পূর্ণবাবু বিলাত যাত্রা করেন। ইতিপূর্ব্বে পূর্ণবাবু হইতে তিনি কিছু টাকা ধার করিয়াছিলেন। পূর্ণবাবু বিলাত চলিয়া গেলেই বাবা অনতিবিলম্বে অতি কষ্টে পূর্ণবাবুকে সেই টাকা শোধ করিয়া পাঠাইলেন।

কলিকাতায় প্রাইভেট টিউসন্‌ই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল কিছু দিন পরে লং-সাহেবের গির্জ্জায় কম্পাউণ্ড কেথিড্রেল মিসন স্কুলের হেডমাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া বিএল পড়িবার বন্দোবস্ত করিলেন। ১৮৭৬ ইংরাজীতে বিএল পরীক্ষায় সপ্তম স্থান লাভ করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন।

অতঃপর চট্টগ্রাম ফিরিলেন। সেই সঙ্গে ব্যারিষ্টার ৺মনোমোহন ঘোষ, লালচাঁদ কাকুর্ডের প্রসিদ্ধ মোকর্দ্দমায় চট্টগ্রাম আসিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে কাপ্তেনের অসাবধানতা হেতু ষ্টিমার চড়ায় লাগিয়া সকলেই একসঙ্গে মৃত্যুর সন্নিহিত হন। সেই সময় বাবা ও অন্তান্ত কয়েকজন ভদ্রলোক ষ্টিমার হইতে চট্টগ্রামে পৌঁছাইয়া দিবার নিমিত্ত বিশেষ পারিতোষিকদিবার অঙ্গীকারে কালাকাপ্তান কার্ণেলভাসকে অনুরোধ করেন। কালা কাপ্তেন এক কাটার বোটে তাঁহাদিগকে করিয়া চট্টগ্রামে আনিয়া দেন। ভগবানের কৃপায় সকলেই রক্ষা পান, কিন্তু কূলে উঠিয়া বাবা ভিন্ন অন্য কেহই কালা কাপ্তেনের পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত হইলেন না।

ইহাতে আমার বাবার হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু কিছু প্রতীকার করিতে না পারিলেও তাহা তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া রহিল। পরে যখন কালা কাপ্তান কোন মোকর্দ্দমায় পড়িয়া বিপন্ন হন, বাবা তখন বিনা পরিশ্রমিকে তাহার মোকর্দ্দমা চালাইয়া কাপ্তানকে বিপন্মুক্ত করেন।

বি এল পরীক্ষাপাশ হওয়ার পর ডাক্তার খাস্তগির মহাশয়,তদীয় ভ্রাতা শ্যামাচরণ বাবুর কন্যা অথবা তাঁহার কন্যা বিনোদিনীদেবীকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করেন। খাস্তগির মহাশয়,স্বীয় মহত্ত্ব হেতু বাবার সুখের দুঃখের অংশভাগী ছিলেন। অনেকবার আসন্ন মৃত্যু হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কত ঘোরতর দুঃসময়ে দুঃখের ভাগ বুক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ উপকারী মহজ্জনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবার ভাবও বাবার কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্থান পাইল না। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে তাঁহার সহিত খাস্তগির মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনী দেবীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল।

আমার জননী দেবী বিনোদিনী, শিক্ষিতা সহৃদয়া, সরলা, মহিয়সী মহিলা ছিলেন। ১৯০৬ খৃঃ অব্দের ৫ই জুলাই মা আমাদের বাবার কাছে রাখিয়া মহাপ্রস্থান করেন, তদবধি বাবা আমাদের মা ও বাবা দুইই হইলেন।

অর্থোন্নতি, ধর্ম্মোন্নতি ও সমাজ সংস্কার আমার বাবার কর্ম্মজীবনের বিশেষ লক্ষ্যস্থল ছিল। দেশের সমাজের, ধর্ম্মের প্রচলিত কুপ্রথা দর্শন করিয়া তিনি খুব দুঃখিত হইতেন কিন্তু প্রথম জীবনে তাহা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। সকলের সঙ্গে মিলনের সুবিধার জন্য সমাজের ধর্ম্মের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বার মাসের তের পার্ব্বণ সম্পন্ন করিতেন। এবং ইহার মধ্যেই সংস্কারের ভাব জাগাইতে প্রয়াস পাইতেন। মাঝে মাঝে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক আনিয়া ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিতেন। সর্ব্বপ্রথমে ভক্তিভাজন শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রদাস মহাশয় বাবার সঙ্গে বরমার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। অহারই ফলে বরমার সুসন্তান ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র সেন ও লেপটেন্টি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন I. M. S., M. D. R. C. S. F. মহোদয়গণ ১৯০২ ইং ২৪শে জানুয়ারী ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

বাবা মিলন,খুব ভাল বাসিতেন, মানবে মানবে যে ভেদ তাহা তাঁহার অসহনীয় ছিল, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকল সমাজের মাঝে তিনি আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মানবের জাতীয় জীবন গঠনের জন্য দেশকে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে জুড়িয়া দিবার জন্য আমার বাবা দেশ নায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ও অশেষ আয়াস পাইয়াছিলেন।

আমার বাবা সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। দেশের লোকের মনে কষ্ট হইবে ভাবিয়া তিনি আপন জীবনের অনেক উচ্চভাব ও ইচ্ছা সতত লুকায়িত রাখিবার চেষ্টা করিতেন, এইজন্য তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রকৃত প্রস্ফুরণ দর্শন করিতে সাধারণ জনগণের অনেক বিলম্ব হইয়াছিল।

প্রাণের পরম প্রিয়বস্তু যাহা,তাহা একেলা আপনি উপভোগ করিয়া সান্ত্বনা হয় না, সকলের সঙ্গে তাহা ভোগ করিয়া যে সুখ, সে সুখের তুলনা মিলে না। এই ভাবের প্রেরণায়, দেশের আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিবেন এই আশঙ্কায় তিনি যাহা সত্য বুঝিতেন; যাহা উত্তম জানিতেন তাহা হইতেও দূরে আছেন এইরূপভাব প্রদর্শন করিতেন। সময়ও সুযোগ পাইলেই ধর্ম্মের উচ্চ অবস্থার কথা আলোচনা করিতেন। দেশপ্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। তজ্জন্য তাঁহাকে সময় সময় সমাজের নিকট নিন্দিত

ও লাঞ্ছিত হইতে হইত ; তাহা তিনি নীরবে সহিয়া লইতেন, সহিবার ক্ষমতাও তাঁহার খুব বেশী ছিল।

পাঠ্যজীবনে আমার মাতামহের সাহায্যে ও কর্ম্মজীবনে ব্রাহ্মসমাজের মহজ্জনগণের সঙ্গ লাভ করিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজের ও ধর্ম্মের প্রতি খুব অনুরাগী হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের উচ্চতা ও তাহার মধুরতা প্রাণে প্রাণে তিনি অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত সমাজের জন্য পুণ্যতীর্থ তাহা তিনি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজের সৌকর্য্যের উৎকর্ষ বর্দ্ধনের নিমিত্ত তিনি আজীবন আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। চট্টগ্রাম ও বারমা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠার কার্য্যে ভগবান্ তাঁহাকে বিশেষভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। যখন চট্ট-গ্রামে ব্রাহ্মমন্দির নির্ম্মিত হয় নাই তখন বাবার বাসভবনে প্রচারক মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দত্ত ও ষোড়শীমোহন সেনকে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এবং উপাসনার্থ একটি ছোট গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

অনেক দিন ধরিয়া দেশের দশকে লইয়া উঠিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিলেন, সেই টানাটানির ফলে বরমা ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠা। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে তদীয় কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মহাশয়ের দীক্ষায় ব্যাকুল বৈচিত্রের মাঝে ভগবানের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া ৫৮ বৎসর বয়সে ১৯১৯ ইং ২৪শে জানুয়ারী পবিত্র মহোৎসবে চট্টগ্রাম ব্রাহ্মমন্দিরে সনা-তন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এবং মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত উক্ত ধর্ম্মের সমাজের চিন্তায়, চর্চ্চায়,সেবায়,স্বীয় জীবন, অর্থ সামর্থ্য অকা-তরে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। বরমার মন্দির ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ রক্ষা কল্পে আপন জমিদারীর আয় হইতে বার্ষিক ৬০ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া সমাজের প্রতি গভীর মহত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত দেশ প্রচলিত কুসংস্কারের মূল উন্মুলনের জন্য অনুন্নত শ্রেণীর নরনারীর উন্নতির জন্য সাধারণে শিক্ষা বিস্তারের জন্য মানবের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য,স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য আমার বাবা কার্য্যতঃ, বাক্যতঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে কতশত আয়াস স্বীকার করিয়া গিয়াছেন,তাহা আমাদের সঙ্গে এদেশ বাসী নরনারী সকলেরই গৌরবের ও অনু-করণের বিষয় বটে।

দানে আমার বাবা সতত সিদ্ধ ও মুক্ত হস্ত ছিলেন। প্রার্থীকে ব্যর্থ মনোরথ করিতে তাহার জীবনে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। নিরন্নকে অন্নদান, বিপন্নকে আশ্রয় দান, রুগ্নকে ঔষধ ও পথ্যদান করিতে কদাচিৎ তিনি কুণ্ঠা প্রকাশ করিতেন না। আকুল আগ্রহের সঙ্গে তিনি রুগ্ন ব্যক্তির সেবায় অগ্রসর হইতেন। দেশের দীন, দুঃখী, রুগ্ন, ভগ্ন ব্যক্তির জন্য তাঁহার চিন্তার সীমা ছিল না। আমার মাতৃভূমির দীন দুঃখী, রুগ্ন,ভগ্ন ভ্রাতা ভগ্নীর জন্য আমার বাবা দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

তিনি নিজে সুশিক্ষিত ছিলেন, সকল দেশে সুশিক্ষা বিস্তৃত হউক এই ইচ্ছা তাঁহার বলবতী ছিল। শুধু এই পক্ষে তিনি বরমার আমার পিতামহ ও পিতামহী নামধেয় মধ্য ইংরাজী স্কুল উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রব-র্ত্তিত করিবার সূচনা করিয়াছেন। চট্টগ্রাম সহরে তন্নামধেয় হাইস্কুল তাহারই পরি-চায়ক।

স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত ও তাঁহার তেমনই বহু যত্ন ছিল। বরমায় আমার জননী বিনোদিনী দেবীর স্মৃতি মন্দির, বরমা উচ্চ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়, টাউনে আমার মাতামহ ডাক্তার খাস্তগির মহাশয় যিনি চট্টগ্রামে সর্ব্ব প্রথমে স্ত্রীজনের উচ্চ শিক্ষার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, যিনি আমার মাসীমা স্বর্গীয়া কুমুদিনীদেবীকে শিক্ষার দীক্ষায় উন্নীতা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিতে অলঙ্কৃতা করিয়া শিক্ষা বিভাগের উচ্চতম আসনে আসীন করিয়া বঙ্গদেশকে বিশেষ ভাবে চট্টগ্রামকে, চট্টগ্রামের নারীসমাজকে আখস্ত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাঁহারই প্রতি আমার বাবার হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন, ডাক্তার খাস্তগির উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, নরনারী নির্ব্বিশেষে শিক্ষা প্রচারে বাবার ঐকান্তিক ইচ্ছার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সময় সময় তাঁহার মুখে এমনও শুনা যাইত যে চট্টগ্রামের একটী কলেজ এদেশের বালকগণের শিক্ষাদানের স্থানের সংকুলন করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, আর একটী কলেজ হইলে ভাল হইত, মনে হয় তাঁহার প্রাণে এই আকাঙ্খা টুকুও ছিল।

অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি কি রাজনীতি সকল বিষয়ের মধ্যেই তিনি গভীর অধিকার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

স্বীয় ব্যবসায়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া তিনি বিপুল অর্থ অর্জ্জন করিয়াছেন এবং তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন।

বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার দিনে চট্টগ্রামের দেশনায়ক রূপে তিনি এদেশকে যেমন নিরাপদ রাখিতে পারিয়াছেন ও রাজশক্তির সম্মান অটুট রাখিতে ও সম্মান দিতে পারিয়াছেন, অন্যত্র তেমন নয়। ময়মনসিংহ কনফারেন্সে সভাপতি রূপে ও বিগত বরিশাল বিপ্লবে তিনি যেরূপ সৎসাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা বঙ্গদেশবাসীগণের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় বটে।

ঢাকায় পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মকনফারেন্সে সভাপতিরূপে তাঁহার ধর্ম্মনীতিজ্ঞতার প্রচুর পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

ইহা ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহে তিনি সভাপতি ও মেম্বর ছিলেন (১) চট্টগ্রাম এসোসিয়েসন্ (২) চট্টগ্রাম হিতসাধন মণ্ডলী (৩) উকিল বার্ এসোসিয়েসন্ (৪) সেণ্টাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক (৫) চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজ (৬) সেনা সংঘটন সমিতি (৭) যাত্রামোহন ইন্‌ষ্টিটিউসন্ (৮) কার্পাস সমিতি (৯) বরমা ব্রাহ্মসমাজ (১০) বরমা হিতসাধনমণ্ডলী (১১) বরমা চেরিটেবল্ ডিসপেনসরি (১২) বরমা ত্রাহিমেনকা উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় (১৩) বরমা বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি এবং চট্টগ্রাম কলেজের গভর্ণিং বডির সদস্য ও ডিসট্রিক্টবোর্ডের শিক্ষা বিভাগের মেম্বার ছিলেন। এইরূপে আমার বাবা নানা গুণে বিভূষিত হইয়াও নিরহঙ্কার ছিলেন। তিনি দেশের নেতা ছিলেন, রাজদরবারে উচ্চ ব্যবসায়ী ছিলেন লাট কাউন্সিলের সদস্যরূপে উচ্চ রাজসম্মানলাভ করিয়াছিলেন।

তথাপি তাহার জন্য তিনি নিজে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই ভাব প্রকাশ করিতেন না, বরং ছোট বড় সকলের সঙ্গে সতত সমাদরে সসম্মান আচরণ করিতেন। নিজের সামান্য

দোষ ত্রুটীর জন্য কত দৈন্য প্রকাশ করিতেন এবং কাতরপ্রাণে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন। এবং ক্ষমা করিতেও তিনি খুব পারিতেন; অপরাধীর প্রতি তাঁহার ক্ষমার পরিমাণ ছিল না, সাধারণতঃ লোক ইহা দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া যাইত।

পতিতকে তিনি ঘৃণা করিতেন না, দয়া করিতেন; পতিতের তিনি বন্ধু ছিলেন; পতিতের প্রাণ রক্ষা করিতে নিজে বিপন্ন হইতেন, পতিতকে সমাজে প্রচলিত করিতে অকাতরে শত নির্য্যাতন সহিয়া লইতেন।

সহিবার ক্ষমতা আমার বাবার খুব বেশী ছিল। বিশেষ বিপদে ও কখন তাঁহাকে ধৈর্য্যচ্যুত হইতে দেখা যায় নাই। একবার জামিনেতে তাঁহার ৫২০০০ টাকা বদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু এইরূপ অর্থ হানিজনক বিশেষ বিপদেও তিনি অনন্য সাধারণ ধীরতা সহকারে আত্ম সম্বরণ করিয়াছিলেন, বরং এই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে চট্টগ্রামের বিশেষ অভাব বোধে চট্টগ্রাম 'টাউনহল' প্রতিষ্ঠার জন্য অকুণ্ঠিতে অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে কলিকাতায় আমার ভগ্নি নলিনীর ও অব্যবহিত পরে আমার ভ্রাতা নীরেনের আকস্মিক মৃত্যু হয় এইরূপ গুণবতী কন্যা ও গুনবান পুত্রের মর্ম্মন্তুদ মৃত্যু সংবাদেও তিনি বিশ্বাস ও ধৈর্য্য বিচ্যুত হন নাই। এই অবস্থায় তিনি প্রকাণ্ড জনসভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। আমার ভগ্নির স্মৃতি উজ্জ্বল করিবার উপলক্ষে চট্টগ্রাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হাতে ১০০০ টাকা দান করিয়া নলিনী প্রচার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন, বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আমার বাবার অশেষ গুণ ছিল, তাঁহার নিকট গুণের আদর ছিল, গুণীর সম্মান ছিল, মানীগণের মান তিনি প্রাণ দিয়া রক্ষা করিতেন। গুরুজনের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি ছিল, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ছিল, সকল সম্প্রদায়ের সাধু ভক্তের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। সকল সমাজের যাহা সত্য সৌন্দর্য্য তাহা তাঁহার গ্রহনীয় ছিল। হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান বলিয়া ইতর বিশেষ ছিল না।

সবুবার যুবকগণকে লইয়া আমার বাবা সুহৃদ সমিতি সংস্থাপন ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন ও পূর্ণচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রতধারী কয়েক জন কর্ম্মী যুবকগণকে লইয়া ব্রতধারী সম্প্রদায় গঠন হিতসাধনীসভা বা হিতসাধন মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সকল সভাসমিতির দ্বারা লাইব্রেরী সংস্থাপন, দরিদ্রগণের অন্নবস্ত্র কষ্ট দূরীকরণ, বাসগৃহ নির্ম্মাণ ও সংস্কার দরিদ্রছাত্রগণের শিক্ষাদান করে নৈশ বিদ্যালয় ও দরিদ্র ভাণ্ডার সংস্থাপন মামলা মোকদ্দমা মীমাংসার্থ শালিসী বোর্ড গঠিত হয় এবং গ্রামের পয়ঃপ্রণালী ও নালা পরিষ্কার, রাস্তাঘাটের সু ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি চট্টগ্রামে জাতীয় বিদ্যালয় ও শিল্পবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বক্তা বিপিনচন্দ্র পাল ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি, মহম্মদ সিরাজী, ডাক্তার আবদুল গফুর, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথবসু প্রভৃতি স্বদেশ সেবকগণকে আহ্বান করিয়া চট্টগ্রামবাসীদের মধ্যে নব জাগরণ উপস্থিত করিয়া-

ছিলেন তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় চট্টগ্রামে প্রাদেশিক সমিতি ও সাহিত্য সম্মিলনী ও পূর্ব্ববাংলা ব্রাহ্ম সম্মিলনীর বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হয়। দেশের ভাবনা আমার বাবার খুব প্রবল ছিল। দেশের দশের হিতের জন্য স্কুল, ডাকঘর, নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ডাক্তারখানা নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহা পরে যাত্রামোহন দাতব্য-চিকিৎসালয় নামে খোলা হইয়াছে। পথ, ঘাট, নদী, নালা সংস্কারের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। দেশের লোকের কষ্ট দেখিয়া নদীতে সিঁড়ি, তীরে বিশ্রাম ভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, মৃত্যু শয্যায় ও এদেশের কথা ভাবিয়াছেন, দীন, দুঃখী, আশ্রিতের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সকল কার্য্যের সঙ্গেই দেশসেবক শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী ও রমেশচন্দ্র সেন নিত্যযুক্ত ছিলেন।

অতিথি অভ্যাগতের সেবা সম্মান আমার বাবা অতি যত্নের সঙ্গে সম্পন্ন করিতেন; দেশী, বিদেশী, ধনী, নির্ধন, দরিদ্র, কাজে অকাজে আমার বাবার কাছে আতিথ্য সমাদর লাভ করিয়া পরম পরিতোষ প্রকাশ করিতেন।

এইরূপে আমার বাবা এদেশের সে দেশের, নানা দেশের, নানা কাজে চেষ্টায় চিন্তায় আজীবন কাটাইয়াছেন। ভগবৎ প্রেরিত পিতা আমাদের সংসারের নয়ন মুদ্রিত ক'রে, স্বর্গে নয়ন উন্মীলন করিয়াছেন। এবং আজ আমাদের সকলের প্রাণের ক্রন্দনের সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে সকলকে স্বর্গের অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি তাঁহার কার্য্য-সমাপন করিয়া তাঁহারই ইচ্ছায় জগতের সমস্ত জড়ভাব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই শান্তিধামে স্বর্গধামে আনন্দের আরামের আসন লাভ করিয়াছেন।

পরম পিতা পরমেশ্বর! তুমি আমাদের মর্ত্ত্যের অন্তরাল সরাইয়া দাও, আমরা তোমার মাঝে তাঁহার নিরাময় চিন্ময় আত্মার পরশন পাইয়া পরিতৃপ্ত হই, তিনি তোমাতেই শান্তিলাভ করুন।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

চট্টল গৌরব যাত্রামোহন।

২১। অন্যতম গুণগ্রাহীর অভিব্যক্তি।

স্বনামখ্যাত জন নায়ক যাত্রামোহন সেন আর পৃথিবীতে নাই। দরিদ্র জনক জননীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া, তিনি নিজ প্রতিভা বলে নিজের জীবন এবং পরিবারকে উন্নত করিয়াছিলেন, জন্মভূমির মুখোজ্জল করিয়াছিলেন এবং সমগ্র বঙ্গদেশকে তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত এবং ধনী করিয়াছিলেন। তিনি জন সাধারণের প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং আজীবন জন সাধারণের সেবা করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার অভাবে সমগ্র বঙ্গদেশ শোকাকুল। তাঁহার জন্মভূমি চট্টগ্রাম তাঁহার অভাবে আজ অতি দীনা।

জন্ম ও শৈশব—১৮৫০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত বরমা গ্রামে তাঁহার পিতা আহিরাম সেনের গৃহে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সদ্বংশ সম্ভূত হইলেও তাঁহার পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন। সুতরাং তাঁহার শৈশব এবং যৌবন দরিদ্রতার কঠোর নিষ্পেষনের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার পিতা অতি সৎলোক ছিলেন। তাঁহার মাতার প্রশংসা তিনি সর্ব্বদা করিতেন। তিনি সরলা, সাধ্বী এবং ধর্ম্মভীরু নারী ছিলেন। এই সাধু প্রকৃতির দরিদ্র জনক জননীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার চরিত্রে সাধুতারই প্রভাব ছিল; ধনৈশ্বর্য্যের গর্ব্ব কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

শিক্ষা—স্বগ্রামের পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের কৃপায় তাঁহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। নিজ গ্রামে পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি মাতুলালয়ে থাকিয়া পটীয়া স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। তৎপর চট্টগ্রাম সহরেও মামার গৃহেই থাকিয়া গভর্ণমেন্ট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং চট্টগ্রাম কলেজ হইতে তৎকালের এল, এ. পরীক্ষাও পাস করেন। তখন এদেশে প্রথম শ্রেণীর কলেজ ছিল না। সুতরাং কলিকাতা যাইয়া তাঁহাকে বি, এ এবং বি এল, পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন করিতে হয়। পিতা মাতা তাঁহার অধ্যয়নের কোন সাহায্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার মাতুলেরও এমন সচ্ছল অবস্থা ছিল না যে তাঁহার কলিকাতার ব্যয়ভার অবাধে বহন করিতে পারেন। সুতরাং শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে অন্যের সাহায্য ও গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নীলকমল সেন এই সময় অল্প বেতনে শিক্ষকতা করিতেন এবং যথা সাধ্য তাঁহার সাহায্য করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার বি এ পরীক্ষার কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি পরলোক গমন করেন। এ সময়ে তিনি এত বিপন্ন হইয়াছিলেন যে হয় ত তাঁহার আর কলিকাতা যাইয়া পরীক্ষা দেওয়া হইত না। কিন্তু তাঁহার অধ্যয়ন এবং চরিত্র গুণে তাঁহার অধ্যাপকেরা তাঁহাকে খুব স্নেহ

করিতেন। তাঁহার কলেজের প্রিন্সিপাল পত্র লিখিয়া এবং অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া গেলেন। এইরূপে নানা কষ্টের মধ্যে তিনি তাঁহার শিক্ষা সম্পাদন করিয়া বি এল পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

বিষয় কর্ম—বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি চট্টগ্রাম জজ আদালতে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ন্যূনাধিক ৫০বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি এই ব্যবসায় আরম্ভ করেন তখন ইংরেজী শিক্ষিত উকিল অল্পই ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই তখন মুনসেফ হইতে পারিতেন। এবং ক্রমে সবজজ এবং ডিষ্ট্রিক্ট্ জজ ও হইবার সম্ভাবনাও ছিল। তাঁহার অনেক পরেও যাহারা এই কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা অনেকেই উচ্চ রাজকার্য্যে উন্নীত হইয়াছেন। কিন্তু রাজ সেবায় তাঁহার আগ্রহ ছিল না। আমরা তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি, যে মাসে ৫০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিলেও, তিনি চাকরী গ্রহণ করিবেন না, সঙ্কল্প করিয়া ওকালতী আরম্ভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক তাঁহার প্রতিভা তাঁহাকে নিম্ন স্তরে থাকিতে দিলেনা। রাজ কর্ম্মচারী হইলে, তিনি যে যশ মান এবং অর্থ লাভ করিতে পারিতেন, তদপেক্ষা অনেক অধিক তিনি, তাঁহার অবলম্বিত ব্যবসায়ে উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবসায়ে তিনি এদেশে যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাহাতে তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন; তাহাতেই যশঃ ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সমব্যবসায়ীগণের নিকট তিনি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বিচারক মহলেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ব্যবহার-শাস্ত্রে যেমন তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল, মোকর্দ্দমা পরিচালনে তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই তিনি অধ্যয়ন শেষ করেন নাই। নূতন নূতন যত গ্রন্থ বাহির হইত তিনি সব ক্রয় করিতেন এবং অধ্যয়ন করিতেন। তাহাতেই তাঁহার কৃতকার্য্যতা। ভালরূপ অধ্যয়ন না করিয়া তিনি মোকর্দ্দমা পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতেন না।

ব্যবসায়ে যে তিনি যে কেবল যশঃ মান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি অনেকের ধন, মান এবং জীবন রক্ষার সহায়তাও করিয়াছেন। কত সময়ে তিনি অর্থ গ্রহণ না করিয়াও লোকের সাহায্য করিতেন। এক উকিল বন্ধু সে দিন বলিলেন, তাঁহাদের এক মোকর্দ্দমায় তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তাঁহারা নিয়মিত ফিস দিতে প্রস্তুত ছিলেন। নিজে উকিল বলিয়া চক্ষু লজ্জাবশতঃ তিনি ফি গ্রহণ করিবেন না মনে করিয়া প্রথম দিন তাঁহারা মোকর্দ্দমার কাগজের মধ্যে ৫০ টাকার নোট দিয়াছিলেন। কিন্তু কাগজ পাঠ করিবার সময় নোট দেখিয়াই তিনি তখনই তাহা ফিরাইয়া পাঠাইলেন। আঠার দিন পরিশ্রম করিয়া তাঁহাকে এই মোকর্দ্দমা পরিচালন করিতে হইয়াছিল। নিয়মিত ফি গ্রহণ করিলে তিনি হাজার টাকা পাইতেন কিন্তু এক পয়সাও গ্রহণ না করিয়া অথচ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া এই মোকর্দ্দমার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য—কয়েক বৎসর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টেও ওকালতী করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় চট্টগ্রাম বিভাগের জনসাধারণের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন সেখানেও তাঁহার সুনাম প্রকাশিত হইয়াছিল।

জনসাধারণের সেবা—কিন্তু ব্যবসায়ের কৃতকার্য্যতা এবং অর্থোপার্জ্জনে তাহার মহত্ব নয়। ওকালতী ব্যবসা করিয়া কত জনই ত অর্থ-সম্পদ লাভ করিয়াছেন। তাহাতে কিছু অসাধারণত্ব নাই। তিনি যে জন-সাধারণের সেবায় আত্মদান করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মহত্ব। দেশের কল্যাণ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া কলিকাতা যাওয়ার পূর্ব্বে জনসাধারণের সেবার ভাব তাঁহার জীবনে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। সম্ভবতঃ দেশের প্রতিনিধি করিতে যাইয়া দেশের সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রাণে জাগিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিকসিত হইয়াছিল। তখন দেশের কল্যাণ কামনা তাঁহার হৃদয়কে এত দৃঢ়তার সহিত অধিকার করিয়াছিল যে নির্য্যাতনের ভয়, কিম্বা উপাধি লাভের প্রলোভন, তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতার সময় দেশের মেজিষ্ট্রেটের অনুরোধ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া, তিনি আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। কেবল তাহা নয়, এদেশে তিনি আন্দোলনের পরিচালক এবং জন সাধারণের নেতা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। কি ব্যাকুলতার সহিত তিনি সাশ্রুনয়নে গ্রামে গ্রামে যাইয়া দেশের দুঃখের কথা জন সাধারণের নিকট ব্যাখ্যা করিতেন। যাঁহারা তাহা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার তখনকার হৃদয়ের ভাব এবং দেশপ্রীতি বুঝিতে পারিয়াছেন। দেশের কল্যাণের জন্য যখন যাহা প্রয়োজন হইত তখনই তিনি তাহা করিতে প্রস্তুত হইতেন। দেশের জন্য তিনি অকাতরে অর্থ দান করিয়াছেন।

জনসাধারণের নেতৃত্ব—তিনি দেশের নেতা ছিলেন, জনসাধারণের প্রতিনিধি রূপে লাটসাহেবের কাউন্সিলের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি প্রাদেশিক সম্মিলনীর (Provincial conference) এর সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। সুতরাং জনসাধারণ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনিও দেশের লোকের হিতের জন্য অনেক করিয়াছেন। যাঁহারা নেতা বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের অনেকের ন্যায় তিনিও, দেশের উন্নতির জন্য, আলোচনা আন্দোলন বক্তৃতা অনেক করিয়াছেন জনহিতকর কার্য্যে অসীম সাহসিকতা এবং দৃঢ়তার সহিত দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, যাহা দেশের অহিতকর মনে করিয়াছেন, অবিচলিত ভাবে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু কেবল মুখের বক্তৃতায় বা জনসাধারণের পক্ষ সমর্থনের চেষ্টায় তাঁহার লোকহিতৈষণা পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি দেশের জন্য নিজের অনেক অর্থও ব্যয় করিয়াছেন। জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার দানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। তাঁহার স্বগ্রামের বালকদিগের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়। ইহার গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে তাঁহার ৪।৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। পিতামাতার নামে এই বিদ্যালয় স্থাপিত। ইহার নাম "রাজচন্দ্র মেনকা ইন্‌ষ্টিটিউসন্"।

২। গ্রামের বালিকাদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত "বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়" ইহারও গৃহাদি তিনিই নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

৩। গ্রামে ডাকঘরের গৃহও তাঁহার অর্থেই নির্ম্মিত হইয়াছে।

৪। বরকলের ঘাটে সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া এবং তন্নিকটবর্ত্তী পান্থ নিবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহা পথিকদের বিশ্রামের জন্য নির্ম্মিত গৃহ।

৫। নিজগ্রামে তাঁহার মাতার শ্মশানে প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির।

৬। বরমা ডিস্‌পেনস্যারী। যে দিন তাঁহার মৃত্যু হয়, সেই দিনই ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১২ শত টাকা নিজে দান করিয়া ডিস্‌ট্রিক্ট বোর্ড হইতে চেষ্টা করিয়া এই ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

৭। তদ্ব্যতীত তাঁহার নিজগ্রামে তিনি বিশটীর অধিক পুষ্করিণী খনন করিয়া গ্রামবাসী নরনারীর নির্ম্মল জল পানের সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

৮। তাঁহার নিজগ্রামে নির্ম্মিত বরমা ব্রাহ্মমন্দির সম্পূর্ণ তাঁহার অর্থে না হইলেও তাঁহার অর্থ এবং চেষ্টা ব্যতীত এই মন্দির সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইত কিনা সন্দেহ।

৯। তৎপরে চট্টগ্রাম সহরেও তিনি অনেক স্থানে জড়িয়াছেন। তাঁহারই দানের উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান খাস্তগির উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়। সর্ব্বজন পরিচিত ডাঃ খাস্তগির কেবল চট্টগ্রামে নয় সমস্ত ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রথম এবং প্রধান প্রবর্ত্তক ছিলেন। তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য স্থানীয় মধ্যইংরাজী বালিকাবিদ্যালয়কে প্রায় ৩ তিন হাজার টাকা মূল্যের গৃহ ও ভূমি দান করিয়াছিলেন। ইহাই পরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

১০। চট্টগ্রাম টাউনহলের অভাব বহুদিন অনুভূত হইতেছে। কিন্তু তাহা সম্পাদনের সুযোগ এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল এই টাউনহল নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কিন্তু এক সওদাগরে জামীন হইয়া তিনি বহু অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে বহু দিন তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। অবশেষে শেষ জীবনে চারি হাজার টাকা মূল্যে জমী ক্রয় করিয়া টাউনহল নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল বটে কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে সম্পূর্ণ গৃহ তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

১১। চট্টগ্রাম ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণার্থেও তিনি ৩০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে মন্দির সংলগ্ন গৃহ এবং ভূমি "নলিনী প্রচারাশ্রম" নাম দিয়া ব্রাহ্ম সমাজে দান করিয়াছেন। তাহার মূল্য প্রায় ২৮ শত টাকা হইয়াছে।

১২। J. M. sens Institute নামে স্থাপিত এই নগরের উচ্চ ইংরাজী স্কুল তিনিই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

এতগুলি জনহিতকর অনুষ্ঠান যাঁহা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে এমন লোক লোকহিতৈষী